বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন

আমরা পূর্বপ্রবন্ধে দেখিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্র অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ধর্ম ও দর্শনের এক প্রধান সমস্যা এই অবতারবাদ।

অশরীরী পরমেশ্বরের মনুষ্যশরীর ধারণ সম্ভব কি না? 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। উত্তরে তিনি প্রতিপ্রশ্ন করিতেছেন—

> 'যিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? * তাঁহার সর্বশক্তিমত্তার এ সীমা নির্দেশ কর কেন?' ঈশ্বর ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্— 'তিনি অবতীর্ণ হইতে পারেন না' এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমানির্দেশ করা হয় (গীতাভাষ্য)। অবশ্য যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধিত হয়, কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে তাঁহাকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে।

তবে অবতার কেন? ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি?

পূর্ণ আদর্শ ভিন্ন প্রকৃত ধর্মসংস্থাপন সম্পন্ন করা অসম্ভব। জীবের সমক্ষে এই পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শনের জন্যই অবতার স্বীকার করিয়া ভগবানের সান্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায় বলি—

> 'সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। · অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। ··· এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি? (কৃষ্ণচরিত্র)

পুনশ্চ—

> 'শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্ররূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শ-পুরুষতত্ত্ব।'

---

* নিপট অদ্বৈতী শ্রীশঙ্করাচার্য ও বলিয়াছেন—স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্—১।১।২০ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরের অবতার গ্রহণের প্রয়োজন সম্পূর্ণ আদর্শ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম-সংস্থাপন। বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্তর অলিভার লজ্ ভগবানের অবতার-স্বীকারের প্রয়োজন অন্য ভাবে সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য এতই বিরাট্, তাঁহার প্রভাব এতই প্রচণ্ড যে, তিনি যদি অবতাররূপে নিজেকে সঙ্কুচিত ও সঙ্কীর্ণ না করেন, তবে কেহই তাঁহার অনাবৃত মুখ দর্শন করিতে পারে না। এই জন্যই খ্রীষ্টানেরা বলেন, "No man can see My face and live." দৃষ্টান্তস্বরূপ স্তর অলিভার লজ্ রবি ও রশ্মির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূর্য সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ—সূর্যরশ্মি দ্বারাই পৃথিবী পুষ্ট, বর্ধিত ও সঞ্জীবিত আছে; কিন্তু কোন দিন যদি সূর্য নিজের প্রচণ্ড মার্তণ্ড মূর্তিতে প্রকটিত হয়েন, তাহার ফলে কি হয়? সমস্ত পৃথিবী মুহূর্তমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। সাগর, নদী, পর্বত, প্রস্তর, প্রান্তর, তরু, লতা, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ—কেহই ক্ষণার্ধ তিষ্ঠিতে পারে না। সেই জন্য সূর্যের তেজঃ বায়ুস্তরের দ্বারা প্রশমিত হইয়া সংবৃত মূর্তিতে রশ্মিরূপে আমাদের গোচর হয়। এই সংবৃতির ফলেই সূর্যের উপকারিতা। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক্ ঐ কথা। সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই, বোধ হয় অত্যুত্তম সাধকেরাও তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্য, তাঁহার প্রকটিত মহিমা ধারণ করিতে পারেন না। সেই জন্যই তিনি অবতারের রূপে নিজেকে সংবৃত করিয়া, সেই আবরণের মধ্যে নিজের তেজঃ প্রশমিত করিয়া, জীবের নিকট প্রকাশিত হয়েন।

স্তর অলিভার লজের কথাগুলি বেশ সঙ্গত। আমাদের দেশে গঙ্গাবতরণের যে কাহিনী পুরাণের মধ্যে রক্ষিত আছে, তদ্দ্বারা ঐ কথার সমর্থন হয়। গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা বলে। এক দিন সাধকপ্রবর ভগীরথের আবাহনে ভগবানের আধ্যাত্মিক শক্তি ভূমণ্ডলে গঙ্গারূপে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই শক্তিকে মনুষ্যের ধারণ-উপযোগী করিবার জন্য প্রথমতঃ মহাদেবকে জটার মধ্যে সংবৃত করিতে হইয়াছিল এবং পরে জহ্নুমুনির শরীরের মধ্যে সংগোপিত করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য গঙ্গার নাম জাহ্নবী। এইরূপে দ্বিধা-শিথিলিত বিষ্ণুতেজঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, তবে গঙ্গা আমাদের ধারণ-উপযোগী হইয়া পতিতপাবনী হইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও 'ধর্মতত্ত্বে' এ বিষয়ের ইঙ্গিত করিয়াছেন—

"ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি—আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়? অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।"

'দেবী চৌধুরাণী'তে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—

"ঈশ্বর অনন্ত—কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না—সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর—হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।"

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে অবতারের প্রয়োজন যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক। তিনি বলিতেছেন, শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলাপ্রকাশ দ্বারা বদ্ধ জীবকে আকর্ষণ ও ভবকূপ হইতে উত্তোলনই অবতারের মুখ্য প্রয়োজন।

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানাম্ অবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্ ইতি কেচন।—১।৮।৩৫

—'অজ্ঞান, কাম ও কর্ম দ্বারা নিপীড়িত নরনারীকে শ্রবণ ও স্মরণযোগ্য লীলা-প্রকাশ দ্বারা এই ভবকূপ হইতে উদ্ধরণই—হে কৃষ্ণ! তোমার অবতারগ্রহণের উদ্দেশ্য।'

ভাগবতের অন্যত্রও এ কথা আছে—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥—১০।৩৩।৩৫

এ সম্পর্কে অ্যানি বেসাণ্ট্ অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

When, He Who is beauty and love and bliss, shews a little portion of Himself on earth, enclosed in human form, the weary eyes of men light up, the tired hearts of men expand with a new hope and a new vigour They are irresistably attracted to Him. Devotion spontaneously springs up

ভগবান্ কিরূপে অবতীর্ণ হন, তাঁহার অবতার-গ্রহণের প্রণালী (*modus operandi*) কি? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গের বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তবে গীতার প্রখ্যাত শ্লোক—

অজোপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্ ঈশ্বরোপি সন্।
প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।—৪।৬

—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করও শ্রীধরের ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'সম্ভবামি আত্মমায়য়া'—শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলেন,—

স চ ভগবান্জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নঃ ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানাম্ ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবান্ ইব জাত ইব।

—অর্থাৎ, সেই ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান্ নিজের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া—অজ অব্যয় মহেশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব হইলেও নিজ মায়া দ্বারা যেন দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধর স্বামী এ সম্পর্কে কিছু ভিন্ন-মত। তিনি বলেন—

ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি • • স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়া অবতরামি।

—অর্থাৎ, ভগবান্ কর্মরহিত; তিনি কর্মের অধীন নহেন। তথাপি নিজ মায়া দ্বারা উৎপন্ন হন। তিনি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ ঊর্জ্জিত সত্ত্বমূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন।

অতএব, শ্রীধর স্বামীর মতে অবতারকালে ভগবান্ মূর্তি পরিগ্রহ করেন, কিন্তু সে মূর্তি শুদ্ধসত্ত্বনির্মিত। গীতার অন্যতর টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কেহ কেহ নিত্য নিরবয়ব নির্বিকার পরমানন্দময় ভগবানের অবতারকালে বাস্তব দেহসম্বন্ধ মনে করেন, তাহা সঙ্গত নহে। ভগবান্ নিত্য বিভু সচ্চিদানন্দঘন নির্গুণ পরমাত্মা—তাঁহার কি ভৌতিক, কি মায়িক, কোনরূপ দেহই সম্ভবে না। তবে যে অবতারকালে তাঁহার দেহিত্ব প্রতীত হয়, তাঁহাকে মূর্তিধারী বলিয়া মনে হয়—তাহা মায়া মাত্র।" অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দের সে মূর্তি—পারমার্থিক ত নহেই, প্রাকৃতিকও নহে—তাহা প্রাতিভাসিক মাত্র।

এইরূপ কোন কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, যিশুর যে অবতার-শরীর, তাহা অপ্রাকৃত শরীর—তাহা শরীরই নয়—একটা প্রতিভাস (appearance or simulacrum) মাত্র। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যিশুখ্রীষ্ট বা শ্রীচৈতন্যের শরীরের যে পরিচয় আমরা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে পাই, তাহাতে দেখি, তাঁহাদের অধিষ্ঠিত দেহও আমাদেরই দেহের মত—হ্রাসবৃদ্ধির অধীন, জন্মমৃত্যুর অধিকৃত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের দেহত্যাগের পর সেই সেই দেহের সৎকার করা হইয়াছিল। যিশুখ্রীষ্টের দেহ ক্রুশে শলাকাবিদ্ধ হইলে তাঁহার সেই ক্ষত হইতে রক্তপাত হইয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়া গমনকালে চৈতন্যদেবের দেহ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল। অতএব এই সকল অবতারের দেহকে প্রতিভাস বা simulacrum মনে করা কোন মতেই সঙ্গত নয়।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, অবতারের দেহ যদি আমাদেরই মত রক্তমাংসের দেহ হয়, তবে অবতার-গ্রহণের প্রণালী কি? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করেন নাই। আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে আমি যথাসাধ্য এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব এস্থলে বিস্তার না করিয়া সংক্ষেপে আমার সিদ্ধান্তের বিবৃতি করিব।

বাদ দ্বিবিধ—দ্বৈত ও অদ্বৈত। দ্বৈত-দৃষ্টিতে অবতার গ্রহণের প্রণালী একরূপ—অদ্বৈত-দৃষ্টিতে অন্যরূপ। প্রথম অদ্বৈত-দৃষ্টি বুঝিবার চেষ্টা করি।

এ দেশে আমরা যাহাকে সংবিৎ বলি—পাশ্চাত্য দর্শনে তাহার নাম consciousness. এই সংবিৎ সাধারণতঃ আমাদের মস্তিষ্ক-দ্বার দিয়াই প্রকাশিত হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সংবিৎ একটা ব্যাপক বস্তু—মস্তিষ্ক-দ্বারে তাহার ভগ্নাংশ মাত্র ব্যক্ত হয়—অধিকাংশই অব্যক্ত বা subliminal থাকে। সংবিতের এই তথ্য বুঝাইতে তত্ত্বদর্শী মায়ার সাহেব ব্যক্ত সংবিৎকে সাগরে ভাসমান তুষার-স্তূপের সহিত তুলিত করিয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জলপূর্ণ কাচের গেলাসে এক টুকরা বরফ ছাড়িয়া দিলে ঐ বরফের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র (বোধ হয়, সাত ভাগের এক ভাগ) জলের উপরে ভাসে—বাকি অংশ জলের নীচে ডুবিয়া থাকে। তুষারস্তূপের সম্বন্ধেও ঐরূপই দেখা যায়। শীতপ্রধান উত্তর-সমুদ্রে গ্রীষ্মঋতুর আরম্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় ভাঙ্গিয়া

আসে। ঐ সকল পাহাড়ের দশ হাত যদি জলের উপরে ভাসে, তবে অন্ততঃ ৭০ হাত জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন বলিতেছেন, জীব-সংবিৎও ঐরূপ। ইহা একটা প্রকাণ্ড বস্তু, কিয়দংশ মাত্র মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকাশিত হয়—যাহাকে brain consciousness বলে। ইহাই যেন বরফস্তূপের জলের উপরিভাগে ভাসমান ভগ্নাংশ; কিন্তু ইহার অধিকাংশ subliminal অর্থাৎ, জাগ্রৎ অবস্থায় অব্যক্ত থাকে—ইহাই যেন বরফস্তূপের জলমগ্ন অবশিষ্টাংশ। দিব্যদৃষ্টি, প্রাগ্‌দৃষ্টি, সাইকোমেটরি, সফল স্বপ্ন, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐ subliminal সংবিৎ (যাহা জাগ্রদ্দশায় অব্যক্ত বা subliminal ছিল) সেই সংবিৎ উপরে কতকটা ভাসিয়া উঠে এবং আমরা ঐ ব্যাপকতর সংবিতের (larger consciousness-এর) ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হই। এই Subliminal consciousness সম্বন্ধে স্তর অলিভার লজ লিখিয়াছেন—

> The doctrine is roughly that we are each of us larger than we know; that each of us is only a partial incarnation of a larger self. The individual, as we know him, is an incomplete fraction ·· The incarnate fraction varies in different individuals, from something almost insignificant to something rather magnificent and striking, but in no case is the whole self manifested in any given individual.—*Making of Man.*

অর্থাৎ মস্তিষ্কের দ্বার দিয়া আমাদের যেটুকু প্রকাশিত হয়, আমরা প্রত্যেকে তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা আমাদের ব্যাপকতর সংবিতের পরিমাণ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র, কারণ, brain consciousness (যাহাকে এদেশের ভাষায় জাগ্রৎ-সংবিৎ বলা হয়) সমস্ত জীবের কতটুকু?

সেই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা জাগ্রৎ-সংবিতের উপর স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং যোগসিদ্ধের পক্ষে তুরীয় ও নির্বাণ সংবিতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, নির্বাণ অবস্থাতেই সংবিতের সম্পূর্ণ সম্প্রসারণ হয়। স্তর অলিভার লজও বলিতেছেন, সংবিতের ব্যাপকতার ইয়ত্তা করা যায় না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে 'শারীর' সংবিৎ এত বৃহৎ ভাবে ব্যক্ত হয় যে, আমরা তাহার মহীয়সী প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া সমাদর করি।*

এই যে ব্যাপক সম্বিৎ, অদ্বৈতবাদীর মতে উহাই ব্রহ্ম—উহার উদয়াস্ত নাই, অপচয়-উপচয় নাই, উহা অখণ্ড অব্যয় অদ্বয়। কেবল উপাধির ভেদে ঐ ব্রহ্ম-জ্যোতির

---

* How large a subliminal self may be, one does not know. ··· In some cases it may happen that the portion incarnate is so great that the embodied personality exhibits the phenomenon of transcendent genius and is by universal consent accounted 'a great man.'—*Making of Man.* Ch. ix.

প্রকাশের তারতম্য—বস্তুতঃ তাহার প্রভেদ বা পরিচ্ছেদ নাই—উপাধির্ভিদ্যতে ন তদ্বান্‌ এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্‌
আপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্‌

—'এক সূর্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে বহুরূপে প্রতীয়মান হন—ইহাও তদ্রূপ।'

একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি বিশদ হইতে পারে। ধরুন, একটা প্রকাণ্ড ডোমের মধ্যে একটি মহোজ্জ্বল তাড়িতবর্তি রাখা গেল। ডোমটি কতকগুলি পরকলা দ্বারা গঠিত—কেহ অস্বচ্ছ, কেহ অর্দ্ধ-স্বচ্ছ, কেহ স্বচ্ছ—কয়েকটি পরকলা রঙীন, দুই একটি শ্বেত-শুভ্র। এরূপ স্থলে ডোমের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতির প্রকাশে তারতম্য ঘটিবে না কি?

যে পরকলাগুলি অস্বচ্ছ (opaque)—তাহাদের মধ্য দিয়া ঐ জ্যোতিঃ প্রায় অপ্রকাশই থাকিবে। যে পরকলাগুলি অর্দ্ধ-স্বচ্ছ, তাহাদের মধ্য দিয়া জ্যোতির আংশিক প্রকাশ হইবে মাত্র। আর যেগুলি প্রায় স্বচ্ছ, যদি মাজিয়া ঘষিয়া তাহাদিগকে বেশ স্বচ্ছ করা যায়—তবে তন্মধ্য দিয়া জ্যোতির পূর্ণ প্রকাশ হইবে। এইরূপ রঙীন পরকলাগুলি জ্যোতির সহজ শুভ্রতাকে রঞ্জিত করিবে। কিন্তু যে পরকলা শ্বেতশুভ্র, তাহার মধ্য দিয়া যে জ্যোতিঃ বহির্গত হইবে, তাহার প্রকাশ অবিকৃত থাকিবে।

অদ্বৈতবাদী বলেন, আমরা প্রত্যেকে ঐরূপ এক একটি পরকলা। যে অখণ্ড ব্রহ্মজ্যোতিঃ অপ্রাকৃত ধামে চির জ্যোতিষ্মান্‌—সেই জ্যোতিঃ প্রপঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন জীব-পরকলার উপাধিযোগে বিচিত্র আকারে ও বিবিধ বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যদি কোন উপাধি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়, যদি কোন পরকলার সমস্ত মলা মলিনতা বিধৌত হইয়া সে একেবারে অনাবিল, একান্ত শ্বেতশুভ্র হয়—তবে সেই দ্বার দিয়া ব্রহ্ম-জ্যোতির যে অবাধ মহিমা ও অপার ঐশ্বর্য প্রকটিত হইবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? আমরা যাঁহাদের অবতার বলি, তাঁহারা ঐরূপ একান্ত অনাবিল শ্বেতস্বচ্ছ পরকলা—সে জন্য তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্যোতির যে প্রকাশ হয়, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া লোক আনন্দে উৎফুল্ল ও ভক্তিতে উদ্বেল হইয়া উঠে। অদ্বৈত-দৃষ্টিতে ইহাই অবতার-তত্ত্ব।

এইবার দ্বৈত-দৃষ্টির কথা বলি। অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন—অদ্বৈতবাদের মহাবাক্য—সোঽহং, তত্ত্বমসি।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ —উপনিষদ্‌

দ্বৈতবাদে কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকৃত—

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশৌ—শ্বেতাশ্বতর

'জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন—জীব অজ্ঞ অনীশ্বর, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।' কেবল তাহাই নয়—বিভিন্ন শরীরের অধিষ্ঠাতা বা চালক জীব ভিন্ন ভিন্ন। আমার দেহপুরীর স্বামী আমি—আপনার দেহপুরীর স্বামী আপনি। আপনি ও আমি স্বতন্ত্র।

কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ ঘটনা বিরল নয় যে, কখন কখনও এক জীব অন্য জীবের

দেহে অনধিকার প্রবেশ করিয়া প্রকৃত মালিককে স্থানচ্যুত বা বেদখল করে। এ ব্যাপারকে আমরা এদেশে 'আবেশ' বলি—পশ্চিমে ইহার নাম Control বা Possession.

> What is meant is that the human body may become separate from its ordinary tenant and another tenant may step into it.—Annie Beasant.

এই আবেশ সম্পর্কে মায়ার্স সাহেব তাঁহার *Human Personality* গ্রন্থে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন—কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই :—

> If we analyse our observations of possession, we find two main factors—the central operation, which is the control by a spirit of the sensitive's organism and the indispensable pre-requisite which is the partial and temporary desertion of that organism by the percipient's own spirit

অর্থাৎ, আবেশস্থলে পর পর দুইটি ব্যাপার ঘটিতে দেখা যায় :—প্রথমতঃ যিনি আবেশের পাত্র হইবেন, তাঁহার সংবিৎ বা আত্মা স্বীয় দেহ ছাড়িয়া সাময়িক ভাবে বাহিরে অবস্থান করে এবং সেই সুযোগে আগন্তুক আবেশকারীর সংবিৎ বা আত্মা (spirit) সেই শূন্য পুরীতে প্রবেশ করিয়া ঐ আবিষ্টের শরীর দখল করিয়া বসে। ভূতাবেশস্থলে আরও দেখা যায় যে, কখন কখন দুষ্ট ভূত বা প্রেত বলপূর্ব্বক মালিককে বেদখল করিবার উদ্যোগ করিতেছে এবং মালিক নিজের দখল বজায় রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তখন উভয়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহারই ফলে আবিষ্টের দেহে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ-সকল ফুটিয়া উঠে।

প্রেততত্ত্ববাদী বা স্পিরিচুয়ালিষ্টদিগের বৈঠকে (seanceএ) 'মিডিয়মে'র দেহে আগন্তুক প্রেতের আবেশ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ঐ অবস্থায় প্রায়ই মিডিয়ম অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে ঐ আগন্তুক প্রেত আংশিক বা পূর্ণ ভাবে প্রবেশ করে। কেহ কেহ আবেষ্টা যে আবিষ্ট হইতে ভিন্ন ব্যক্তি—এ কথা স্বীকার করিতে চান না—তাঁহারা বলেন, ঐ ঐ স্থলে আবিষ্টের Personalityর একাংশই আবেষ্টারূপে প্রতীয়মান হয়। মায়ার্স এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন—আবেশস্থলে আবিষ্টের আত্মা অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাহার স্থূল শরীর ত্যাগ করিলে কোন আগন্তুক আত্মা তাহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরীরের চালনা করে।

> The automatist (আবিষ্ট), in the first place, falls into a trance, in which his spirit partially quits his body ·· so as to leave room for an invading spirit to use it in somewhat the same fashion as its owner is accustomed to use it.

এ কথার প্রমাণে মায়ার্স বলেন—আবেশকারী যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহার লেখার ছাঁদে,

কথার স্বরে, বাক্যের ভঙ্গিতে তাহা প্রমাণিত হয়। কখনও বা আবিষ্টের সম্পূর্ণ অজানা সংবাদ তাহার বচনে বা লিখনে প্রকাশিত হয়।

> The controlling spirit proves his identity mainly by reproducing in speech or writing, facts which belong to his memory and not to the automatist's memory He may also give evidence of supernormal perceptions of other kinds.

পাশ্চাত্ত্য প্রেততাত্ত্বিকেরা প্রেতের সমস্তা লইয়া এতই ব্যস্ত যে, প্রেত ভিন্ন অন্ত জীবের যে আবিষ্টের দেহে আবেশ ঘটিতে পারে, একথা তাঁহারা আলোচনা করিবার বা লক্ষ্য করিবার অবসর পান না। কিন্তু ভূতাবেশ যেমন প্রমাণসিদ্ধ, দেবাবেশও সেইরূপ প্রমাণসিদ্ধ। অনেক স্থলে উন্নত পুরুষ, কখনও বা মুক্ত পুরুষ—কোন কোন শুদ্ধ আধারে আবিষ্ট হয়েন। এ সম্বন্ধে এদেশের ও বিদেশের ধর্ম-সাহিত্য বহু প্রামাণিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

'শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে' দেখা যায়, শঙ্করাচার্য্য কামকলা শিক্ষার জন্য অমরু রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ সম্বন্ধে এই ধরণের ঘটনার উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপ বেশ উন্নত সাধক ছিলেন।

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিদান॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণকথা রঙ্গে॥—চৈতন্যভাগবত

এই বিশ্বরূপ যৌবনে বিরাগী হইয়া নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেন এবং কয়েক বৎসর মধ্যে পুণার সন্নিহিত পান্‌চারপুরে দেহরক্ষা করেন। বৈষ্ণবগ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায়, বিশ্বরূপের তিরোধানের পর যখন শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার লীলার সহায়তা করিবার জন্য বিশ্বরূপ নিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করিলেন।

মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ।—চৈতন্যভাগবত

এই আবেশের ফলে নিত্যানন্দের আকৃতি এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হইত যে, শচীমাতা অনেক সময় নিত্যানন্দকে বিশ্বরূপ বলিয়া ভ্রম করিতেন।

হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর।—চৈতন্যভাগবত

যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর নীলাচলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং নিত্যানন্দকে বাংলা দেশে প্রচারকার্যে নিয়োজিত করিলেন, তখন দুই জনের মধ্যে বিচ্ছেদ হইল। তখন বিশ্বরূপ কি করিলেন? তিনি নিত্যানন্দের শরীর ছাড়িয়া পরমানন্দপুরীর দেহে আবিষ্ট হইলেন। সেই জন্য দেখিতে পাই, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে মহাপ্রভু বলিতেছেন :—

অহো পরমানন্দপুরীশ্বরঃ তাবন্মুনীন্দ্রমাধবপুরীশ্বরস্য শিষ্যঃ, যত্র খলু অগ্রজস্য বিশ্বরূপস্য সমগ্রম্, ঐশ্বর্য্যং তেজঃ প্রবিষ্টম্।

খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে যে নষ্টিক্ (gnostic) সম্প্রদায় আছে, সেই সম্প্রদায়ের লোকদিগের পূর্বাপর বিশ্বাস যে, যিশু ও খ্রীষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি এবং মেরীর পুত্র যিশুর প্রাকৃত দেহে অপ্রাকৃত তত্ত্ব ক্রাইষ্টের আবির্ভাব হইয়াছিল। ক্রাইষ্ট যিশুর দেহে তিন বৎসর মাত্র বসতি করিয়া লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ম্যাথু ও জনের কাহিনীতে দেখা যায়, যিশু যখন যৌবনের মধ্যসীমায় উপনীত, তখন জন্ দি ব্যাপটিষ্ট তাঁহাকে দীক্ষিত করেন। জন্ যিশুকে দীক্ষাদান করিলে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া ঐশ তেজঃ (Spirit of God) সুপর্ণের রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিল এবং যিশুর উপর আপতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল, "এই আমার প্রিয় পুত্র, আমার অশেষ প্রীতিভাজন।"

> Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptised of him. ··· And Jesus, when he was baptised, went up straitway out of the water · and, lo, the heavens were opened unto him and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him.
>
> And lo ! a voice from heaven saying, 'This is my beloved Son, in whom I am well pleased.'—Matthew, Ch III, 14, 16-7

যাহাকে আমরা অবতার বলি, সেও এইরূপ আবেশের ব্যাপার। যিনি অবতীর্ণ হন—তা তিনি পুরুষোত্তম ভগবান্ই হউন অথবা ভগবানের স্বাধর্ম্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষই হউন—তিনি ব্যক্তিবিশেষের দেহে আবিষ্ট হন। অর্থাৎ, ঐ দেহ তাঁহার সাময়িক বাহন বা উপাধি হয়। অবশ্য ঐ দেহ শুদ্ধ, পূত, অপাপবিদ্ধ হওয়া চাই। ভূতাবেশ স্থলে আগন্তুকের অনধিকার প্রবেশ, কিন্তু অবতার স্থলে নির্বাচিত বাহন স্বেচ্ছায় স্বদেহ সাময়িক ভাবে নিবেদন করেন এবং অবতার সেই দেহে আংশিক বা পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়া নিজের মহিমা ও মাধুর্য প্রকাশিত করেন। দ্বৈতদৃষ্টিতে ইহাই অবতারগ্রহণের প্রণালী।

আমার 'অবতার-তত্ত্বে' আমি যিশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব, পরশুরাম, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণসম্পর্কিত প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই আবেশতত্ত্ব বিশদিত ও প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

অবতার সম্পর্কে আরও অনেক বক্তব্য আছে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহা আলোচ্য নয়।

ভারতচন্দ্রের একখানি পুঁথি

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্, এফ্-আর্-এ-এস-বি

কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি প্রধান কাব্যগ্রন্থ, এবং ইহার রচনার কাল হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম মধুসূদন রঙ্গলাল প্রমুখ সাহিত্যিক ও কবিগণের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত, এক শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া 'অন্নদামঙ্গল'-কে বাঙ্গালা ভাষার সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ বলিয়া ধরিতে পারা যায়। অবশ্য, রামায়ণ মহাভারত চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি বাঙ্গালার জনসমাজে আদৃত হইত, কিন্তু মুখ্যতঃ পৌরাণিক আখ্যান হিসাবে লোকের কাছে ঐ পুস্তকগুলির আদর ছিল—কাব্যরসের আস্বাদনের জন্য, সুকুমার সাহিত্য হিসাবে, 'অন্নদামঙ্গল'-ই প্রথম ও প্রধান কাব্যগ্রন্থ ছিল। বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যসৌন্দর্য সম্বন্ধে আমরা, অর্থাৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বহির্ভূত সাধারণ বাঙ্গালী, অতি অল্পকাল হইল, মাত্র উপস্থিত দুই এক পুরুষের মধ্যে, সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছি। কোনও লেখকের লোকপ্রিয়তার একটী বড় প্রমাণ এই যে, তাঁহার রচনা হইতে বহু বচন বা ভাব সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিয়া থাকে, অনেক সময়ে তাঁহার রচিত বচন ভাষায় প্রবাদের মতন সকলের মুখে মুখে ফিরে। আমরা এখন বৈষ্ণব পদকার "চণ্ডীদাস"-কে শত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পুনরাবিষ্কার করিযাছি—চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদের সংগ্রহের প্রকাশ দ্বারা, সাহিত্যিক আলোচনা দ্বারা, শিক্ষিত সমাজে কীর্তন-সঙ্গীতের পুনঃপ্রচারের দ্বারা, বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মমত শ্রদ্ধার সহিত বাঙ্গালী শিক্ষিতজন কর্তৃক আলোচনার ফলে, এবং ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে, নাটক ও চলচ্চিত্রের সহায়তায়, "চণ্ডীদাস" এখন বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহার রচনা বলিয়া "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ," "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" প্রভৃতি বহু পদাংশ আমরা সকলেই আওড়াইতেছি, আলাপে ও রচনায় উদ্ধার করিতেছি। আমার মনে হয়, বাঙ্গালার পুরাতন (অর্থাৎ ইংরেজী সভ্যতার ও মনোভাবের প্রচারের পূর্বেকার) যুগের বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে যত পয়ার বা ত্রিপদী বা পদাংশ অথবা বাক্য বাঙ্গালা ভাষায় প্রবচন বা প্রবাদ রূপে আপনা হইতেই গৃহীত হইয়াছে, এমন আর কোনও কবির লেখা হইতে হয় নাই।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল, আনুমানিক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে। তাঁহার জীবৎকালে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রথম তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রণের সময় পর্যন্ত, হাতে লেখা পুঁথিতে তাঁহার রচনা

লোকসমাজে প্রচারিত হইত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের সংস্করণের পরে ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা সিমুলিয়ার "পীতাম্বর সেন দিগরের" (and Company-র খাসা বাঙ্গালা তরজমা—"দিগরের") ছাপাখানায় "অন্নদামঙ্গল—বিদ্যাসুন্দর" মুদ্রিত হয়। তাহার পরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একখানি সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত করেন। কবির মৃত্যুর পরে ষাট বৎসরের মধ্যে তাঁহার রচিত কাব্য সমগ্রভাবে মুদ্রিত হওয়ায়, উক্ত গ্রন্থে বিশেষ পাঠবিকৃতি ঘটিতে পারে নাই। গঙ্গাকিশোর-প্রমুখ প্রথম সংস্কর্তা ও প্রকাশকগণ যে পুঁথি বা পুঁথিসমূহ অবলম্বন করিয়া বই ছাপান, সে সমস্ত পুঁথি ভারতচন্দ্রের সময়ের কত কাছাকাছি লিখিত হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় ভারতচন্দ্রের কাব্যের তারিখ দেওয়া ছয়খানি পুঁথি আছে, এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনটীর তারিখ হইতেছে ১২০৪ সাল (=১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), তাহার পরে আছে ১২০৯ সাল (=১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ), ১২২৮ সাল (=১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ), ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৫১ শক (=১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ), ১২৩৯ সাল (=১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। খণ্ডিত তারিখ-বিহীন পুঁথিও কতকগুলি আছে। বাঙ্গালা দেশে বা অন্যত্র বাঙ্গালা-পুঁথি-সংগ্রহ-সমূহে ভারতের এইরূপ পুঁথি আরও মিলিতে পারে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের একটী যুগোপযোগী প্রামাণিক এবং সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালার ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যশিল্পী হিসাবে এরূপ একটী সংস্করণ না থাকা বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা। আমাদের সাহিত্যিকগণের মধ্যে ভারতচন্দ্রের গুণগ্রাহী সমালোচকের অভাব নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম,—তাঁহার সম্পাদনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যটী প্রকাশ করার কথা এক সময়ে আমাদের অনেকেরই মনে হইয়াছিল। সম্প্রতি সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত, বাঙ্গালার সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যালোচক সমাজে সুপরিচিত "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"-তে, ভারতচন্দ্রের একটী প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ভারতচন্দ্রের পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন।

পারিসের 'বিব্লিওতেক নাসিওনাল' বা ফরাসী জাতীয় গ্রন্থাগারের ভারতীয় পুঁথির সংগ্রহের মধ্যে একখানি বিদ্যাসুন্দরের পুঁথি আছে; A Cabaton আ. কাবাতঁ-সংকলিত উক্ত পুঁথিসংগ্রহের তালিকায় এই সংবাদ পাইয়া, ব্রজেন্দ্র-বাবু ও সজনী-বাবু, এইবার যখন আমি ইউরোপে যাই তখন আমায় অনুরোধ করেন, সম্ভব হইলে পারিসে ঐ পুঁথিটী যেন আমি দেখিয়া আসি। তদনুসারে আমি এই বৎসরের (১৩৩৮ সালের) জুলাই মাসে ও সেপ্টেম্বর মাসে পুঁথিখানি দেখি। সুখের বিষয়, পুঁথিতে লিখনের তারিখ দেওয়া আছে; সন ১১৯১ সাল ১৪ কার্তিক তারিখে ইহার লিখন সমাপ্ত হয়; ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই পুঁথি; উপস্থিত আমাদের গোচর-মত ইহাই হইতেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যের সবচেয়ে প্রাচীন পুঁথি।

Augustin Aussant ওগুস্তাঁ ওসাঁ নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক চন্দননগরে অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে ছিলেন, ইনি ফরাসী সরকারের বাঙ্গালা দোভাষীর কাজ করিতেন। ইঁহার সংকলিত ফরাসী-বাঙ্গালা অভিধান অমুদ্রিত অবস্থায় পারিসের বিব্লিওতেক্ নাসিওনাল-এ রক্ষিত আছে—এই অভিধানে বাঙ্গালা শব্দগুলি ফরাসী বানানে রোমান অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, 'ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃঃ ১৩৬-১৩৭)। পুঁথিখানি ইঁনিই ভারতবর্ষ হইতে পারিসে লইয়া যান।

পুঁথিখানি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ২৫ বৎসরের মধ্যে লিখিত। সাধারণ অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা পুঁথি, একটু বড় আকারের লম্বা চওড়া পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৫০। পুঁথির আরম্ভে ফরাসী ভাষায় টানা হাতের লেখায় মন্তব্য লেখা আছে—Calikkya Mongol ou Biddya Choundour Oupoyekhyana—Mariage de Biddya et Choundour sous l'approbation de Calikkya femme de la Divinite´ Chib, tire´ de l' Histoire de la ditte Divinite´—coppie´ en 1784 ; তদনন্তর, অন্য হাতে লেখা, Poème Bengali modern intitule´ Vidyasundara ou les Amours de Vidya´ et de Sundara. MS Bengaly d 'Aussaint. অর্থাৎ, 'কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান—শিব দেবতার স্ত্রী কালিকার অনুমোদন অনুসারে বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ, উক্ত দেবতার ইতিহাস (বা পুরাণ) হইতে উদ্ধৃত, ১৭৮৪ সালে অনুলিখিত ; বিদ্যাসুন্দর অর্থাৎ বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম নামক আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য,——ওস্যাঁর (·আনীত) বাঙ্গালা পুঁথি'।

এই পুঁথির লেখা সর্বত্র গোটাগোটা ও সহজপাঠ্য। ইহার আরম্ভ এই রূপ—"৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ। অথ অন্নপূর্ণা ঠাকুরানির পুস্তক লিক্ষতে। কবি সক্তী শ্রী ভারথচরণ রায়। আজ্ঞা শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়।" ইত্যাদি।

তদনন্তর, "আজ আমার প্রাণ কেমন লো করে না দেখি তাহারে॥" এই ছত্রশীর্ষক গান দিয়া পালা আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার সমাপ্তি এই রূপ—"বিদ্যাসুন্দরে লইয়া কালিকা কৌতুকী হয়্যা কৈলাসেতে করিলা প্রবেস। কালিকা-মঙ্গল সায়ঃ ভারথ ব্রাহ্মণে গায়ঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেস॥ ইতি কালিকামঙ্গল সমাপ্ত। সন ১১৯১ সাল তারিখ ১৪ কার্তিক।'

এই পুঁথিখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে পারিসে বিশেষ উদ্বেগের সময় গিয়াছিল, আর নানা কাজে নকল করিবার সময় হয় নাই, সমস্তটার ফোটোগ্রাফ আনাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। প্রামাণিক সংস্করণের জন্য এই পুঁথি প্রাচীনতম বিধায় আমাদের মিলাইয়া দেখা দরকার। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের সর্বপ্রাচীন পুঁথিখানির তুলনায় বোধ হয় পারিসের এই পুঁথি খুব বেশী বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইবে না।

ভারতচন্দ্রের পুঁথিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহার কাব্যের একটা নাম

স্থির-নির্ধারিত হয় নাই। 'কালিকামঙ্গল,' 'অন্নদামঙ্গল,' 'বিদ্যাসুন্দর,' 'কালিকাপুরাণ' এই রূপ বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। তবে 'অন্নদামঙ্গল' নামটাই সমধিক প্রচলিত ছিল। প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে এই নামই পাই।

আধুনিক সংস্করণে ভাষা অল্পবিস্তর আধুনিক রূপ পাইয়া বসিয়াছে, ১৭৮৪-র পুঁথি সে বিষয়ে আমাদিগকে অনেকটা সংশোধন করিয়া দিবে। পুঁথির পাঠে দেখা যায়, এখনকার "মাথা খেতে এলি মোর" অষ্টাদশ শতকে ছিল "মাথা খাত্যি আল্যি মোর"। পুঁথির পাঠে দুই পাঁচটা শব্দও প্রাচীন রূপেই মিলিতেছে—ফরাসী Hollandaise 'ওলাঁদেজ্' হইতে বাঙ্গালা 'ওলন্দাজ', এই পুঁথিতে 'ওলন্দেজ' রূপে পাই। পুঁথিতে—এমন কি, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পরও যে সব পুঁথি লিখিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কোনও-কোনওটাতে—'ভারতচন্দ্র' এই নামটা বহুশঃ 'ভারথচন্দ্র' রূপে পাই। সংস্কৃতে ত-কার যুক্ত 'ভারত' রূপই প্রচলিত; কিন্তু থ-কার যুক্ত 'ভারথ'-রূপও প্রাচীন ভারতে কথ্য ভাষায়—যে ভাষার আধারে সাহিত্যিক সংস্কৃত গঠিত হইয়াছিল তাহাতে—বিদ্যমান ছিল; এই 'ভারথ' শব্দ, প্রাকৃতে 'ভারধ' ও 'ভারহ' রূপ গ্রহণ করে, এবং ইহা মধ্য-যুগে হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতিতে 'ভারথ' রূপেই গৃহীত হয়। প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রায় সর্বত্র 'ভারত' অপেক্ষা 'ভারথ' শব্দই অধিকতর ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—'মহাভারথ, ভারথ-পুরাণ' প্রভৃতি শব্দে। ভারতচন্দ্রের নামেও এই অসংস্কৃত রূপ হাতের লেখা পুঁথিতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে—কেবল ছাপার সময়ে সংস্কৃত শুদ্ধ রূপই গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ভাষায় 'ভারত – ভারথ' এই দুই রূপের পাশাপাশি অবস্থান, একক বা বিশিষ্ট ব্যাপার নহে; চীনা ভাষায় রামায়ণের আখ্যানের তিনটি অনুবাদ হয়, তাহার দুইটাতে রাজা দশরথের নাম 'দশ-রথ' রূপেই আছে, অন্যটাতে 'দশ-রত' রূপে পাওয়া যাইতেছে; চীনারা সাধারণতঃ বড়-বড় সংস্কৃত নাম চীনা অক্ষরে প্রতিবর্ণীকরণ দ্বারা জানাইত না, অনুবাদ করিয়া লইত, Ten-Chariots ('দশ-রথ'), এই রূপ অনুবাদের পার্শ্বে আবার Ten-Pleasures ('দশ-রত') অনুবাদ হইতে, 'দশ-রত' শব্দের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে আর্য ভাষার আদি-যুগে 'ত' ও 'থ' প্রত্যয়দ্বয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ফলে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

ভারতচন্দ্রের শব্দসম্পদ্ বিশেষ লক্ষণীয়। বোধ হয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম্ এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শব্দসংখ্যায় তুল্যমূল্য হইবেন। ভারতচন্দ্রের ব্যবহৃত বহু শব্দ মুদ্রিত পুস্তকে বিকৃত রূপে পাওয়া যায়, এগুলির পুরাতন বা যথাযথ রূপ পুঁথি দৃষ্টে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলে, শব্দগুলির ব্যাখ্যাও সহজ হইবে। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালা দেশের গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে, এই দেশের নাগরিকতার একমাত্র প্রকাশক ছিলেন কবি ভারতচন্দ্র। অষ্টাদশ শতকের বাঙ্গালার সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে আশা করি মৌজুদ পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে।

রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র পূর্ব্বে দুই এক জন বাঙালী কবি ইংরেজী কাব্যের প্রভাবে পড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে কাব্যরচনার সূত্রপাত করিয়া থাকিলেও আমরা যেমন আজও পর্য্যন্ত তাঁহাকেই আধুনিক পদ্ধতির সর্ব্বপ্রথম কবি হিসাবে সম্মান করিয়া থাকি, রামনারায়ণ তর্করত্ন—বা নাটুকে রামনারাণকেও তেমনি দুই চারি জন পূর্ব্বগামী নাট্যকারের নাট্যপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও সর্ব্বপ্রথম আধুনিক নাট্যশিল্পীর সম্মান দিয়া থাকি। ইহার কারণ এই যে, মাইকেলের মত তিনিও অসাধারণ শিল্পপ্রতিভাবলে মৃত ও প্রণালীবদ্ধ গতানুগতিকতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলা দেশে যে রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারই কবিকীর্ত্তির দ্বারা তাহা সর্ব্বপ্রথম সার্থকতা লাভ করে। ইহা এক হিসাবে অধিকতর বিস্ময়কর এই কারণে যে, বহুভাষাবিৎ মাইকেল ইউরোপীয় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দীর্ঘকাল কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলঙ্কারের অধ্যাপকমাত্র ছিলেন, ইউরোপীয় বা আধুনিক পদ্ধতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ কোনই পরিচয় ছিল না। সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, তিনি অধ্যাপক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন—তাঁহার এই সকল পরিচয় আজিকার দিনে প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ নাট্যকার হিসাবে তিনি আজিও সগৌরবে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার জীবনী ও কীর্ত্তির পুনরালোচনা সহৃদয় বাঙালী পাঠকের নিকট অনাবশ্যক বিবেচিত না হইতেও পারে।

বাল্য ও ছাত্র-জীবন

২৬ ডিসেম্বর ১৮২২ তারিখে চব্বিশ-পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি গ্রামে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। রামনারায়ণ "বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন" করেন।

রামনারায়ণ শৈশবেই পিতামাতাকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার কোন পরিচিত বন্ধু লিখিয়াছেন, "তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* ও তৎপত্নী কর্ত্তৃক

* প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ১৩৪৪ সালের প্রথম সংখ্যা (পৃ ২৫-৩০) ও ১৩৪৫ সালের প্রথম সংখ্যা (পৃ ২১) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় আমি আলোচনা করিয়াছি।



পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন

লালিত হইয়া পিতৃ মাতৃ বিয়োগ কষ্ট অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার গুণোদ্ঘোষণ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, 'তিনি শৈশবে আমায় মাতৃস্নেহে পালন না করিলে বোধ হয় শৈশবেই আমার সত্তা লোপ হইত'।'*

১৮৪৩ সনের আগষ্ট মাসে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হন। এই সময় রামনারায়ণ ভ্রাতার নিকট থাকিয়া, সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৩ সনের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত—দশ বৎসর তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র হিসাবে কলেজে তাঁহার সুনাম ছিল।

কর্ম্মজীবন

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। রাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কয়েক জন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় সিঁদুরিয়াপটীর ৺রামগোপাল মল্লিকের বৃহৎ বাটীতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সহিত শীল্‌স কলেজ ও ডেবিড হেয়ার অ্যাকাডেমিও সংযুক্ত হইয়াছিল। এই কলেজের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত রাণী রাসমণি দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।† কলেজের কার্য্য আরম্ভ হয় "১৮৫৩ সালের ২রা মে সোমবার"।‡ রামনারায়ণের অধ্যাপনা বিষয়ে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

> শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় হিন্দু মিট্রোপলিটন কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, ইনি অতি সুপণ্ডিত, ও সংস্কৃত কালেজের একজন বৃত্তিধারি ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন পঠনেও বিশেষ পারদর্শী, পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক লিখিয়া রঙ্গপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কালেজ বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।—'সংবাদ প্রভাকর,' ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩।

২২ অক্টোবর ১৮৫৩ তারিখে রামনারায়ণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদিগের উপদেশার্থ বিদ্যা-বিষয়ক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার

---

* "কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৬।

† 'সংবাদ প্রভাকর,' ১৩ মে ১৮৫৩। ‡ ঐ ৩০ এপ্রিল ১৮৫৩।

প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও তাহার মূল্য আছে। তিনি বলেন :—

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না ; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশ ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে ॥

রামনারায়ণ দুই বৎসর অতীব যোগ্যতার সহিত হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

১৫ই জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১এ ডিসেম্বর ১৮৮২ সন পর্য্যন্ত—অন্যূন সাড়ে সাতাশ বৎসর রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে তিনি কখন কি পদে কত বেতনে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যে দিতেছি :—

পদ	বেতন	কার্য্যকাল
অধ্যাপক, ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণী	৪০৲	১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে ৩১ মার্চ ১৮৬০
ঐ ৪র্থ ঐ	৪০৲	১ এপ্রিল ১৮৬০ হইতে ১১ জুন ১৮৬৩
	৪৫৲	১২ জুন ১৮৬৩ হইতে ২৩ মার্চ ১৮৬৪
ঐ ৩য় ঐ	৫০৲	২৪ মার্চ ১৮৬৪ হইতে ৩০ জুন ১৮৭৩
দ্বিতীয় ব্যাকরণ-পণ্ডিত, সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুল	৬০৲	১ জুলাই ১৮৭৩ হইতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪
প্রথম ব্যাকরণ-পণ্ডিত ঐ ঐ	৬০৲	১ মার্চ ১৮৭৪ হইতে ৭ জুন ১৮৭৪
সহকারী অধ্যাপক—সংস্কৃত, অলঙ্কার প্রভৃতি, সংস্কৃত কলেজ	৮০৲	৮ জুন ১৮৭৪ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৭৯
	৮৫৲	১ আগষ্ট ১৮৭৯ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮০
	৯০৲	১ আগষ্ট ১৮৮০ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮১
	৯৫৲	১ আগষ্ট ১৮৮১ হইতে ৩১ জুলাই ১৮৮২
	১০০৲	১ আগষ্ট ১৮৮২ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮২

৩০ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে রামনারায়ণ পেন্‌সনের জন্য যথারীতি আবেদন

করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ৬ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখে এই আবেদনপত্র সুপারিশ করিয়া শিক্ষা-বিভাগের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ১ জানুয়ারি ১৮৮৩ তারিখ হইতে রামনারায়ণের পেন্‌সন মঞ্জুর হইয়াছিল।* সংস্কৃত কলেজে রামনারায়ণের শূন্য পদে নিযুক্ত হন—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর রামনারায়ণের শেষ দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়াছিল, তাহার বিবরণ তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রকাশ :—

কার্য্যময় জীবন কোন কালে স্থির থাকিবার নয়, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইয়াছিল, শেষাংশও সেই কার্য্য ত্যাগ করিতে পারে নাই। তিনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াও বাটীতে দেশস্থ ব্রাহ্মণ বালকদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য খ্রীঃ ১৮৮৪ অব্দের ৩০শে নবেম্বর রবিবার স্বীয় জন্মগ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশস্থ লোকেরা উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, চতুষ্পাঠীতে বিদেশীয় ছাত্রগণের অবস্থান ব্যয়ের সাহায্য জন্য মাসিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দূরদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া চতুষ্পাঠীতে অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জন্মগ্রামের—অভিশপ্ত হরিনাভি গ্রামের—সৌভাগ্য সুখ সুদূরস্থ—এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তর্করত্ন মহাশয় সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রায় ৬ মাস কাল উদরী রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া ১২৯২ সালের ৭ই মাঘ গত ১৯এ জানুয়ারিতে তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।†

১৯ জানুয়ারি ১৮৮৬ তারিখে রামনারায়ণের মৃত্যু হইলে 'সোমপ্রকাশ' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—

পণ্ডিত ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন।—আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন গত ৭ই মাঘ মঙ্গলবার মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি প্রায় ৬ মাস কাল উদরীরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষা-বিভাগকে রামনারায়ণের পেনসন-সংক্রান্ত যে-সকল কাগজপত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে রামনারায়ণের জন্মতারিখ ও সংস্কৃত কলেজে চাকরির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। পেন্‌সন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে রামনারায়ণের আকৃতির এইরূপ বর্ণনা আছে :—"Height—5 feet 6 inches. Marks—Perpendicular wrinkle between the eye-brows leaning on the right side etc."

† "স্বর্গীয় কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ. ১৫৭।

তর্করত্ন নানাগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহারা ইঁহার সহিত অল্প সময়ের জন্যও আলাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার রসপূর্ণ মিষ্টালাপ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। বাঙ্গালা নাটকের ইনি এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে। এইজন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের প্রসিদ্ধ দেশীয় নাটক অভিনয়ের সময়ে ইনি একমাত্র সহায়কর্তা করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম নাটক এবং এই নাটক হইতে প্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত অনেক নাটক আছে। "নবনাটক" "ধর্ম্মবিজয়" "বেণীসংহার" "চক্ষুদান" প্রভৃতি প্রত্যেক নাটকেই তাঁহার নাম এবং মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কাব্য ও অলঙ্কার বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত কবি আর কেহ ছিল না। তাঁহার প্রণীত "আর্য্যাশতক" ও "দক্ষযজ্ঞ" সর্ব্বত্র বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞ প্রণয়ন করাতে ইংলণ্ডীয় মহাত্মা ই, বি, কাউয়েল ইহাকে "কবিকেশরী" উপাধি পাঠাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কবিত্বশক্তি এতদূর মধুর এবং গাঢ় ছিল যে তাঁহার নাম না থাকিলে কেহ তাঁহার প্রণীত কাব্যগুলি আধুনিক কবির রচিত বলিয়া অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অলঙ্কারের পণ্ডিতরূপে বহুবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ছাত্রদিগের নিরতিশয় শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য ইঁহার এতদূর যত্ন ছিল যে সঞ্চিত অর্থ তিনি ক্রিয়াকলাপে ব্যয় করিতেন। তিনি নিজ বাটীতে একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতি রবিবার বক্তৃতা ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা সভ্যদিগকে উপদেশ দান করিতেন। তাঁহারই যত্নে তাঁহার জন্মভূমি হরিনাভিগ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার নিমিত্ত একটী চতুষ্পাঠী খোলা হইয়াছিল। নিজে অধ্যাপকতা করিয়া অনেক দিন উক্ত চতুষ্পাঠীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তাদৃশ সুবক্তাও ছিলেন। যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতেন তাঁহার মধুর বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলেই ব্যগ্র হইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে রসগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা মুগ্ধ করিতেন। ইঁহার অভাবে আপামর সাধারণ এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজ যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় তাঁহার মাতা পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর দুরবস্থাপন্ন হইয়াও তাঁহার লালনপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি হরিনাভিস্থ প্রসিদ্ধ মধুসূদন বাচস্পতির নিকট প্রথমতঃ ব্যাকরণ, স্মৃতি ও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পূর্ব্বদেশস্থ পোড়া [পুঁড়া ?] নামক গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহারই নিকট অবস্থান করিয়া উক্ত কালেজে অনেক দিন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনিও সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক হয়েন। অধ্যাপকতা বিষয়ে উক্ত কালেজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অবশেষে প্রায় দুই বৎসর হইল পেন্সন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর

কাল পেন্সনভোগ করিয়া প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।—'সোমপ্রকাশ,' ১৩ মাঘ ১২৯২।*

রামনারায়ণের রচনাবলী

রামনারায়ণের রচনাবলীর মধ্যে নাটক ও প্রহসনের সংখ্যাই বেশী। নাটক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলিত। সেকালে তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি সখের নাট্যশালায় ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ের বিবরণ আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' পাওয়া যাইবে।

১৮৫৪ সনে প্রকাশিত রামনারায়ণের প্রথম নাটক 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'কে অনেকে বাংলার আদি নাটক বলিয়াছেন। কিন্তু 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র পূর্ব্বেও আরও কয়েকখানি বাংলা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১২৫৮ সালে (১৮৫২ সনে?) প্রকাশিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' ও ১৮৫২ সনে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন,' এবং ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটকে'র নাম করা যাইতে পারে। তবে সামাজিক নাটকের মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সর্ব্বপ্রথম বলিয়া মনে হয়।

নাটক-রচনায় নৈপুণ্যের জন্য এবং বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম বিধিবদ্ধ ভাবে ("systematic form"-এ) নাটক রচনার জন্য দি বেঙ্গল ফিল্‌হার্মোনিক অ্যাকাডেমি ৯ মার্চ ১৮৮২ তারিখের অধিবেশনে রামনারায়ণকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও তাহার চিহ্নস্বরূপ 'হরকুমার ঠাকুর কনক কেয়ূর' প্রদান করিয়াছিলেন। এই অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ডিরেক্টর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। রামনারায়ণকে প্রদত্ত মানপত্রখানি (ডিপ্লোমা অব অনার) হরিনাভি রামনারায়ণ লাইব্রেরির একটি কক্ষে টাঙানো আছে।†

রামনারায়ণের সংস্কৃত রচনাও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ছিল। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার সংস্কৃত রচনা এতদূর প্রাঞ্জল এবং অলঙ্কারপূর্ণ, যে তাঁহার আর্য্যাশতক এবং দক্ষযজ্ঞ সহসা কবিচূড়ামণি কালিদাসের রচিত বলিয়া ভ্রম হয়।" 'দক্ষযজ্ঞ' পাঠ করিয়া সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল বিলাত হইতে তাঁহাকে 'কবিকেশরী' উপাধি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

---

* শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী আমার জন্য 'সোমপ্রকাশ' হইতে এই অংশ নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

† শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই মানপত্রের প্রতিলিপি ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' (পৃ. ৭১১-১২) প্রকাশ করিয়াছেন.

রামনারায়ণের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) পতিব্রতোপাখ্যান।...কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে শিক্ষিত সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য রচিত।...১২৫৯ শাল ১১ মাঘ। পৃ. ৭৪।

এই পুস্তক রচনার একটি ইতিহাস আছে। রংপুর কুণ্ডী পরগণার জমীদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞপ্তি পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি 'পতিব্রতোপাখ্যান' ইত্যভিধেয় এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাবলম্বিনী হইয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহকরণে, দম্পতী প্রীতিবর্দ্ধন হওতঃ সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা ছেদনপূর্ব্বক কি নিগূঢ় ইষ্টফলোৎপত্তি হইতে পারে? তদনাথাতেই বা কি অনিষ্টতা অথবা শান্তির ব্যাঘাত জন্মে? বিবিধ প্রমাণ ও বিবিধ সদ্‌যুক্তির দ্বারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন করা প্রশ্নকর্ত্তার মূলাভিপ্রেত। রচক মহাশয়েরা আগত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে না হইতে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ রীতিমত প্রেরণ করিবেন।

রঙ্গপুর

বঙ্গাব্দা ১২৫৮ সাল তারিখ ৬ কার্ত্তিক। কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কুণ্ডী পং জমীদার।

'পতিব্রতোপাখ্যান' পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ :—

অনেকে পতিব্রতোপাখ্যান লিখিয়া বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাঁহার সভা পণ্ডিত মহাশয়েরা সমস্ত পরীক্ষা করিয়া সংস্কৃত কালেজীয় সুপরীক্ষিত সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের লিখিত এই গ্রন্থ মনোনীত করেন। পরে বাবুর অনুজ্ঞায় আদর্শ পুস্তক ভাস্কর যন্ত্রাগারে আসিয়াছিল, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরি মহাশয় ন্যূনাধিক ১৫০ দেড় শত টাকা ব্যয়ে ইহা মুদ্রাঙ্কিত করাইলেন।

(২) প্রকাশ্য বক্তৃতা অর্থাৎ কলিকাতাস্থ হিন্দু মেট্রোপোলিটন নামক বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের উপদেশার্থে তত্রস্থ প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত দ্বারা বিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতা। ৭ কার্ত্তিক, সন ১২৬০ সাল। পৃ ২০।

পুস্তিকাখানি দুষ্প্রাপ্য। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহার এক খণ্ড আছে। আমি তাহার ফোটো প্রতিলিপি আনাইয়াছি। এই পুস্তিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

তোমরা যেমন মনোযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে বাঙ্গলাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গলার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গলা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং মাতৃবৎ এই মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। দেখ বর্ত্তমান কালে যে সকল প্রদেশ দৃষ্টি ও শ্রুতি গোচর হইতেছে

সে সমস্ত দেশীয় লোকেরা সকলি স্ব স্ব দেশীয় ভাষাকে উত্তম ভাষা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকেন এবং সাধারণের এই এক প্রসিদ্ধ প্রথা আছে যে আপন২ দেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা না হইলে কেহই অন্য ভাষা প্রতি ধাবমান হয়েন না অতএব তোমাদিগের দেশভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া কদাচ উচিত নহে।··· ··· ···

এক্ষণে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ প্রকার পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দণ্ডনীতি, ও চিকিৎসা বিষয়ক উত্তমোত্তম প্রবন্ধ সকল দৃষ্ট হইতেছে যদি তোমরা স্বদেশীয় ভাষায় স্বরূপ যোগ্য হও তাহা হইলে ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট২ গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিতে পারিবে তাহাতে দেশীয় ব্যক্তি দিগের যে কত উপকার হইবে তাহা কথনাতীত। দেশীয় লোকেরাও তাদৃশ অসামান্য উপকারে উপকৃত হইয়া ঐ অনুবাদকর্ত্তাকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া চিরকাল স্ব স্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় রাখিবেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন সার্থক হইবে।

বর্ত্তমান কালে এই বিষয়ের দৃষ্টান্তপথে পতাকা স্বরূপ কতিপয় সুবিজ্ঞ মহোদয়েরা সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক নানা সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছেন, এক্ষণেও করিতেছেন, তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশীয়দিগের কত অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা একবার বিবেচনা করিলেই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়: ফলতঃ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করা আবশ্যক বোধ করিয়াও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি অনুরাগ রাখা নিতান্ত উচিত।

এই সুকুমার দেশীয় ভাষা ইহা শিক্ষা করিতে তোমাদিগকে নিতান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, যেহেতু ইহা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা। মাতৃ জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেই ঐ ভাষা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে, এবং স্তন্যপান সমকালেও অনেক কণ্ঠস্থ হয়, পরে মাতা পিতা প্রভৃতি স্বপর সাধারণ সকলেরি নিকট সর্ব্বদা তাহা শ্রবণ করাতে বাল্যাবস্থাতেই প্রায় অর্দ্ধেক অভ্যস্ত হইয়া থাকে, অনন্তর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যথা নিয়মে শিক্ষা করিলেই সম্পূর্ণরূপে তাহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মে, ফলতঃ অনায়াসলভ্য এতাদৃশ উত্তম বস্তুতে কাহার্ না অভিলাষ হয়? যদি পথিমধ্যে এক অমূল্য বস্তু পতিত হইয়া থাকে এবং তাহা গ্রহণ করিতে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইতে চক্ষুষ্মান্ পথিক কি তাহা পরিহার করে? কদাচ করে না; কিন্তু যদি পথিক নয়ন বিহীন হয় তবেই সেই বস্তু সুতরাং পরিহৃত হয় তাহার ন্যায় যদি তোমাদিগের বিবেক নয়ন থাকে তবে কদাচ এই অযত্নলভ্য স্বদেশীয় বিদ্যারত্নকে অশ্রদ্ধা করো না।

বর্ত্তমানাবস্থায় যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে যদি ঐ সকল গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হয় তাহা হইলে এতদ্দেশের কত মঙ্গলোন্নতি হইবে তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি, অতএব যাহারা দেশানুরাগি তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি বিষয়ে একান্ত সচেষ্ট থাকেন। ইতিপোর্ব্বীয় যবন জাতীয় রাজারা আপনাদিগের ভাষার প্রতি নিতান্ত দৃঢ়ভক্তি রাখিয়াছিলেন ইহাদিগের মধ্যে কাহার২ নিজ ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে তাঁহারা তদ্ভাষার সম্যক্ প্রচার করিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভাষার সমূলোৎপাটনেও চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা যত দূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অনুরাগ রাখিয়া ইহার দৃষ্টান্ত পথে দণ্ডায়মান আছেন, কিন্তু এতদ্দেশের দৌর্ভাগ্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় অনেকেই দেশীয় ভাষার প্রতি দ্বেষ করেন, বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা বিদ্যা শিক্ষা ছাত্র দিগের অভিলাষানুসারেই চলিয়া থাকে, অর্থাৎ যে দিবস ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অবসর সময় থাকে ও আলস্য দোষ উপস্থিত না হয় সেই দিনই একবার দেশীয় ভাষার পুস্তক অনায়া

বুদ্ধিতে গৃহীত হয়, নতুবা হয় না, ইহাতে যে কেবল ঐ সকল ছাত্র গণেরই দোষ এমত নহে, তাহাদিগের মাতা পিতাও তদ্বিষয়ে দোষাক্রান্ত হইতেছেন, যেহেতু ইহারা স্ব স্ব সন্তান দিগের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষা হইতেছে কি না ইহা একবারও দেখেন না, বালকেরা ইংরাজী পাঠাভ্যাস করিলেই প্রশংসা করেন, এবং যদি ঐ বালক ইংরাজী কোন পুস্তক ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে দশ বা দ্বাদশ মুদ্রা প্রার্থনা করে তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহা দেন কিন্তু বাঙ্গলা পুস্তক ক্রয় করিতে অর্দ্ধমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেও কহেন অর্থের বড় অনটন, কিছুদিন যাউক এক্ষণ হইবে না, ইত্যাদি বিবিধ বাগাড়ম্বর করিয়া বালক দিগকে দেশ ভাষা শিখিতে অনুৎসাহ দেন, এই সমস্ত ব্যবহার কি দেশ ভাষা নির্ম্মূল করার কারণ নহে ? হায় কি আশ্চর্য্য দেশ ভাষার প্রতি ইহাদিগের এত অরুচি কেন ? কেহবা আপনি দেশানুরাগী ইহা জানাইবার নিমিত্ত মুখে মাত্র কহিয়া থাকেন যে 'আমাদিগের দেশ ভাষার উন্নতি করা নিতান্ত আবশ্যক' কিন্তু তাহা ইহাদিগের হৃদয়ঙ্গম নহে ; যদি এমত অভিলষিত হইত তাহা হইলে কি তাঁহারা দেশীয় সভায় বিদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, কি দেশীয় ভাষায় আলাপ করিতে হইলে ইংরাজী ভাষা মিশ্রিত করিতেন ? কখনই করিতেন না।

বঙ্গ ভাষার আলাপ মধ্যে ইংরাজী দুই এক শব্দ প্রয়োগ করা আর বাঙ্গালি পরিচ্ছদ অর্থাৎ ধুতি চাদর পরিধান করিয়া একটি উত্তম ইংরাজী টুপি ধারণ করা তুল্য হাস্যাস্পদ, সত্য মিথ্যা তোমরা বিবেচনা কর। যাহা হউক দেশীয় ভাষার আলাপ মধ্যে অন্য ভাষা সংশ্লিষ্ট করার কারণ দেশ ভাষার অনভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কি বোধ হয় ? বর্ত্তমান কালে ইংরাজ রাজপুরুষ গণের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষা বিলক্ষণ জানেন্ কিন্তু ইহারা কি ইংরাজী কহিতে২ দুই এক বাঙ্গলা ভাষা কহিয়া থাকেন ? যদি বল এতদ্দেশীয়েরা যে বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরাজীর দুই এক শব্দ কহেন তাহাতে ইহাদিগের ইংরাজী ভাষার অনুরাগই প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহা আমাদিগের কদাচ অনুভবে আইসে না। ইংরাজ মহোদয় দিগের কি বাঙ্গলা ভাষায় অনুরাগ নাই, এমত নহে, অনেকানেক ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতেরা এতদ্দেশীয় ভাষার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে এই বরং কহা যায় যে এতদ্দেশীয়দিগের দেশ ভাষায় অনুরাগ নাই, ইহারা দেশভাষা ক্রমশঃ নির্ম্মূলিত করিবার মানসেই তাদৃশ ব্যবহার করেন কিন্তু ইহা নিতান্ত অনুচিত কর্ম্ম।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন২ ব্যক্তি কহেন যদি কোন লোক জ্ঞানোপার্জ্জনে অভিলাষী হয়, তবে কেবল ইংরাজী শিক্ষা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধ করিতে পারিবে, স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অপেক্ষা কি, এতৎপ্রদেশীয় সকল লোকের যদি জ্ঞানোপার্জ্জন কর্ত্তব্য হয় সকলেই ইংরাজী শিক্ষা করুন, কিন্তু আমি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আত্মভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ও পরভাষায় বিদ্যা শিক্ষা ইহার মধ্যে সুলভ কি, বোধ হয় ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহারা আর এমত কথা কহিবেন না। অতএব ইহারা স্বদেশের প্রতি প্রীতি রাখিয়া যাহাতে আত্মভাষার উচ্ছেদ না হয় এমত চেষ্টা করুন।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা জন্মভূমিকে জননীর তুল্য বলিয়াছেন, সুতরাং সেই জন্মভূমিকে দুরবস্থা হইলে মোচন না করা আর ব্যাধি পীড়িতা জননীকে ঔষধ প্রদান ও শুশ্রূষা বিধানাদি দ্বারা সুস্থা না করা তুল্য কথা।

যে স্থানে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া শৈশবলীলার লালিত হইয়াছি, যে স্থানে যৌবন যাপন কালে ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুনীতি, সচ্চরিত্রতা, যশঃ, সম্পত্তি প্রভৃতি সকল উপার্জ্জন করিয়া সুখী

হইতেছি এবং যে স্থানের স্মরণে মাতা, পিতা, দয়িতা, পরিণেতা, পুত্র, মিত্রাদির নির্ম্মল বদন কমল সহসাই স্মৃতি পথে পতিত হয় এতাদৃশ অস্মাদৃশ প্রেমাস্পদ জন্মভূমির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কি আমাদিগের উচিত কর্ম্ম? যে ব্যক্তি দেশান্তরে অবস্থান করে সেই ব্যক্তিই জন্মভূমির মর্ম্মস্নেহ অবগত থাকে, জন্মভূমি তাহারি আনন্দভূমি বোধ হয়, অতএব এই আনন্দভূমির প্রতি যাহার স্নেহ নাই সে কি মনুষ্য?

দেশীয় ভাষায় যাঁহাদিগের নিতান্ত দ্বেষ তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় আপনাদিগের গাঢতর ব্যুৎপত্তি জ্ঞাপন করাইবার নিমিত্ত স্বদেশীয় স্বজনগণের সহিতও ইংরাজী ভাষায় আলাপ করেন; কিন্তু নিজ২ বাটীর পরিজনের সহিত আলাপ করিতে হইলে অবশ্যই ইঁহাদিগের দেশীয় ভাষা অবলম্বতা হয় তাহার সন্দেহ নাই; সুতরাং যে ভাষা ব্যতীত সাংসারিক ব্যাপার সমাধা হয় না, তৎপ্রতি অনাস্থা বোধ বৈধ নহে, স্বদেশীয় ভাষা ব্যতীত মনোগত অভিপ্রায় প্রায় প্রকাশ পায় না। প্রসূতির স্তনক্ষীর যে প্রকার শরীরের পুষ্টি ও বলিষ্ঠতা সম্পাদক, স্বদেশীয় ভাষাও তদ্রূপ মানসিক শক্তিদায়ক সন্দেহ কি? ভাল স্বদেশীয় ভাষা প্রতি অশ্রদ্ধাকারীকে আরো জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সেক্সপীয়্যার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন পাঠ করেন তখন কি স্বদেশীয় ভাষায় ভাব উদয় করেন না? অগ্রে দেশ ভাষায় ভাব গ্রহণ না করিলে কখনই ভিন্নভাষায় ভাবোদয় হয় না।

অতএব হে ছাত্রগণ তোমরা বাঙ্গলা সাধুভাষা প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ কর, ঐ ভাষা এতদ্দেশের দেশীয় ভাষা, যত দিন পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশে উহার শ্রীবৃদ্ধি না হইবে, তত দিন নানা ইংরাজী গ্রন্থ প্রচার হউক, উত্তমোত্তম শিক্ষক থাকুন, কিছুতেই এতদ্দেশীয় সাধারণের জ্ঞানরসাস্বাদন হইবে না।

(৩) কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক। শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্ম প্রণীত। সম্বৎ ১৯১১। পৃ ১২৭।

১৮৫৪ সনের শেষভাগে এই নাটক প্রকাশিত হয়। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' (৩য় খণ্ড) ইহার সমালোচনা কালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

··এইক্ষণে·· সহৃদয় ব্যক্তিগণ রঙ্গভূমিতে কবিতাসুধাকরের উদয় করণার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসঙ্গে এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা এই নির্ম্মল চন্দ্রোদয়ের আদিকিরণ বলিলে বলা যায়।

পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েক খানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণন করেন, তাহার অত্যল্পমাত্র তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।

প্রস্তাবিত নাটক খানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্যরচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন-যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। (পৃ. ২৫৫-৫৬)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' সম্বন্ধে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ ৯৫)

'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'-রচনার ইতিহাস এইরূপ। রংপুর কুণ্ডী-পরগণার বিদ্যোৎসাহী জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সম্বাদ ভাস্কর'-আদি পত্রে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। ৮ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখের 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' পত্রেও বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল; বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।

৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত করা যাইতেছে, যিনি সুললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নামক একখানি মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে সঙ্কল্পিত ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক।

রঙ্গপুর পং কুণ্ডী শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী
কুণ্ডী পং জমীদার।

এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া রামনারায়ণ 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' রচনা করেন এবং ১০ মার্চ ১৮৫৪ তারিখে নিম্নোদ্ধৃত পত্রের সহিত রচনার পাণ্ডুলিপি রংপুরে পাঠাইয়া দেন :—

বিবিধ বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী মান্যবর
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র চতুর্দ্ধুরীণ
মহাশয় সর্ব্বোপকারকেষু—

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আমি ভাস্কর পত্রস্থ মহাশয়ের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ আপনি অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী ও আপনার প্রস্তাবিত বিষয় অতি উপাদেয়। কিন্তু রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই সাতিশয় শিরোবেদনা প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুদিন ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল তাহাতে পুস্তক প্রস্তুতপূর্ব্বক প্রেরণ করিতে শীঘ্র পারি নাই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এক্ষণে দৈবানুগ্রহে শারীরিক সুস্থ হওয়ায় অত্যন্ত যত্ন ও অজস্র পরিশ্রম সহকারে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনকার নিকটে পাঠাইলাম পুরস্কার প্রদানে পরিশ্রম সার্থক করিবেন।·· ২৮ ফাল্গুনস্য।

শ্রীরামনারায়ণ শর্ম্মণঃ।
কলিকাতা হিন্দু মিট্রোপলিটান বিদ্যালয়স্থ
প্রধানাধ্যাপকস্য।

বলা বাহুল্য, রামনারায়ণ বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ৫০৲ টাকা যথাসময়ে পাইয়াছিলেন।

(৪) বেণীসংহার নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক গৌড়ীয় চলিত ভাষায় অনুবাদিত। সংবৎ ১৯১৩। পৃ. ৯৬।

'বেণীসংহার নাটক' ১৮৫৬ সনের মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের "বিজ্ঞাপন"-এর তারিখ "২৮ জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৩"। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪১ খণ্ড, পৃ. ১০৭) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> কবি না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটককারের সে গুণের অভাব নাই; তিনি সর্ব্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটী-রূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন।...

(৫) **রত্নাবলী নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক চলিত ভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা সম্বৎ ১৯১৪। পৃ. ৯২।

'রত্নাবলী' ১৮৫৮ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার "ভূমিকা"র তারিখ "২৮ ফাল্গুন, সম্বৎ ১৯১৪"।

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (৪৯ খণ্ড, পৃ. ১৮) সমালোচনাকালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন :—

> ·· অবিশ্রান্ত পীযূষপানের ন্যায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।· তাঁহাকর্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য্য যাদৃশ পরিপাটীরূপে বঙ্গভাষায় প্রকটিত হইয়াছে; বোধ হয় অতি অল্প লোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙ্গালীতে রক্ষা করিতে পারিতেন।

(৬) **অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন কর্ত্তৃক চলিত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত। সম্বৎ ১৯১৭।

ইহা কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের অনুবাদ, "অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্ত্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত"। পুস্তকের "মঙ্গলাচরণ"-এর তারিখ "১০ আশ্বিন ১২৬৭"।

(৭) **যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।** প্রহসন। [১৮৬৫?]

(৮) **বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক।** শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। শকাব্দাঃ ১৭৮৮। পৃ. ১৫৮।

'নব-নাটক' ১৮৬৬ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনার একটি ইতিহাস আছে।

প্রধানতঃ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে একটি নাট্যশালা গঠিত হয়। ইহার নাম জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব অনুভব করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৬৫ সনের ২২ জুন তারিখে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' পত্রে প্রথমে বহুবিবাহ-বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই সংবাদপত্র হইতে বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই নাটক-রচনার ভার অর্পিত হয়। ইহার অল্প দিন পরেই রামনারায়ণ 'নব-নাটক' রচনা করিয়া, জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষের

নিকট হইতে দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে ইহাই 'নব-নাটক'-রচনার ইতিহাস।*

(৯) **মালতীমাধব নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। বাং ১২৭৪। ইং ১৮৬৭। পৃ. ১৭৯।

পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, "নাটকের সঙ্গীত কয়েকটী শ্রীযুত বাবু বনয়ারীলাল রায় মহাশয় রচনা করিয়া দিয়াছেন"।

(১০) **উভয় সঙ্কট**। প্রহসন। বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। ১২৭৬ সাল। পৃ. ২৭

(১১) **চক্ষুদান**। প্রহসন। বন্ধুদিগের বিতরণার্থে। সন ১২৭৬ সাল। পৃ ২৬।

(১২) **মহাবিদ্যারাধন**।

ইহা দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং ১২৭৮ সালে রচিত বলিয়া রামনারায়ণের আত্মকথায় প্রকাশ, কিন্তু তারিখটি ঠিকমত মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ১২৭৮ সালের পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ ১৮৭০ সনে ইহা রচিত। এই পুস্তিকাখানি আমি এখনও কোথাও দেখি নাই।

(১৩) **রুক্মিণীহরণ নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন। সন ১২৭৮ সাল। পৃ. ১৯।

ইহার "উপহার"-পৃষ্ঠার তারিখ—"কলিকাতা। সংস্কৃত কালেজ, ১২৭৮। ভাদ্র"।

(১৪) **আর্য্যাশতকম্**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি। পৃ. ১০।

পুস্তকখানি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। রচনার নিদর্শনস্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

এষা মুধৈব বার্ত্তা ন সুধা বসুধাতলে সমুদ্ভোতি।
নবরসরসিকজনাস্যোদ্ভূতভারতী যদত্রাস্তে ॥৭
লেখনি খনিরসি লোকে কবিকরকলিতা সুবর্ণরত্নানাম্।
সা ত্বং পরার্থসিদ্ধেঃ কর্ত্রী চাধোমুখীভূয় ॥৮
কোমলমিহ নবনীতং সমধিককোমলতরং সতাং চেতঃ।
আদ্যং স্বস্মিংস্তাপাদ্ দ্রবতি তু পরতাপতোঽপ্যন্যম্ ॥৯
ধরণী ধরতি সমস্তং ধরণিমনন্তঃ শিরোভিরপি ধত্তে।
যো হি বহতি পরভারং তস্য তু পতনং ন সম্ভাব্যম্ ॥১০
কস্যাং শিরসি নিদধ্যাং কো বা নিত্যং তবাদরং ধত্তে।
ছত্র স্বয়মপি তপ্তং পরতাপং চেন্ন বারয়সি ॥১১

(১৫) **স্বপ্নধন নাটক**। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। সম্বৎ ১৯৩০। পৃ. ৮৩

নাটকখানি সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি (বেঙ্গল থিয়েটার) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রামনারায়ণ

* যাঁহারা জোড়াসাঁকো নাট্যশালা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমার 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।



কবি ভারতচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত আবেদন পত্র, তদুপরি
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত আদেশ

ইহার স্বত্বাধিকার বঙ্গ রঙ্গভূমির কর্তৃপক্ষকে বিক্রয় করেন। 'স্বপ্নধন নাটক' বঙ্গ রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয়। পুস্তকের বিজ্ঞাপনের তারিখ "সিমুলিয়া কার্ত্তিক,—১২৮০"।

(১৬) ধর্ম্ম-বিজয় নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। ১২৮২ সাল।

'ধর্ম্ম-বিজয় নাটক' হরিশ্চন্দ্রের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। ১০ই ভাদ্র ১২৮২ তারিখে রামনারায়ণ এই নাটকখানি "সভ্যগণের আকিঞ্চনে" হরিনাভি বঙ্গ নাট্যসমাজের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে বিক্রয় করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই নাটকখানি প্রকাশ করেন; তাঁহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "শেষ ভাগে যে সকল সংগীত সন্নিবেশিত হইল, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ সান্যাল মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।...হরিনাভি ২০এ ভাদ্র ১২৮২।"

(১৭) কংসবধ নাটক। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত ও প্রকাশিত। সন ১২৮২ সাল [=ইং ১৮৭৫ ?]। পৃ. ৭২।

(১৮) দক্ষযজ্ঞম্ (পূর্ব্বার্দ্ধম্), সর্গ ১-৫। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্। ১৮৮১। পৃ ৪৩।

(১৯) দক্ষযজ্ঞম্ (উত্তরার্দ্ধম্), সর্গ ৬-১০। শ্রীরামনারায়ণ তর্করত্নেন বিরচিতম্। শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নেন সংশোধিতম্। ১৮৮২। পৃ ৪১।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত এই সংস্কৃত খণ্ডকাব্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

হরো ব্রহ্মচারী কলঙ্কাপহারী
শশাঙ্কার্দ্ধধারী শ্মশানপ্রচারী।
বিপৎপাতবারী সদন্তর্ব্বিহারী
ভবত্রাণকারী স্মৃতো মেঽস্তু নিত্যম্ ॥৩৩
ভবানীশমীশং সুরেশং গিরীশং
জনেশং মহেশং শিবং ব্যোমকেশং।
মহাভীমবেশং স্ববেশৈকবাসং
সতাং সুপ্রকাশং স্মরামি স্মরামি ॥৩৪
ত্বয়া যদ্বিধেয়ং তথা তদ্বিধেয়ং
বিধের্নাস্তি শক্তিস্তদন্যদ্বিধাতুম্।

অতঃ প্রার্থয়েঽহং ভবাম্ভোধিমগ্নঃ
ত্বয়া রক্ষণীয়ঃ শরণ্যাগ্রগণ্যঃ ॥৩৫
নমো বিশ্বকর্ত্রে নমো বিশ্বধর্ত্রে
নমো বিশ্বভর্ত্রে নমো বিশ্বহর্ত্রে।
নমো বিশ্ববীজস্বরূপায় নিত্যং
ত্রিনেত্রায় তুভ্যং নমঃ শঙ্করায় ॥৩৬
ত্বদন্যন্ন চাস্তে ভবে বস্তু কিঞ্চিৎ
ত্বমেবাদিমশ্চান্তিমো মধ্যমশ্চ।
বিধাতুঃ স্তবং তে বিধাতুর্ন শক্তিঃ
কথং বক্তুমীশো ভবেয়ং ভবেশ ॥৩৭

—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৪র্থ সর্গ, পৃ. ২৮-২৯

ইহা ছাড়া রামনারায়ণ আরও দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক কোন কোন ব্যক্তি উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তক দুইখানি অন্যের নামে প্রচারিত, কিন্তু এগুলির রচনায় যে তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(ক) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালিদাস-প্রণীত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের মর্ম্মানুবাদ করেন। নাটকখানি পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর

আদি বাড়ীতে একাধিক বার অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে···বলিলেন—'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন··· । ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৫৫)

মহেন্দ্রনাথের উক্তি একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রথম সংস্করণে (১২৬৬ সাল) অনুবাদকের নাম ছিল না; দ্বিতীয় সংস্করণে (১২৮৪ সাল) শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম থাকিলেও, এই নাটক-রচনায় রামনারায়ণের যথেষ্ট হাত ছিল। ৭ জুলাই ১৮৬০ তারিখে এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয় হয়।* এই অভিনয়-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১৬ জুলাই ১৮৬০) লিখিয়াছিলেন :—

আমরা পূর্ব্বে [২ জুলাই ১৮৬০] মহাকবি কালিদাস প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের বাঙ্গলানুবাদ সমাচার পাঠকগণের গোচর করিয়াছি। গ্রন্থ মধ্যে অনুবাদকের নাম ছিল না, সুতরাং তাহা পাঠকগণকে জানাইতে পারি নাই। এক্ষণে জানিতে পারিলাম, পাথুরিয়া ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের যত্নে অনুবাদ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত বেশ ভূষা পরাইয়া দেন। সম্প্রতি উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। †

(খ) পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, 'পৌরাণিক ইতিবৃত্ত' (১২৭৭ সাল) পুস্তকখানি রামনারায়ণের রচনা। দত্ত-মহাশয় রামনারায়ণের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার কথাও অমূলক না হইতে পারে; কারণ, পুস্তকে গ্রন্থকার-হিসাবে "ডব্লু অব্রাএন স্মিথ" নাম থাকিলেও ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ :—

ইহাও বক্তব্য, পুস্তক প্রণয়নে শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্করত্নেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

* "বিগত ২৫এ আষাঢ় [৭ জুলাই] শনিবার রজনীযোগে এই নাটকের দ্বিতীয় বার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের বিশেষ প্রযত্নে অভিনয় ক্রিয়া সুসম্পাদিত হইয়াছে।" ('সোমপ্রকাশ,' ২৩ জুলাই ১৮৬০)

† 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক ১৮৬০ সনের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ তারিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার শেষ দুই অঙ্কের পাণ্ডুলিপি মাইকেলকে পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ('মধুস্মৃতি,' পৃ ১২৩); সুতরাং ইহার পরে যে নাটকখানি প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, ১৮৫৯ সনে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। আমার মনে হয়, ১৮৬০ সনের প্রথম ভাগে ইহা প্রথম অভিনীত হয়। কিশোরীচাঁদ ঘটনার বহু পরে—১৮৭৩ সনে এই অভিনয়ের কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ক্ষেত্রে সন-তারিখের এক-আধটু গোল হওয়া বিচিত্র নয়।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, রামনারায়ণ 'ধনুর্ব্বেদ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মুদ্রিত হয় নাই।*

রামনারায়ণের আত্মকথা

১৮৭২ সনে রামনারায়ণ সংক্ষেপে আত্মকথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই আত্মকথা শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩২৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তারিখগুলি সর্ব্বত্র নির্ভুলভাবে মুদ্রিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। রামনারায়ণের আত্মকথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

সন ১২২৯ সালে আমার জন্ম। আমার পিতৃঠাকুরের নাম ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়। ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিনাভি নামক গ্রামে আমার বাস। আমি বাল্যাবস্থাতে দেশে ও বিদেশে চৌবাড়িতে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির কিয়দংশ এবং ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানখণ্ড প্রায় অধ্যয়ন করি। পরিশেষে ইং ১৮৪৩ অর্থাৎ ১২৫০ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থে প্রবিষ্ট হই। ইং ১৮৫৩ বাঙ্গলা ১২৬০ সালে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ হিন্দু মিট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পাণ্ডিত্যপদে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর তথায় কর্ম্ম করিয়া ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুন† তারিখে (বাঙ্গলা ১২৬২ সালে) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মই করিতেছি।

১২৫৯ সালে পতিব্রতোপাখ্যান প্রস্তুত করি। রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় উক্ত পুস্তকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন।

কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ১২৬১ সালে রচিত হয়, উহাতেও রঙ্গপুরের উক্ত ভূম্যধিকারী বাবু কালীচন্দ্র রায় ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেন; এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সাহায্যে আরো ৫০৲ টাকা দান করেন। এই নাটক কলিকাতা নূতনবাজারে বাঁশতলার গলিতে ও চুচুড়াতে অভিনীত হয়।

বেণী-সংহার নাটক। ১২৬৩ সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা জোড়াশাঁকোয় বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে ও নূতনবাজারে বাবু জয়রাম বশাকের বাটীতে অভিনীত হয়।

রত্নাবলী। ১২৬৪ সালে প্রস্তুত হয়। ইহাতে কান্দিনিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। উক্ত রাজার কলিকাতার সন্নিকট বেলগেছিয়ার বাটীতে ৬।৭ বার ঐ নাটক অভিনীত হয়। তদ্ভিন্ন গীতাভিনয় প্রস্তুত হইয়া এক্ষণেও নানাস্থানে অভিনীত হইতেছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ১২৬৬ [১২৬৭ ?] সালে প্রস্তুত হয়। এই নাটক কলিকাতা শাঁকারিটোলার বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের বাটীতে ৫ বার অভিনীত হয়।

* "কবিকেশরী রামনারায়ণ তর্করত্ন"—'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি,' ১২৯২ সাল, পৃ.১৫১।

† তারিখটি "১৫ই জুন" হইবে। সংস্কৃত কলেজে রক্ষিত অধ্যাপকদের মাহিনার রসিদ-বুইয়ে প্রকাশ, রামনারায়ণ ১৮৫৫ সনের জুন মাসের বেতন বাবদ ২১।/৪ পাইয়াছিলেন।

নবনাটক ১২৭৩ সালে রচিত হয়। ইহাতে কলিকাতা জোড়াসাঁকোবাসি বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। এই নাটক তাঁহার বাটীতে ৯ বার অভিনয় হয়।

মালতীমাধব নাটক ১২৭৪ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরকে প্রদান করি। তিনি উহাতে ১০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। তাঁহার বাটীতে ঐ নাটক ১০।১১ বার অভিনীত হয়।

সুনীতিসন্তাপ নাটক ১২৭৫ সালে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা বাঁশতলা গলিনিবাসি বাবু কালীকৃষ্ণ প্রামাণিককে প্রদান করি। তিনি আমাকে ২০০৲ টাকা পারিতোষিক দেন। ঐ নাটক কোন কারণে মুদ্রিত হয় নাই।

১২৭৮ সালে রুক্মিণীহরণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকটে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাই। ঐ নাটক তাঁহার বাটীতে ১০।১১ বার অভিনীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যেমন কর্ম্ম তেমন ফল উভয় সঙ্কট এবং চক্ষুর্দ্দান নামে আরো ৩ খানি প্রহসন* অর্থাৎ হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র নাটক প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুরের নিকট যথ যোগ্য পুরস্কৃত হইয়াছি সে সকল নাটকও প্রত্যেকে ৭।৮ বার করিয়া তাঁহারই বাটীতে অভিনীত হইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে কল্কিপুরাণ, সমুদয় উত্তররামচরিত নাটক ও যোগবাশিষ্ঠের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সর্ব্বার্থপূর্ণ দয় সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র | নামক পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

কেরলীকুসুম। নামে একখানি নাটক প্রস্তুত করা গিয়াছে; অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সংস্কৃত গ্রন্থ

১২৭৮ সালে মহাবিদ্যারাধন নামে দশমহাবিদ্যার স্তোত্র ও গীতিকা এবং বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যাশতক প্রস্তুত করিয়াছি।"

"বর্ত্তমান বর্ষে আর্য্যশতক প্রস্তুত করিয়াছি"—আত্মকথার এই কথাগুলি হইতে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবে না যে, যে-বৎসর 'আর্য্যাশতক' প্রস্তুত হয়, সেই বৎসরই আত্মকথা লিখিত হইয়াছিল। 'আর্য্যাশতকম্'-এর প্রকাশকাল "ইং ১৮৭২। ফেব্রুয়ারি," সুতরাং রামনারায়ণের আত্মকথা যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বা ১২৭৮ সালে রচিত, তাহা নিঃসন্দেহ।

এই আত্মকথা রচনার পরও রামনারায়ণ আরও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার সম্পূর্ণ তালিকা অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে।

---

* এই প্রহসন তিনখানি অনেকে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

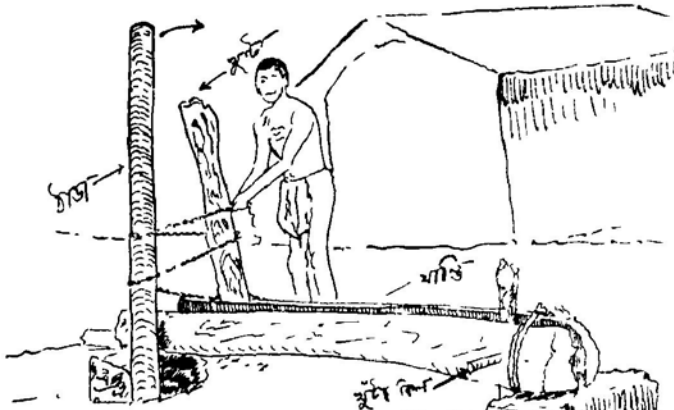
† ইহাই 'স্বপ্নধন' নামে পর বৎসর ১২৮০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সড়ইকলা-রাজ্যে তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ভূমিকা

উড়িষ্যায় যে-সকল ছোট ছোট সামন্ত-রাজ্য আছে তাহার মধ্যে সড়ইকলা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণা, সেখানকার অধিবাসিগণ বাংলাভাষী। পশ্চিমে সিংহভূমের সদর মহকুমা, সেখানে হিন্দী, উড়িয়া এবং কোল ভাষা প্রচলিত। দক্ষিণে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ-রাজ্য। সড়ইকলার চলিত ভাষা উড়িয়াপ্রধান, কিন্তু শব্দ এবং বাক্যরীতিতে হিন্দী ও বাংলা উভয় ভাষারই প্রভাব লক্ষিত হয়। রাজদরবারে উড়িয়া ভাষা লিখিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে আমরা ভাষার দিক্ দিয়া সড়ইকলা-রাজ্যকে উড়িয়া, বাংলা এবং হিন্দীর মিলনভূমি বলিয়া ধরিতে পারি, তাহার মধ্যে উড়িয়াই প্রধান।



খাড়া ভাবে অবস্থিত দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র

শুধু ভাষার দিক্ দিয়া নহে, শিল্পকলা, দেশাচার এবং লোকাচার পর্য্যবেক্ষণ করিলেও উপরোক্ত বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সড়ইকলায় প্রচলিত কয়েক প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই বিষয়টি আরও দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব।

পাঁচ প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র

যত দূর দেখিয়াছি সরাইকলা-রাজ্যে সর্ব্বসমেত পাঁচ প্রকার তৈলনিষ্কাশন-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(ক) খাড়াভাবে অবস্থিত দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র,

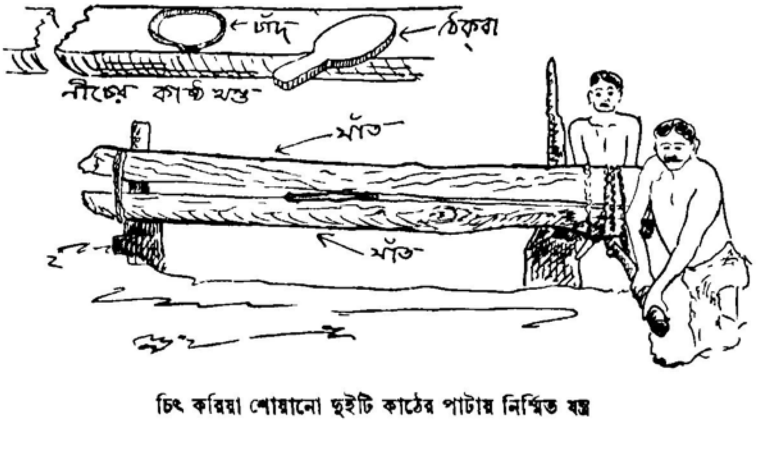
(খ) চিৎ করিয়া শোয়ানো দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র,

(গ) দুইটি বলদে টানা, নালিবিহীন কাঠের ঘানি,

(ঘ) এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, একখণ্ড কাঠে নির্ম্মিত ঘানি,

(ঙ) এক বলদে টানা, নালিযুক্ত, কিন্তু দুই খণ্ড কাঠে নির্ম্মিত 'পিড়ি'-বিশিষ্ট ঘানি।

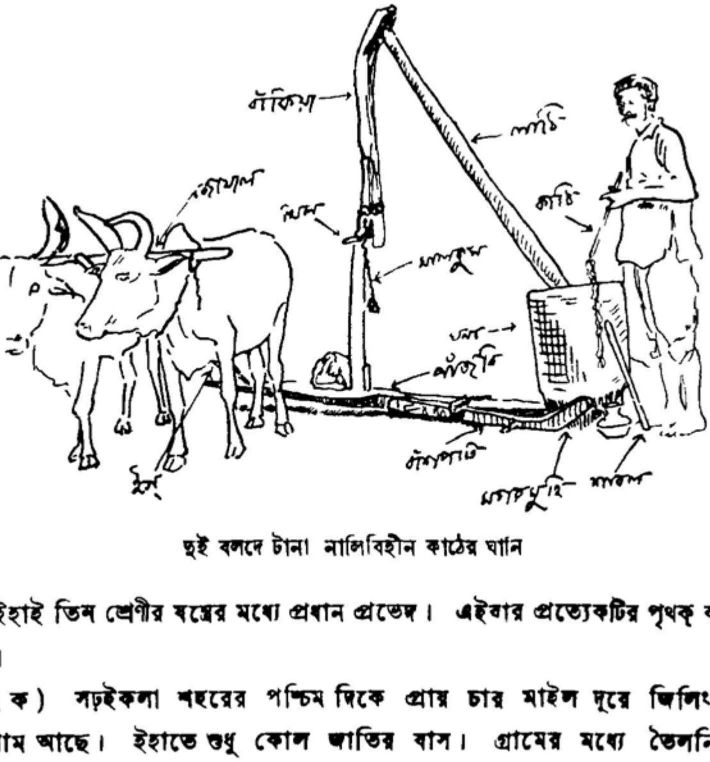
ইহার মধ্যে (ক) ও (খ) এক শ্রেণীর বলিয়া ধরা যাইতে পারে, (গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং (ঘ) ও (ঙ) তৃতীয় শ্রেণীর। এরূপ শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গত কারণ আছে। প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রে সাধারণতঃ রেড়ী, করঞ্জ, মহুয়াফলের বীচি বা কুসুম নিষ্পেষিত হয়। তিল ও সরিষাও পেষা যায়, তবে সচরাচর হয় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে সচরাচর তিল, সুরগুজা ও সরিষা পিষ্ট হয়, কিন্তু অপরগুলিও হইতে পারে।



চিৎ করিয়া শোয়ানো দুইটি কাঠের পাটায় নির্ম্মিত যন্ত্র

প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রে পিষিবার জন্য বীজগুলিকে আগে মিহি করিয়া ঢেঁকিতে কুটিতে হয়। তাহার পর উনানে এক হাঁড়ি জল চাপাইয়া তাহার উপরে আর একটি হাঁড়িতে কোটা বীজগুলি চাপাইতে হয়। দুই হাঁড়ির সঙ্গমস্থল মাটির প্রলেপ দিয়া বুজানো থাকে এবং উপরের হাঁড়ির নীচে কয়েকটি ছিদ্রও থাকে। নীচের পাত্রে জল ফুটিলে উপরের পাত্রে অবস্থিত গুঁড়ার ভিতর দিয়া ভাপ বাহির হইবার চেষ্টা করে। তখন গুঁড়াগুলিকে বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। গুঁড়া ভাল করিয়া ভাপানো হইলে অল্প অল্প লইয়া চটের টুকরায় মুড়িয়া অথবা বন্য লতায় প্রস্তুত এক প্রকার ছোট্ট চুপড়িতে ভরিয়া কাঠের দুইখানি পাটার মধ্যে রাখিয়া চাপ দিতে হয়। তখন তৈল বাহির হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর যন্ত্রে কিন্তু এই ভাপানোর পর্ব্বটি নাই। বীজকে কাঁচা অবস্থাতেই অল্লাধিক জল মাখাইয়া ঘানিতে দিতে হয়। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্রে পেষাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও জল মিশাইতে হয়, তখন তেল উপরে ভাসিয়া উঠে। তৈলকার একখণ্ড কাঠিতে ন্যাকড়া বাঁধিয়া সেই ন্যাকড়ার সাহায্যে ভাসমান তেল শুষিয়া লয়। তৃতীয় শ্রেণীতে জল অতি সামান্য লাগে, বীজগুলিকে শুধু জলে মাখোমাখো করিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়। তেল পেষা হইলে তাহা নীচের নালিপথে বিন্দু বিন্দু ঝরিয়া পড়ে। বীজের সহিত জল মিশাইলে তাহা ত আর নীচের দিকে নামিবে না।



দুই বলদে টানা নালিবিহীন কাঠের ঘানি

ইহাই তিন শ্রেণীর যন্ত্রের মধ্যে প্রধান প্রভেদ। এইবার প্রত্যেকটির পৃথক্ বর্ণনা করা যাউক।

(ক) সড়াইকলা শহরের পশ্চিম দিকে প্রায় চার মাইল দূরে জিলিংবুরু নামে একটি গ্রাম আছে। ইহাতে শুধু কোল জাতির বাস। গ্রামের মধ্যে তৈলনিষ্কাশনের জন্য একটি যন্ত্র আছে, যাহার যখন দরকার তখন ইহাতে তৈল পিষিয়া লয়। ১৯২৬ সালে এই যন্ত্রটি প্রথম দেখিয়াছিলাম, ১৯৩৮ সালেও দেখিলাম তাহা যথাস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।*

একটি শালের গুঁড়ি মাঝামাঝি চিরিয়া দুই খণ্ড করা হইয়াছে। তাহার এক দিকে একটি খিল দিয়া বাঁধা, অপর দিক উন্মুক্ত। এই মুক্ত প্রান্তের এক পাশে একটি খুঁটি শক্ত করিয়া পোঁতা আছে। অপর পাশে একটি আলগা খুঁটি, ঠেলিলে দুই খণ্ড কাঠ

* এই যন্ত্রের একখানি চিত্র ১৯৩১ সালের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রের ৫৭৪ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

চাপিয়া ধরা যায়। সমস্ত যন্ত্রটি দুই খণ্ড পাথরের উপর বসানো আছে। কাঠের চেরা ও সমান পার্শ্ব দুইটি পরস্পরের প্রতি মুখোমুখি খাড়াভাবে অবস্থিত। তেল পিষিবার সময়ে সেই জন্য তেল সোজা নীচে ঝরিয়া পড়ে। তখন নীচে একখানি থালা পাতিয়া দিলেই যথেষ্ট হয়।

প্রথম চিত্রে এক জন বৃদ্ধ কোল যন্ত্রটির ব্যবহার-কৌশল দেখাইতেছে। ঐ সময়ে অপর দিকের খোলা খুঁটিটি, দুই এক জন বেশ জোরে চাপিয়া ধরে এবং চাপা থাকিতে থাকিতে দড়ি দিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া দেয়। যন্ত্রের মধ্যে বন্য লতায় নির্ম্মিত চুবড়ি ৩।৪।৫টি একত্র দেওয়া হয়।

কোল জাতির মধ্যে প্রধানতঃ খাড়া পাটার ব্যবহার দেখিয়াছি। ইটাকুন্দরের নিকটে নতুনডি বস্তিতেও এক জন কোলের বাড়িতে দুইখানি পাটা দেখিয়াছিলাম, তাহা জিলিংবুরুর মত তৈলনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক ব্যবহারের ফলে দুইটি পাটার মধ্যভাগ তেলে কুচকুচে কাল হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন হাওমোণ্ডা গ্রামে ভূমিজ জাতির মধ্যেও এইরূপ একটি যন্ত্র ২৪।২।১৯২৬ সালে দেখিয়াছিলাম। তবে সেক্ষেত্রে জিলিংবুরুর মত শালের গুঁড়িটি কাটিয়া আগাগোড়া ফাঁক করিয়া দেওয়া হয় নাই, খানিক চিরিয়া বাকী পূর্ব্বাবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই যন্ত্রটির সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, যদিও কোলজাতির মধ্যে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবু যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম কোল ভাষায় নাই। প্রায় সবই সংস্কৃতমূলক শব্দ। হয়ত ইহারা নিজেরা এ যন্ত্র উদ্ভাবন করে নাই। যন্ত্রের নাম যাস্তি বা সুনুম লেস্তেএ যাস্তি (= তেলের জন্য যাস্তি ?)। দুইটিকে এক প্রান্তে যথাস্থানে রাখিবার জন্য খুঁটা কিল। অপর প্রান্তের এক পাশে খুণ্টা, অপর পাশে চলিষ্ণু ঠাডা। মধ্যে যে বন্য লতায় নির্ম্মিত চুপড়ি দেওয়া হয় তাহার নাম কুলি টোপা।

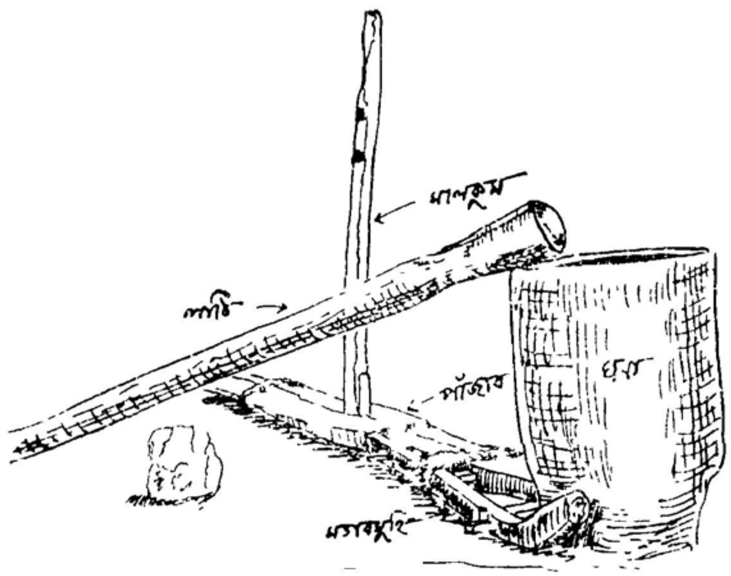
(খ) দ্বিতীয় যন্ত্রটি মূলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যন্ত্রের অনুরূপ। আমি মানিকবাজার গ্রামে ১১।১০।১৯৩৮ তারিখে দুর্য্যোধন মাহাতোর বাড়ীতে ইহা দেখি ও ইহার ছবি লই।

এ ক্ষেত্রে পাটা দুইটি খাড়া ও পাশাপাশি থাকে না, ভূমিজক্ষেত্রে একটি অপরের উপরে শোয়ানো থাকে। নীচের পাটার মধ্যস্থলে একটি বৃত্তাকার নালি থাকে, ইহার ব্যাস আনুমানিক আধ হাত হইবে। নালির একটি মুখ পাশের দিকে কাটা থাকে। তৈলবীজ-নিষ্পেষণের জন্য বৃত্তের মধ্যভাগে বসানো হয়। চাপ দিলে তেল নালিপথে গড়াইয়া পাশের মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কি ভাবে দড়ি বাঁধিয়া দুইখানি লাঠির সাহায্যে দুই দিক্ হইতে চাপ দেওয়া হয় তাহা চিত্রে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই যন্ত্রে সচরাচর দুইটি লতার চুপড়ি অথবা চটের তৈয়ারী একটি মাত্র পুঁটুলি দেওয়া হয়, জিলিংবুরুর খাড়া যন্ত্রের মত একসঙ্গে তিন-চারটি নহে। কিন্তু চাপিবার পর পুঁটুলি চাপে পাতলা হইয়া যায়। তখন দুই খণ্ড পাটার মধ্যে পিংপং খেলিবার ব্যাটের মত এক খণ্ড কাঠ

গুঁজিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় চাপিলে পুঁটুলির উপরে আবার জোর পড়ে, অবশিষ্ট তেল নিষ্কাশিত হইয়া যায়।

যন্ত্রের নাম ঘাঁত। বৃত্তাকার নালির নাম চাঁদ, ব্যবধান কমাইবার কাষ্ঠখণ্ডের নাম ঠেকুয়া। যে ক্ষুদ্র চুপড়িতে তৈল-নিষ্কাশনের জন্য বীজগুলিকে পুরিয়া চাপানো হয় তাহার নাম পোটোম।

কেন্দুপুসির নিকট মুকুন্দপুর গ্রামে ৯।১০।১৯৩৮ তারিখে একটি ঘাঁত দেখিয়াছিলাম, তাহার চাঁদ অন্য রকমের, চাঁদের মুখ পাশে কাটিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহাকে ভিতরে কিছু দূর বিস্তৃত করিয়া তাহার পর নিম্নস্থ কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যভাগে ছেদ করিয়া নীচে মধ্যস্থলে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।



নালিবিহীন ঘানির বিভিন্ন অংশ

ভূমিজক্ষেত্রে অবস্থিত পাটার ঘাঁত মানিকবাজারে মাহাতো বা কুর্মিজাতির দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ছোট লুপুং গ্রামে সাঁওতালদের মধ্যে ইহার একটি বিকল্প দেখিয়াছি। ধানকোটার ঢেঁকির উপরে ভাপানো বীজ বসাইয়া দেওয়া হয়, আর একটি ঢেঁকি তাহার উপর উল্টাইয়া শোয়াইয়া চাপ দেওয়া হয়, নয়ত একখণ্ড কাঠ তাহার বদলে উপরে দেওয়া হয়। তবে সাঁওতালদের মধ্যে জিলিংবুরুর মত খাড়া ঘাঁত দেখি নাই। ২৭।১২।১৯২৬ তারিখে পালামৌ জেলার শাক থানার অন্তর্গত গোইন্দি গ্রামে খেরওয়ারদের মধ্যে এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহারের বিষয় শুনিয়াছিলাম, তবে কাহারও বাড়িতে ইহা চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ হয় নাই। ১৮।৯।১৯২৬ তারিখে রাঁচি জার্মান মিশনের জনৈক খ্রীষ্টান কোল শ্রীযুক্ত ইলায়াস তপন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামে রাঁচি জেলায় খুঁটি থানার পশ্চিমে অবস্থিত

সোনপুর এলাকায় এইরূপ যন্ত্রের ব্যবহার আছে। তবে সেখানে নাকি সরিষার তৈলও এই উপায়ে নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। সাঁওতাল-পরগণা এবং আসাম হইতে আনীত দুইটি অনুরূপ যন্ত্রের নমুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগে রক্ষিত আছে। নিকোবর-দ্বীপ হইতে আনীত আর একটি যাঁত কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

(গ) তেলের ঘানিগাছটি এক খণ্ড শালকাঠে তৈয়ারি। ইহা ভূমির উপরে প্রায় দেড় হাত ও নীচে তিন চার বা আরও বেশী হাত পোঁতা আছে। ঘানিগাছের মাথায় যে খোলটি কাটা আছে তাহা কতকটা কলসীর আকারে কাটা। ইহা তেলিরা নিজে কাটিয়া লয়, ছুতারের সাহায্য গ্রহণ করে না। অনেক দিন কাজ হইলে উপরের অংশ ক্ষইয়া যায়, তখন একটু কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন খোল নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়।

যন্ত্রের নাম ঘনা। যে দণ্ডের দ্বারা নিষ্পেষণ হয় তাহার নাম লাঠি। যে পাটায় বলদ জোতা থাকে তাহাকে পাঁজরি বলে। পাঁজরির সহিত বাঁশপাতি নামক আর এক খণ্ড *কাঠ জোড়া থাকে, তাহার বাঁকা মুখের নাম মগরমুহি। পাঁজরিতে ইসের সাহায্যে* জোয়াল বাঁধা থাকে। পাঁজরির উপরে খাড়া মালকুম দণ্ড, তাহাতে দুই তিনটি ছিদ্র থাকে। মালকুমের উপরিভাগের সহিত বাঁকিয়া নামে একটি বাঁকা কাঠ থাকে, তাহার মধ্যে একটি খোপে লাঠির উপর অংশ বসিয়া থাকে। আলগা যন্ত্রপাতির মধ্যে শাবল, ইহার মুখ ঈষৎ বাঁকা। তাই খইল কুরিয়া কুরিয়া তুলিতে সুবিধা হয়। আর কাঠি নামে এক খণ্ড কাঠে কিছু ময়লা ন্যাকড়া বাঁধা থাকে। তাহার সাহায্যে জলে ভাসা তেল শুষিয়া লওয়া হয়।

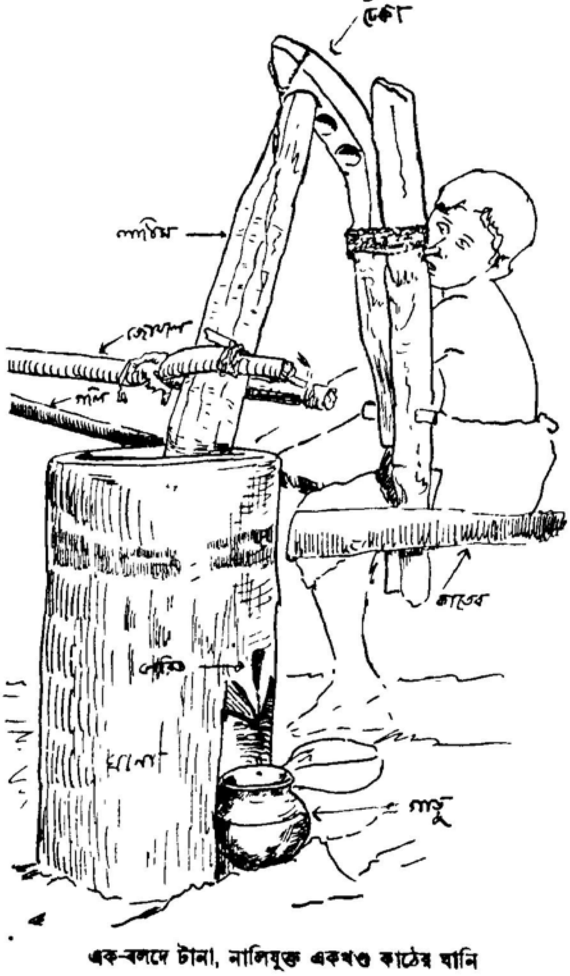
বীজগুলিকে প্রথমে জলে মাখিয়া ঘানির মধ্যে দেওয়া হয়। পাঁজরির উপরে পাথরের ভার চাপানো হয়, যে চালায় সেও ইহার উপরে দাঁড়াইয়া বলদকে হাঁকায়। তেল যেমন বাহির হইতে থাকে, জলের পরিমাণও বাড়ানো হয়। তখন তেল ভাসিয়া উঠে এবং কাঠির সাহায্যে তাহা তুলিয়া ফেলা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ার ফলেই বোধ হয় খইলে চিট হয় এবং তাহা খইলের পার্শ্বদেশে লাগিয়া যায়। তখন চারটি খড় কুচাইয়া ঘানির মধ্যে ফেলিয়া পুনরায় ঘানি চালানো হয়। কুচা খড়ের ঘর্ষণেই বোধ হয় খইল পাশ হইতে ছাড়িয়া যায়।

যে-তেলিরা দুই বলদের ঘানি চালায় তাহাদের জল ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে গ্রহণ করে। ইহাদের জাতি তেলি, পদবী পড়িহারি। যেমন ক্ষেত্রমোহন পড়িহারি। ইহারা ঘানিতে কখনও এক বলদ জোতে না, ঘানির মধ্যে তৈল-নিষ্কাশনের ছিদ্র করে না।

(ঘ) কিন্তু মানিকবাজারের উত্তরে সুরতাড়ি গ্রামে যে শালকাঠের ঘানি দেখিয়াছি তাহা এক বলদে টানে।

ঘানিগাছ মাটির উপরে দেড় হাত বাহির হইয়া থাকে, নীচে দুই হাত পোঁতা। উপরে (গ)-এর মত খোল কাটা থাকে, তাহার নীচের দিকে কিন্তু একটি গর্ত্ত। সুরতাড়ির ধনু গোরাঁইয়ের ঘানির ছবি লইয়াছিলাম।

ঘানির নাম ঘানা। যে ছিদ্র দিয়া তেল বাহির হয় তাহা নেরিও। নীচে গাড়ু থাকে। পেষণদণ্ডের নাম লাঠিম। কাঠের পাটাটি মাটি হইতে উপরে থাকে, ইহাকে কাতের বলে। কাতেরে সংলগ্ন খাড়া কাষ্ঠখণ্ডের নাম লইতে ভুল হইয়াছিল, তাহাতে বাঁধা বাঁকা কাঠের নাম ঢেঁকা। ইহাতে দুই তিনটি খাট কাটা আছে, তাহাতে লাঠিমের উপরাংশ প্রবিষ্ট থাকে। লাঠিমের সহিত আলগা ভাবে যুক্ত জোয়াল। ইহার সহিত আড়াআড়ি একটি কাঠি কাতেরের শেষ ভাগের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধা থাকে। এই কাঠির নাম গলি। কাতেরে চালক পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকে, ওজনের জন্য পাথরও চাপানো হয়।



এক-বলদে টানা, নালিযুক্ত একখণ্ড কাঠের ঘানি

সুরতাডির বন্ধু গোরাঁইয়ের বাড়িতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাদের সহিত মানিকবাজারের বড় ঘানি ব্যবহারকারী তেলিদের প্রভেদ কি। উত্তরে এক বৃদ্ধা বলিল, "উহারা দো-বলদিয়া, আমরা এক-বলদিয়া।" আরও শিখিলাম :

(১) দো-বলদিয়াদের লাঠি লম্বা, এক-বলদিয়াদের ছোট, মাত্র দুই হাত। তাই ইহারা ঘরের মধ্যে ঘানি চালাইতে পারে, দো-বলদিয়ারা পারে না।

(২) যে-পাটায় চালক চাপিয়া বলদ হাঁকায় তাহা দো-বলদিয়াদের ক্ষেত্রে মাটিতে ঠেকে, এক-বলদিয়াদের ঠেকিতে পারে না। ঠেকিলে গাড়ু ভাঙিয়া যাইবে।

(৩) দো-বলদিয়ারা ঘানিতে জল দেয়, ইহারা তেল পেষার সময়ে দেয় না, আগে যা সামান্য মাখাইয়া লয়। ইহাদের তেল বর্ষাকালেও ভাল থাকে, উহাদের নষ্ট হইয়া যায়, বেশী দিন থাকে না। ইহাদের খইল ছাড়াইতে কষ্ট নাই, উহাদের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়।

(৪) ইহাদের ও উহাদের মধ্যেও সাগা বা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

যদু গোরাঁইয়ের আত্মীয়স্বজন পাতকুম (মানভূম) রাইরজডি (ময়ূরভঞ্জ), ঝালদা (মানভূম), গোলা (হাজারিবাগ) অঞ্চলে থাকে। এই স্থানগুলি মানিকবাজার হইতে দক্ষিণে এবং উত্তরে, ঈষৎ উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

(ঘ) শেষের যন্ত্রটিও এক বলদে টানে। আমি নারাণপুর গ্রামে ঘাসিরাম গরাঁইয়ের বাড়ীতে ইহা দেখিয়াছি।

যন্ত্রের নাম ঘানা। উপরে আলাদা কাঠে তৈয়ারি জামবাটির মত অংশের নাম পিঁড়ি। পেষণদণ্ডের নাম জাঠ। জাঠের উপর অংশে একটি বাঁকা সুদৃশ্য কাষ্ঠখণ্ড আটকানো থাকে, তাহার নাম মাকড়ি। মাকড়ির পশ্চাদ্ভাগে একটি ছিদ্র, তাহার সহিত দড়ি দিয়া মথমখুঁটা বাঁধা। মথমখুঁটা পাটার উপরে দাঁড়াইয়া থাকে। পাটার যে-প্রান্ত ঘানার গায়ে ঘষিয়া যায় সেখানে গোলোই নামে আর একটি কাঠের টুকরা জোড়া থাকে। ঘানার নীচে যে-স্থান দিয়া তেল বাহির হয় তাহার নাম পাৎনালি। নীচে ভাঁড়ে তেল পড়ে। ঘানির মধ্যে বীজকে নাড়িয়া দিবার জন্য একটি কাঠি আটকানো থাকে, তাহাও ঘোরে। ইহার নাম সাঁকনি। গরুর চোখে চামড়ার ঠুলি থাকে। গরুকে জুতিবার জন্য জোয়াল। জোয়াল পাটার সঙ্গে একটি আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা কাঠি দিয়া আটকানো থাকে, তাহা কাইলুড়ি।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, নারাণপুরের কলুরা শালের পরিবর্তে অশথ, বট ও নিম কাঠের ঘানি করা ভাল মনে করে। হয়ত তাহারা যে-দেশ হইতে আসিয়াছিল, সেখানে শালকাঠের অভাব আছে।

নারাণপুর গ্রামের ঘাসিরাম গরাঁই এবং মহেশ্বর গরাঁই নামে দুই জন কলুর কাছে সুরতাডির গোরাঁইদের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় নিম্নোক্ত সংবাদ পাওয়া গেল।

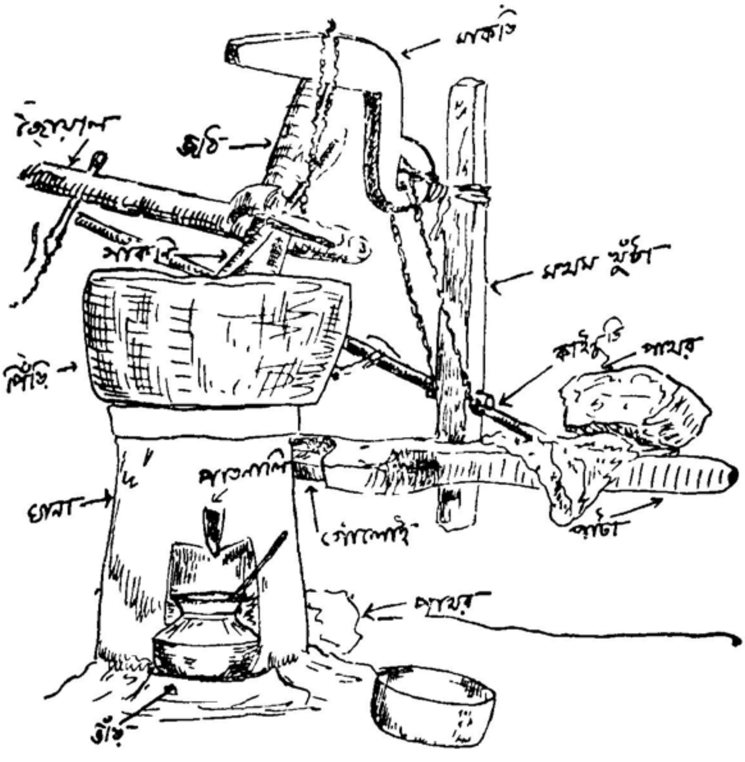
(১) "আমরা একাদশ তেলির অন্তর্গত। জাতি, কলু। এই গ্রামে দ্বাদশ তেলির অন্তর্গত লোকও আছে, তবে তাহারা তেল পেষে না, ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আমরা রাঢ়ী কলু অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর, কেননা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দ্বিতীয় বিবাহের (=বিধবাবিবাহ) চলন করিয়া গিয়াছিলেন।

(২) "মানিকবাজারের দুই-বলদওয়ালা তেলি এবং সুরতাডির এক-বলদওয়ালা

তেলিদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। উহারা উভয়েই উড়িষ্যা-বিভাগের লোক। আমরা পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক (=পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বঙ্গদেশের, বাংলার পূর্ব্বাঞ্চলের নহে)। এখানে তিন চার পুরুষ বাস করিতেছি। শিখরভূম হইতে আসিয়াছিলাম।" শিখরভূম মানভূমের বরাহভূমের পূর্ব্বে অবস্থিত।

(৩) "সুরতাডির উহাদের সহিত আমাদের জল চলে না। উহারা কুঁকুড়া ও মদ খায়। উহারা বোধ হয় মগহিয়া (=মগধ বা বিহার প্রান্তের লোক)।"

১৬।১০।১৯৩৮ তারিখে আমি পুনরায় সুরতাডির ধনু গোরাইয়ের বাড়ী যাই; সেখানে সকলকে নারাণপুরের কলুদের বিষয় প্রশ্ন করায় সেই বৃদ্ধা উত্তর করিল,



এক-বলদে টানা, নালিযুক্ত, পিঁড়ি-বিশিষ্ট ঘানি

(১) "নারাণপুরের বাঙালীশাহীর (=বাঙালী-পাড়ার) উহারা শিখ্‌রিয়া (=শিখরভূমের অধিবাসী) বটে।"

(২) "উহাদের ঘানিতে পিঁড়ি আছে, আমাদের নাই।"

সেই দিন ধনুর বাড়ীতে পোষা মুরগী দেখি এবং পূজা-বিশেষে তাহারা মুরগী বলি দেয় ইহাও শুনি। ইহাদের মধ্যেই যে সাগা বা বিধবাবিবাহ আছে তাহা নহে। ধনু

এবং অপরেও বলিল যে ব্রাহ্মণাদি দু-এক বর্ণ বাদে সকলের মধ্যেই এদেশে সাগা প্রচলিত আছে। দো-বলদিয়া তেলিদেরও নাকি সাগা হয়। আর মুরগী বলি দেওয়ার কথা, তাহা দেবতা-বিশেষে ব্রাহ্মণাদি সকলেই নাকি করিয়া থাকে। ক্ষেত্রে চাষের সময়ে গোবর দিয়া লেপিয়া সিঁদুর দিয়া স্থানটি চিহ্নিত করিয়া আতপচাল নৈবেদ্য দেয়, মুরগীরও বলি হয়। তবে এ সকল সংবাদ অন্য কোথাও যাচাই করিবার অবসর পাই নাই।

কয়েকটি সাধারণ তথ্য

তৈল-নিষ্কাশনের জন্য দো-বলদিয়া অথবা এক-বলদিয়া তেলি ও কলুদের মধ্যে বাণী বা মজুরি লইবার নিম্নলিখিত রীতি প্রচলিত আছে। যত সের সরিষা, তিল বা গুজা পেষা হয় তৈলকার তত সের চাল পায়। উপরন্তু খইল তৈলকারের লভ্য হয়। ঘানিতে চার মণ সরিষায় এক মণ তেল হয়। কিন্তু আজকাল কলের ঘানিতে তিন মণে নাকি এক মণ তেল হয়। তাই তেলিরা বাজারে কলের তেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, তাহাদের পড়্তায় পোষায় না।

পূর্ব্বে সড়াইকলায় কেবল তিল, গুজা, রেড়ী ও মহুয়া-বিচির তেলই চলিত। কোলেরা রেড়ী ও মহুয়া-বিচি বা কড়চার তেল ব্যবহার করিত। ইদানীং, বিশ পঁচিশ বৎসর হইতে সরিষা চলিতেছে। ইহাকে "ভাল তেলও" বলে, কেননা ভাল লোকেরা ইহা খায়। নারাণপুরের বাঙালী কলুরা আজকাল ছয় সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত জমসেদপুরের মাদ্রাজী অধিবাসিগণের নিকট তিল-তেল বিক্রয় করিয়া দু-পয়সা রোজগার করিতেছে।

ঐতিহাসিক আলোচনা

পূর্ব্বে যে-পাঁচটি যন্ত্রের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যন্ত্র জাতিনির্ব্বিশেষে লোকে নির্ম্মাণ করিতে পারে। তবে খাড়া পাটা কোলেদের ও ভূমিজদের মধ্যে দেখিয়াছি, অন্যটি নানা জাতির মধ্যে। দুই যন্ত্রের অংশের নাম আলাদা, অতএব দুই স্থান হইতে হয়ত দুইটি যন্ত্র সড়াইকলায় পৌঁছিয়াছিল। বলদ জুতিয়া ঘানি চালানো কেবল তেলি ও কলুদের কাজ। রাঁচি জেলায় দেখিয়াছি তেলি ভিন্ন অপর জাতির লোকেও ঘানিতে তেল পেষে, তবে জাত-হারাইবার ভয়ে বলদ জোতে না, মানুষেই ঠেলিয়া চালায়। নারাণপুরে সংবাদ পাইলাম যে সিংহভূমের জয়ন্তগড় এলাকায়, অর্থাৎ কেঁওঝর-রাজ্যের সীমানায় অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

এইবার বলদে চালানো তিনটি ঘানি সড়াইকলায় কোথা হইতে আসিল তাহার সন্ধান লওয়া যাক। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘানি অর্থাৎ "দো-বলদিয়া" জলচল জাতির দ্বারা চালিত হয়। তৃতীয় বা "এক-বলদিয়া" ঘানি জল-অচল জাতিতে চালায়। তাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। যাহারা এক-কাঠের ঘানি করে তাহারা আবার মদ ও মুরগী খায়, পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানিকরেরা অনাচরণীয় হইলেও মদ বা মুরগী খায় না।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচলিত ঘানির বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে গ্রিয়ার্সন সাহেব *Bihar Peasant Life* গ্রন্থে বিহারের ঘানির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার সহিত সুরতাভির এক-কাঠের ঘানি অনেকটা- মিলিয়া যায়। এখানে যাহা ঘানা সেখানে তাহা কোলুহ। বিহারে ঘানী বা ঘান বলিতে ততখানি তৈলবীজকে বুঝায় যাহা একবারে কোলুহর মধ্যে পেষার জন্য দেওয়া চলে।* সুরতাভির নেরিও বিহারে নিরোহ্ বা নারাহ্। কাতের বিহারে কৎরী নামে পরিচিত। লাঠিম কিন্তু জাঠ নাম ধরিয়াছে। সুরতাভির ঢেঁকা বিহারের ঢে কা বা ঢে কুআ। গাড়ু কিন্তু ছনা। অর্থাৎ বিহারের সহিত সুরতাভির কিছু নাম মেলে, কিছু মেলে না।

এইরূপ এক-কাঠে-তৈয়ারি ঘানি পূর্ব্ববঙ্গে সিলেট, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলাতেও প্রচলিত আছে, তবে সেখান হইতে বিভিন্ন অংশের নাম এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মানিকবাজারের দো-বলদিয়াদের কথা বিশেষ জানি না। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিগত সায়েন্স কংগ্রেসে (জানুয়ারি ১৯৩৮) তৈলকার এবং বিভিন্ন প্রকারের ঘানির সম্বন্ধে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে এবং মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকাতেও† সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, দাক্ষিণাত্যে দো-বলদিয়া ছিদ্রবিহীন এবং গুজরাত-প্রান্তেও ছিদ্রবিহীন ঘানির প্রচলন আছে। সম্প্রতি গুজরাতে ছিদ্রযুক্ত ঘানির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। সেখানকার নাম ও পুরা বর্ণনা পাইলে মাণিকবাজারের ঘানির ইতিহাস মিলিতে পারে। উড়িষ্যায় প্রচলিত ঘানির বর্ণনাও এই প্রসঙ্গে সংগ্রহের আবশ্যকতা আছে।

নারাণপুরের কলুরা নিজেদের স্পষ্টই বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিল। নদীয়া জেলা এবং চব্বিশ-পরগণায় পিঁড়িবিশিষ্ট ঘানির চলন আছে। অন্যত্রও থাকিতে পারে, তবে সে সংবাদ সংগৃহীত হয় নাই। সেগুলি পাইলে কলুরা কোথা হইতে সড়াইকলা এবং শিখরভূমে পৌঁছিয়াছিল তাহার একটা হদিস্ মিলিতে পারে।

যাহাই হউক, সড়াইকলায় তেলের ঘানি হইতেই আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এখানে বিভিন্ন শিল্পধারা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। ভাষাও আমাদের সেই তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের ইতিহাসটি পুরাপুরি উদ্ধার করিতে হইলে বাংলা দেশের এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রান্তের শিল্পকলা, আচার-ব্যবহার, যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ ও বর্ণনের আবশ্যকতা আছে। গ্রিয়ার্সন বিহারের সম্বন্ধে যে-কাজ করিয়া গিয়াছেন, বাংলা দেশে তাহার আশু প্রয়োজন আছে।

---

* ঘান বলিতে হিন্দীতে একসঙ্গে উদুখলে বা যাঁতায় যতখানি শস্য ধরে, একবারে কড়ায় যতখানি জিনিষ ধরে তাহাকেও বুঝায়।

† *Harijan,* Vol. V. 1937-38, Nos. 16, 17, 19, 20, 21. ক্ষিতীশবাবুর প্রবন্ধটি *Journal of the Anthropological Institute of India,* Vol. I No. 1-এ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বিগত শতাব্দীতে বগুড়া জেলার সেরপুর নামক গ্রামে কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী এক ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সন তারিখ জানা যায় না। ১৩০৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। গোবিন্দচন্দ্রের শিক্ষা বোধ হয় সেকালে ছাত্রবৃত্তি অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কবিতায় যেরূপ শাস্ত্রজ্ঞান ও ভাষার কারুকার্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই গ্রাম্য কবির প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সাধনার সুখ্যাতি না করিয়া পারা যায় না। ইঁহার গানে এমনই একটি সরল সহজ স্বচ্ছ ভাব আছে, যাহা অনায়াসে হৃদয় স্পর্শ করে। বহু লোকের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের গান এখনও প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের গানে যেরূপ সরল প্রাণের স্পর্শ আছে, এই কবির গানেও তাহা পাওয়া যায়। এই অনন্যসুলভ মর্মস্পর্শী বৈরাগ্যমিশ্রিত ভক্তিভাব তিনি কেমন করিয়া লাভ করিলেন, ইহা লইয়া কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে বলেন তিনি গ্রামের শ্মশানে বসিয়া সাধনা করিতেন। নিশীথ রাত্রিতে নৌকার মাঝিরা নদীতীরের এই শ্মশান-ঘাটে লোক বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভীতিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছে—ওখানে কে? গোবিন্দচন্দ্র প্রত্যুত্তর দিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে সংসারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু সংসারের সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিত না। মনে মনে তিনি বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ভাবেই সাধনা করিতেন। এই বৈরাগ্যের সুর তাঁহার কবিতায় বিশেষ ভাবে বাজিয়াছে :

সংসারী বলিয়ে শ্যামা
ঘৃণা আমায় কর মিছে।
দেহ আমার গেহবাসী
মন যে সন্ন্যাসী হয়েছে।
দুর্নিবার বিষয়-দায়
দেহ আমার গেহ চায়

মন কিন্তু আগে হতেই
শ্মশান-আশ্রম সার করেছে।
দেহ দিব্য বসন ধরা
মন যে আমার কৌপীন পরা
দেহ চায় মোর গন্ধ তৈল মা।
মন যে চিতা ছাই মেখেছে।

—সদ্‌ভাব পুষ্পাঞ্জলি

গোবিন্দচন্দ্র শ্মশানের বর্ণনায় শতমুখ। তাঁহার এই শ্মশান-প্রীতির তুলনা বঙ্গ-ভাষায় নাই।

আমার শ্মশান ব'লে কিবা ভয়।
শ্মশান রঙ্গিণী শ্যামা মোর জননী
শ্মশানবাসী আমার পিতা মৃত্যুঞ্জয়।

বিভীষিকা আমায় দিবে কি রে সাজা ;
পিতা ঈশান আমার শ্মশানভূমির রাজা
প্রেত পিশাচ কবন্ধ বিত্তভোগী প্রজা
ভূত ভৈরবাদি ভৃত্য বইত নয়।

শ্মশানে শুধু যে ভয় নাই, তাহা নহে। কবি উহাকে পরম পবিত্র স্থান রূপে বর্ণনা করিয়া মৃত্যুর করাল বিভীষিকাকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান।
পরম পবিত্র চরম যোগের স্থান
পাপী পুণ্যবান মূর্খ কি বিদ্বান
সমান ভাবে হেথা সকলে শয়ান।

*　*　*

জাতিভেদ হেথা নাই রে কোন কালে
এক শয্যায় শয়ান ব্রাহ্মণে চণ্ডালে
সমান কুশ-পাত্র প্রেতান্ন আর জলে
সমান তৃপ্ত সবার প্রাণ—

*　*　*

জিতেন্দ্রিয় জীব আসা মাত্র হেথা
মহামৌনী দগ্ধ হ'লেও কয় না কথা
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় উপাধি লোপ পায়
সমাধির অধীন হয় প্রাণ,—
জন্মের মত ঘুচে যায় রে শোক রোগ
স্বপ্ন শূন্য নিদ্রা হয় রে উপভোগ
শ্মশান মাত্র নাম কিন্তু শান্তিধাম
(হেথা) সুখদুঃখ শ্রান্তি চির অবসান।

উপরের গান দুইটিতে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করিবার যে ভাবটি পাওয়া যায়, তাহা আমরা সাধক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের মধ্যেও দেখিতে পাই। কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় গোবিন্দচন্দ্রের খ্যাতিও বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়ে। গোবিন্দচন্দ্রের উপরিলিখিত গান ও অন্য অনেকগুলি গান এখনও লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ কীর্তন-গায়ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য এরূপ ভাবের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের গীত গান করেন যে, তাহাতে সহস্র সহস্র নরনারী মুগ্ধ হয়। কবি যে সঙ্গীত সম্বন্ধেও পারদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহার একটি রূপকে বুঝিতে পারা যায় :

মনের বাসনা যদি গাবে গান।
যদি থাকে উদ্‌ভব লয়ের স্থান
তবে ত্রাণ কর মা বলে' একবার তারা নামে ছাড় তান।
বসন্তের হৈও না বশ　　বাহার বিষম বিরস,
নটখটে ক'র না রে যোগদান ;—
অহং রাগ পরিহর,　　গৌরী আলাপন কর,
জয়জয়ন্তি বল একবার জুড়াই কান ;—
ক্রমে শ্রীরাগ জন্মিবে হবে বাগীশ্বরীর অধিষ্ঠান।

*　*　*　*

ছায়া নটের সভায় এসে,　　আদর কেন মালকোষে
কর সদা পরজে আপন জ্ঞান ;
এবার সিন্ধুতে ত্রাণ পেলে তবে বাঁচে রে গোবিন্দের মান।

দুস্তর ভবসিন্ধু হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য গোবিন্দচন্দ্রের আর্তির সীমা নাই। এই ভাবধারা তাঁহাকে বৈরাগ্যে দীক্ষিত করিয়াছিল। তাঁহার সাধনার মূলমন্ত্র :

* * * *

কেবল বায়ু বইত নয়, প্রাণের ভরসা কি মন।
নিমিষে মিশে যায় জল-বুদ্‌বুদের মতন॥
অধোমুখে কুশাগ্রে শিশির বিন্দু যতক্ষণ,
ভগ্ন ঘটের বারি যেমন টুটে প্রতিক্ষণ,
উৎপলের দলে জল চঞ্চল যেমন
তেমনই পলে পলে টলে এ জীবন॥

এইরূপ দার্শনিকতা বা আধ্যাত্মিকতা তাঁহার কবিতার মেরু মজ্জা জোগাইয়াছে। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের যুগে এবং তাহার পূর্বেও আমাদের দেশের নরনারীর পক্ষে ইহা একেবারেই দুর্বোধ্য ছিল না। এখনও বাংলার এই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য একেবারে লোপ পায় নাই। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিতে পাশ্চাত্ত্য পাঠক বিস্মিত হইলেও আমাদের দেশে ইহার ছন্দ, ইহার ব্যঞ্জনা চিরপুরাতন এবং চিরনূতন। সেই জন্য গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা দার্শনিকতা সত্ত্বেও জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিল। রংপুরের খ্যাতনামা জমিদার গোবিন্দলালের অর্থব্যয়ে ১২৯১ সালে তাঁহার 'সদ্‌ভাব সঙ্গীত' প্রকাশিত হইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নিরঞ্জন চৌধুরী কর্তৃক এই গ্রন্থের আরও কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'সঙ্গীতপুষ্পাঞ্জলি' নামক আর একখানি কবিতা-গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বোধ হয় সন্দিগ্ধ হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন,

দেখিতে গেলে অলসের অদৃষ্টবাদ, চেষ্টাশূন্যের আত্মসমর্পণ, অক্ষমের কর্মপ্রতীক্ষা, পাপীর অযোগ্য প্রার্থনা, নিরুপায়ের অলীক সরলতা, ভীরুর অস্ফুট বলগর্ব, দরিদ্রের অসার বৈরাগ্য—ইহাই কেবল লক্ষিত হইবে। এরূপ দুঃসাহস লোকে ক্ষিপ্ত হৃদয়ের অবৈধ উচ্ছ্বাস বলিয়াই অভিহিত করিবে, তবে ভরসা এই স্থানে স্থানে অমৃত পুরুষের নামামৃত-প্রক্ষেপ আছে; তাই ধৃষ্টতা ও লজ্জার ভ্রূকুটীতে ভীত না হইয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি প্রকাশ করিলাম।

গোবিন্দ যে কর্মচেষ্টারহিত অলসপ্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা বোধ হয় না। তিনি স্থানীয় (শেরপুর) জমিদার মুন্‌সী-বাবুদের অধীনে কার্য করিতেন। মুন্‌সী-বাবুরা তাঁহাকে কবিত্ব ও সাধুতার জন্য অত্যন্ত খাতির করিতেন। কিন্তু রামপ্রসাদের মত, গোবিন্দের মনও বিষয়কর্মে আবদ্ধ করিতে পারিল না। জগন্মাতার তবিলদারীর জন্য তাঁহারও প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মুন্‌সী-বাবুরা তথাপি তাঁহার ভরণপোষণের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন নাই, এইরূপ শুনিয়াছি। তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ তেজ ছিল। এ সম্বন্ধে একটি গল্প যাহা শুনিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয়। এক জন ৬৫'বৎসরের বৃদ্ধ ধনশালী ব্যক্তি প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তখন তাঁহার ২৫।২৬ বৎসরের পুত্রটি বর্তমান। পুত্রের বিবাহের চেষ্টা না করিয়া তিনি

নিজে বিবাহ করিলেন, এই লজ্জায় পুত্রটি আত্মহত্যা করিল। এই আত্মঘাত গোপন করিয়া পিতা সমারোহে পুত্রের শ্রাদ্ধ করিলেন। সেই সভায় গোবিন্দচন্দ্র সকলকে সম্বোধন করিয়া এই গল্পটি বলেন: এক দিন কামদেব ও যমরাজ শিকারের সন্ধানে পৃথিবী পরিক্রমণ করিতে করিতে এক সরোবর-তীরে মিলিত হইলেন। তখন তাঁহারা আপন আপন পরিচ্ছদ ও তীর-ধনুক তীরে রাখিয়া স্নানার্থ সরোবরে নামিলেন। পরে উঠিয়া নিজ নিজ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপন গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু ভ্রমক্রমে তাঁহাদের তূণের বদল হইল। শেষে যমরাজ এই বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন এবং কামদেব বৃদ্ধের অনিন্দ্যসুন্দরকান্তি যুবাপুত্রকে লক্ষ্য করিলেন। যমের বাণে এই বৃদ্ধ কামমোহিত হইয়া বিবাহ করিয়া বসিলেন এবং কামের বাণে তাহার পুত্র স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিল।

শুনিয়াছি, এই গল্প শুনিয়া সকলেই সে কলুষিত ভবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গল্পটি সত্য হউক বা না-হউক, ইহা হইতে বুঝা যায় যে গোবিন্দচন্দ্রের চরিত্রে দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল।

গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায় যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কোনও কোনও সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতের মত শোনায়।

ভাব মন তাঁরে যে জন
এ ভব কেলিকুঞ্জের কারুকর।
যাঁর নিরমিত গরল অমৃত
মৃত জীবিত চরাচর।
যাঁর সৃজন সিন্দূরারুণ
সান্ধ্য বিমল দিনকর,
নীরদমুক্ত শরদ চন্দ্রের
ক্ষীরোদ ধবল বিনোদকর,
যাঁর সৃজন দামিনী-
দামজড়িত শ্যাম জলধর।

গোবিন্দের বীণা কিন্তু মায়ের নামেই সাধা। মায়ের নামে কবি আত্মহারা। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার মনে তিলমাত্র বিদ্বেষ নাই। গোবিন্দচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়াছেন:—

ঘাটে হেরিনু নব কৈশোর
কে সে শ্যামল লাবণি।
* * *
ইন্দ্রধনুকতুচ্ছকারী কুসুমগুচ্ছ গাঁথনি
ময়ূরপুচ্ছ খচিত লইরে উচ্চ চূড়ায় টালনি।
বিনোদ ভালে নিবিড় অলকা
বলাকা মদ বিড়ম্বিনী,
নধর বক্ষে ভৃগু পদাঙ্ক
মণি কৌস্তভ সাজনি। ইত্যাদি

তাঁহার একটি অপ্রকাশিত পদে রাধামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এ পদটি আমি

পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। ভাবে ও ভাষায় এই গানটি কবির রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে :—

অল্পভাগ্যে অবৈরাগ্যে চিনবে কি মন শ্রীরাধায়।
সে নয় সামান্যা রমণী রমণীর শিরোমণি
সুষুম্না চিত্রাণীর মূলে
সুষুপ্তা সাপিণীর প্রায়।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে মূলাধারে পাড়ে ঘুম
যোগে যাগে জাগাইয়ে দেখবে তার লীলার ধুম
কথায় বল্‌লে বুঝ্‌বে কি তা
যা বুঝে না গণেশের পিতা—
স্কন্দ পুরাণ গীতা
যার গুণ বর্ণনায়।
সে যে পরম ব্রহ্মের পরাশক্তি
ধরে রে হ্লাদিনী নাম
ভক্ত চিত্ত বিনোদিনী
অভক্তের প্রতি বাম
সে বিনা আর অন্য জনা
জানে কি কৃষ্ণ ভজনা
জনার্দন জড়িত শুধু তার মায়ায়—
কৃপা করি চিদাগারে কচিৎ প্রকাশ হয় যদি
মানস সরঃ উথেলিয়া বয়ে' যায় অমৃতের নদী
শ্রীমূর্ত্তি-ছটায় তার দীপ্ত করে ত্রিসংসার
যার ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গ ভোলে
অনঙ্গ মূরছা যায়।
সে যে সদ্‌ভাব সখীমণ্ডলে
ঘেরা থাকে অষ্টযাম
কামগন্ধবিহীনা সে
নাশে মায়া মোহদাম
গোপনে গোপ সমাজে জন্ম লয়ে মাঝে মাঝে
রসরাজে মাধুর্য রস বিলায়—
করুণায় গড়া তার সুচির তন্থর তনু
কিবা সে রুচির রুচি সুস্থিরা বিজুরি জনু
সে কনক কোকনদ সদা প্রেমে গদগদ
ঢলে পড়ে বিদগ্ধ বিনোদ শ্যামের গায়।

গোবিন্দ বর্ণিতে নারে কিঞ্চিৎ স্বরূপ তার
ব্রহ্মা আদির অগোচর শ্রীমূর্ত্তি সে শ্রীরাধার
জটিলা কুটিলা তারে চিনিবে রে কি প্রকারে
কেবলি আয়ানের নারী ভাবে তায়—
তেমনি জটিলা প্রকৃতি যত অভক্ত আর অসাধকে
সাজায়ে মানসী তনু গোপী ভাবে শ্রীরাধাকে
আর রসিক কোকিল যত তারা সুরসালে রত
রসহীন বায়স যত নিম্বের আস্বাদ পায়।

গোবিন্দচন্দ্রের অপ্রকাশিত পদ এখনও হয়ত অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্-শাখা এ বিষয়ে একবার যত্নবান্ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়ে। তখন গোবিন্দচন্দ্রের গান অনেক স্থলে প্রচলিত ছিল। যাঁহারা এই গানগুলি মুখে মুখে শিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বিরল হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার আর একটি অপ্রকাশিত পদ আমি পাইয়াছি। তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। গানটি সাধন-পথের পথিকদের জন্যই অভিপ্রেত :

পিতার কোনো গুণ পেলাম না আমি।
পিতা পরম যোগী নির্বিকার নিরাগী
আমি ঘোর সম্ভোগী বিকারগ্রস্ত রোগী
পিতা মোর ত্যাগী আমি অনুরাগী
পিতা নিষ্কাম আমি কামী।
পিতার ভালে চাঁদ মোর ভালে কলঙ্ক
পিতা কালের কাল কালেই মোর আতঙ্ক
আমার নিজের যে বিত্ত তাতেই নাই কর্ত্তৃত্ব
পিতা আমার ভবস্বামী।
বিশ্বদাহন বহ্নি পিতার ভালে জ্বলে
আমার পোড়া কপাল স্বীয় কর্ম্মানলে
আমি আত্মবিস্মরিত আত্মকর্ম্মফলে
পিতা আমার অন্তর্যামী
কেবল একটি গুণ পেয়েছি পিতার
ক্ষুধা পেলে সদা করি বিষ আহার
তার ভোগ্য বিষয় পিতা মৃত্যুঞ্জয়
আমি মৃত্যুর অনুগামী।
গোবিন্দ কয় মন কেন রে বিষাদ
পিতার গুণ পেতে কর যদি সাধ
ত্যেজে বিষয় সাধ পিতায় গিয়ে সাধ
দেহপ্রাণ দিয়ে প্রণামী।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৩)*

শ্রীসজনীকান্ত দাস

চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকার

বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ-নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ছাপার হরফের সহিত বাংলা-গদ্যের ক্রমোন্নতির কাহিনী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সুতরাং উইলকিন্স-পঞ্চানন প্রসঙ্গ একটু বিস্তৃত করিলে দোষ হইবে না।

পঞ্চাননের জীবন-কাহিনী আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে খুব বেশী নয়। শ্রীরামপুরের মিশনরীদের বিবরণী হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায়, হুগলির নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে তাহার নিবাস ছিল। 'বেঙ্গল পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্টে' (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯১৬, পৃ ১৪০)

---

* বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া আমি এখন পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি, তাহার তিনটি স্থল সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে।

১। "মুদ্রিত ইতিহাস" শিরোনামায় (৪৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪২) লিখিয়াছিলাম, "পদ্মনাভ ঘোষালের কোনও ইতিহাস আমরা দেখি নাই।" 'গৌড়ীয় ভাষা-তত্ত্ব, প্রথম খণ্ড' নামক একখানি পুস্তক সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থকার দুই জন—শ্রীপদ্মনাভ ঘোষাল ও শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পুস্তকটি কলিকাতা পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১৭৯৭ শকে (১৮৭৫ খ্রীঃ) প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ।৶+১১৬। এই পুস্তকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ সামান্যই আছে।

২। "বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগ" শিরোনামায় (পৃ ৪৫) শ্রীজহরলাল বসুর 'বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে'র ২৫ পৃষ্ঠা হইতে প্রাচীনতম বাংলা গদ্যের নিদর্শন হিসাবে শ্রীরাজা ভারামল্ল রায়ের যে ছাড়পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক নহে। "সন ৭৮৫ সাল" খাঁটি হইতে পারে না, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করেন। পরে জানিতে পারিয়াছি, তারকেশ্বরের মোহন্তের মামলার আপীলের পেপার-বুকে যে সকল প্রাচীন দলিল উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি ঐতিহাসিকের নির্ভরযোগ্য নয়।

৩। "১৭৭৮-১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ" শিরোনামায় যে সকল পুস্তকের তালিকা দিয়াছি, কেহ কেহ বলিয়াছেন তাহাতে দুইটি নাম বাদ গিয়াছে। তাঁহারা স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, প্রথম খণ্ডে'র ২১ পৃষ্ঠায় ১৭৯৬ অব্দে প্রকাশিত রামতারক রায় সঙ্কলিত 'সদর দেওয়ানী আইন বিধি' ও রাধারমণ বসু সঙ্কলিত 'নিজামৎ আইন বিধি'র প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেদারবাবুর এই তালিকা আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম। লঙের তালিকায় পুস্তক দুইটির প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৪৬ ও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ দেওয়া আছে। মজুমদার মহাশয় কোনও ভুলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার তালিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে এই দুইটিকে স্থান দিয়াছেন। রাধারমণ বসু ও রামতারক রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। প্রথমটিতে ১৭৯৩ হইতে ১৮৪৬ এবং দ্বিতীয়টিতে ১৭৯৫ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন মুদ্রিত আছে। সুতরাং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থ এ দুইটি হইতে পারে না।

উদ্ধৃত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নোট-বইয়ে তাহাকে ত্রিবেণীর লোক বলা হইয়াছে। ১৭৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলকিন্স যখন হালহেডের ব্যাকরণের জন্ত হুগলিতে ছেনি কাটিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতেছিলেন, তখন পঞ্চানন কর্ম্মকারের সাহায্য গ্রহণ করেন; তাঁহার শিক্ষকতায় পঞ্চানন ছেনিকাটা ও হরফ-ঢালাইয়ের কাজে দক্ষতা লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফর্‌ষ্টার-অনূদিত কর্ণওয়ালিস কোড পুস্তক মুদ্রণে যে হরফ ব্যবহৃত হয়, তাহা পঞ্চাননের কৃত এবং উইলকিন্সের হরফ হইতে অনেক বেশী সুন্দর। পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই হরফের ব্যবহার ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পত্তন হয়; মুদ্রাযন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই দুই তিন মাসের মধ্যে দেখি, পঞ্চানন মিশনের ছাপা-খানায় অক্ষর-নির্ম্মাণের কাজে নিযুক্ত। ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত পঞ্চানন মিশনরীদের আশ্রয়ে থাকিয়া একটি নাগরী সাট (ফাউণ্ট) ও অপেক্ষাকৃত ছোট হরফের একটি বাংলা সাট তৈয়ারী করে। ত্রিবেণী-নিবাসী (শম্ভুচন্দ্রের মতে) যুবক মনোহর এই সময়ে প্রথমে পঞ্চাননের সহকারী, পরে জামাতা হইয়াছিল। মনোহর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) ভারতবর্ষের প্রায় পনরটি প্রাদেশিক ভাষার এবং চীনা ভাষার হরফ প্রস্তুত করিয়া যশস্বী হইয়াছিল। তাহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মিস্ত্রীও এই কার্য্যে খ্যাতি-লাভ করে। বস্তুতঃ পঞ্চাননকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামপুরে একটি হরফ-কারখানা (টাইপ-ফাউণ্ড্রি) গড়িয়া উঠে। কেরীর জীবনীকার জর্জ স্মিথ লিখিয়াছেন, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে এমন কারখানা আর দ্বিতীয় ছিল না। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার নোট-বইয়ে পঞ্চাননের দখল লইয়া কেরী ও কোলব্রুকের মধ্যে বিবাদের এক কৌতুককর বিবরণ দিয়াছেন।

চার্লস উইলকিন্স ১৭৫০ (১৭৪৯?) খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সমারসেটশায়ারের ফ্রোম নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা বিখ্যাত এন্‌গ্রেভার রবার্ট বেটম্যান রে (Robert Bateman Wray)র সহিত সম্পর্কিতা (niece) ছিলেন। পিতা ওয়াল্টার উইলকিন্স। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্বিসে প্রবেশ করিয়া রাইটার রূপে বাংলা দেশে আগমন করেন। কলিকাতায় সেক্রেটরির আফিসে দুই বৎসর কাজ করিয়া তিনি মালদহে কোম্পানীর কুঠিতে সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে প্রেরিত হন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা তখন পর্য্যন্ত এদেশের ভাষা ও সাহিত্য শিখিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন না; দোভাষীর সাহায্যে ব্যবসায়ের কাজ চলিত; রীতিমত রাজ্যশাসনের দায়িত্বও তখন পর্য্যন্ত কোম্পানী গ্রহণ করেন নাই। দূরদর্শী উইলকিন্সই সর্ব্বপ্রথম এ দেশের সহিত ভাষা-ও-সাহিত্যগত আত্মীয়তা গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও ফার্সী শিখিতে আরম্ভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্তি বলে এই দুইটি ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগে নাই। তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য ও ঐতিহ্য এই সকল সাধারণ-ব্যবহৃত অপরিপুষ্ট প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নয়, সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের আকর সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার একটি ছোট ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। সত্য বটে, জেন্টু কোড ও বাংলা ব্যাকরণ প্রণেতা নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড উইলকিন্সের পূর্ব্বেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং উইলকিন্স একথা তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় স্বীকারও করিয়াছেন। কিন্তু হালহেডের সংস্কৃতজ্ঞান মোটেই গভীর ছিল না। উইলকিন্স সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত মহাভারতের অপূর্ব্ব অনুবাদ এই জ্ঞানের ফল।

ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল বহুনিন্দিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের কথা এখানে কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার রাষ্ট্র-জীবন যাহাই হউক, এ-দেশের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি যে পরিমাণ উদার ও সহৃদয় দৃষ্টি দিয়াছিলেন, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আমরা চিরদিন তাহা স্মরণ করিব। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের দিকে আকর্ষণ করেন। নিজের শিক্ষাদীক্ষা যাহাই হউক, তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। জয়গর্ব্বিত ইংরেজকে বিজিত জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তিনিই সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তোলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এ-দেশের সংস্কৃত ব্যবহার-শাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সঙ্কলিত হইয়া ফার্সী অনুবাদের মধ্য দিয়া হালহেড কর্ত্তৃক 'জেন্টু কোডে' রক্ষিত হয়। তিনিই উইলকিন্সকে দিয়া বাংলা হরফ প্রস্তুত করাইয়া হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান,* কলিকাতা মাদ্রাসা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তী কালে স্যর্ উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি ব্যক্তিগত চেষ্টা ও এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্যে এ দেশের সংস্কৃতি-বিস্তারে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকখানি কৃতিত্ব ওয়ারেন হেষ্টিংসের।

উইলকিন্সের মহাভারত-অনুবাদও হেষ্টিংসের উৎসাহের ফল। হেষ্টিংস স্বয়ং এই অনুবাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-অংশ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বারাণসী হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন চেয়ারম্যান নাথানিয়েল স্মিথের নিকট প্রেরণ করিয়া কোম্পানীর ব্যয়ে তাহা মুদ্রণ ও বিতরণ করিতে অনুরোধ করেন। বাংলা-গদ্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হইলেও হেষ্টিংস ও চার্লস উইলকিন্সকে বুঝিবার জন্য এই প্রসঙ্গে লিখিত হেষ্টিংসের ঐতিহাসিক পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, ইউরোপে ভারতীয় জ্ঞানবিস্তারের ইহাই সূত্রপাত। হেষ্টিংস লিখিতেছেন—

Might I an unlettered man venture to prescribe bounds to the latitude of criticism, I should exclude, in estimating the merit of such a production all rules drawn from the ancient or modern literature of Europe all references to such sentiments or manners as are become the standards of propriety for opinion and action in our own modes of life, and equally all appeals to our revealed tenets of religion, and moral duty I should exclude them, as by no means applicable to the language, sentiments, manners, or morality appertaining to a system of society with which we have been for ages unconnected, and

* "১৭৭৮ খ্রীঃ মিঃ এণ্ড্রুস নামক জনৈক ইংরেজ হুগলী সহরে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। মিঃ হলহেড সাহেব সর্ব্বপ্রথমে 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া সেই মুদ্রাযন্ত্রে ছাপেন।"—'প্রচার', ফেব্রুয়ারি ১৯০১।



জন টমাস

[illegible]



চার্লস উইলকিন্স

(জে ডি মিডলটন অঙ্কিত
চিত্র হইতে জে মার্টিন কৃত এনগ্রেভিং)



উইলিয়ম ওয়ার্ড

of an antiquity preceding even the first efforts of civilization in our own quarter of the globe, which, in respect to the general diffusion and common participation of arts and sciences, may be now considered as one community . . . . .

Many passages will be found obscure, many will seem reduntant; others will be found clothed with ornaments of fancy unsuited to our taste, and some elevated to a track of sublimity into which our habits of judgment will find it difficult to pursue them, but few which will shock either our religious faith or moral sentiments . . . . the last sentence with which Kreeshna closes his instruction to Arjoon, and which is properly the conclusion of the Geeta: "Hath what I have been speaking, O Arjoon, been heard *with thy mind fixed to one point?* Is the *distraction* of thought, which arose from thy ignorance, removed?"

To those who have never been accustomed to this separation of the mind from the notices of the senses, it may not be easy to conceive by what means such a power is to be attained; since even the most studious men of our hemisphere will find it difficult so to restrain their attention but that it will wander to some object of present sense or recollection; and even the buzzing of a fly will sometimes have the power to disturb it. But if we are told that there have been men who were successively for ages past, in the daily habit of abstracted contemplation, begun in the earliest period of youth, and continued in many to the maturity of age, each adding some portion of knowledge to the store accumulated by his predecessors: it is not assuming too much to conclude, that, as the mind ever gathers strength, like the body, by exercise, so in such an exercise it may in each have acquired the faculty to which they aspired, and that their collective studies may have led them to the discovery of new tracks and combinations of sentiment, totally different from the doctrines with which the learned of other nations are acquainted: doctrines, which however speculative and subtle, still, as they possess the advantage of being derived from a source so free from every adventitious mixture may be equally founded in truth with the most simple of our own . I hesitate not to pronounce the Geeta a performance of great originality, of a sublimity of conception, reasoning, and diction, almost unequalled . . .

It now remains to say something of the Translator, Mr Charles Wilkins. This Gentleman, to whose ingenuity, unaided by models for imitation, and by artists for his direction, your government is indebted for its printing-office, and for many official purposes to which it has been profitably applied, with an extent unknown in Europe, has united to an early and successful attainment of the Persian and Bengal languages, the study of the Sanskreet To this he devoted himself with a perseverance of which there are few examples, and with a success which encouraged him to undertake the translation of the Mahabharat . . . he has at this time translated more than a third; . . he has rendered it with great accuracy and fidelity . . . .

I have always regarded the encouragement of every species of useful diligence, in the servants of the Company, as a duty appertaining to my office; and have severely regretted that I have possessed such scanty means of exercising it . . . .

Nor is the cultivation of language and science for such are the studies to which I allude, useful only in forming the moral character and habits of the service *Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communication with people over whom we exercise a dominion founded on the right of conquest, is useful to the state: it is the gain of humanity*: in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections; it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection; and it imprints on the hearts of our own countrymen the sense and obligation of benevolence. Even in England, this effect of it

is greatly wanting It is not very long since the inhabitants of India were considered by many, as creatures scarce elevated above the degree of savage life; nor, I fear, is that prejudice yet wholly eradicated, though surely abated Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more generous sense of feeling for their natural rights and teach us to estimate them by the measure of our own But such instances can only be obtained in their writings *and these will survive when the British dominion in India shall have long ceased to exist,* and when the sources which it once yielded of wealth and power are lost to remembrance .

I have seen an extract from a foreign work of great literary credit, in which my name is mentioned, with very undeserved applause, for an attempt to introduce the knowledge of Hindoo literature into the European world, by forcing or corrupting the religious consciences of the Pundits, or professors of their sacred doctrines This reflexion was produced by the publication of Mr Halhed's translation of the Pootee, or code of Hindoo laws; and is totally devoid of foundation It was contributed both cheerfully and gratuitously, by men of the most respectable characters for sanctity and learning in Bengal, who refused to accept more than the moderate daily subsistence of one rupee each during the term that they were employed on the compilation, nor will it much redound to my credit, when I add, that they have yet received no other reward for their meritorious labors Very natural causes may be ascribed for their reluctance to communicate the mysteries of their learning to strangers, as those to whom they have been for some centuries in subjection, never enquired into them, but to turn their religion into derision or deduce from them arguments to support the intolerant principles of their own

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রথম গবেষণার প্ররোচনা লুক্কায়িত আছে। এ বিষয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কীর্ত্তি কাহারও অপেক্ষা কম নয়।

হেষ্টিংসের সুপারিশে উইলকিন্স-অনূদিত *The Bhagvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon* কোম্পানীর ব্যয়ে বিলাতে মুদ্রিত হইয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে প্রকাশিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে উৎসর্গপত্রে উইলকিন্স বলেন,

The world, Sir, is so well acquainted with your boundless patronage in general, and of the personal encouragement you have constantly given to my fell-servants in particular, to render themselves more capable of performing their duty in the various branches of commerce revenue, and policy, by the study of the languages, with the laws and customs of the natives, that it must deem the first fruit of every genius you have raised a tribute justly due to the source from which it sprang

এই গীতাই ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ভারতীয় কাব্যগ্রন্থের সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ।

"The effect which this little work of only 156 pages, including notes, produced upon the literary public in England and throughout Europe, was electrical. All hailed its appearance as the dawn of that brilliant light which has subsequently shone with so much lustre in the productions of Sir William Jones, Mr. Colebrooke, Professor Wilson, etc., and which has dispelled the darkness in which the pedantry of Greek and Hebrew Scholars had involved the etymology of the languages of Europe and Asia." *The Asiatic Journ.*, July 1836, p 166

এই অধ্যায় এমন বিস্তৃতভাবে লিখিবার কারণ এই যে, হেষ্টিংস-হালহেড-উইলকিন্স-

জোন্স-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করিলেও নিজেরা শুধু দিতে ও শিখাইতে আসেন নাই; শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে ও শিখিতে আসিয়াছিলেন। একটা বর্ব্বর অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার দম্ভ তাঁহাদের ছিল না; তাঁহারা সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে বিনীতভাবে আত্মীয় হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে যে মিশনরী সম্প্রদায়ের কল্যাণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাঁহারা বিপরীত মনোভাব লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন; ধর্ম্মহীনকে ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রচারের প্রয়োজন আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়াছে, শাপে বর হইয়াছে। ইঁহাদের নামও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবার কালে আমরা যেন তাঁহাদের পূর্ব্বগামীদের অপরূপ সহৃদয়তা ও মহাপ্রাণতার কথা বিস্মৃত না হই।

বঙ্গদেশে অবস্থানকালে উইলকিন্স প্রাচ্য ভাষায় গ্রন্থমুদ্রণ-সমস্যা দূর করিতে চেষ্টিত হন, ফলে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা হরফ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য নাগরী হরফও প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি যে ফার্সী হরফ তৈয়ারী করেন, তাহা অনেক পরে ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উইলকিন্সকে ভারতের ক্যাক্সটন বলিলে অন্যায় হইবে না।

সার্ উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরূপে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসেন। উইলকিন্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল পরে আবার প্রাচ্য ভাষার চর্চ্চা সুরু করেন। উইলকিন্স এই সময়ে মনুস্মৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম চার অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। জোন্স উৎসাহিত হইয়া মনু-অনুবাদের ভার নিজে লইতে চাহেন, উইলকিন্স আশ্চর্য্য উদারতার সহিত স্বকৃত অনুবাদ সহ অনুবাদের দায়িত্ব জোন্সকে অর্পণ করেন। ইহার ফলেই জোন্সের *Institutes of Hindu Law*। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করেন।

দীর্ঘ ১৬ বৎসর কাল এদেশে থাকিয়া উইলকিন্সের স্বাস্থ্যহানি ঘটে; তিনি স্বাস্থ্য-কামনায় ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও বাথে (Bath) অবস্থান করেন। এখান হইতেই ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Fables of Pilpay বা সংস্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরে তিনি কেন্টে একটি বাড়ী খরিদ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অগ্নিদাহে এই গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহাতে তাঁহার পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের আংশিক ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বহস্তনির্ম্মিত হরফ, পাঞ্চ ও ম্যাট্রিক্সগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে উইলকিন্স ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এই কাজেই নিয়োজিত ছিলেন। ১৮০৫ সালে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের জন্য হেলিবেরিতে

কলেজ স্থাপিত হইলে উইলকিন্স তাহার প্রাচ্য বিভাগের দর্শক নিযুক্ত হন। এই সময়ের মধ্যে (১৮০০-৩৬) তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সঙ্কলন বা সম্পাদন করিয়াছিলেন—

Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. I, 1806.
Richardson's *Persian, Arabic and English Dictionary*, new edition Vol. II, 1810.
Sanskrit Grammar, 1808
Radicals of the Sanskrit Language,* 1815
Dushmanta and *Sakoontala* (Dalrymple's Oriental Repertory).
Translation of the *Mahabharata* (A portion, in the Annals of Oriental Literature)

এতদ্ব্যতীত *Asiatick Researches*-এর কয়েক সংখ্যায় তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

উইলকিন্স রয়াল সোসাইটির ফেলো হইয়াছিলেন। ইনষ্টিটিউট অব ফ্রান্সও তাঁহাকে এক জন "ফরেন অ্যাসোসিয়েট" নির্ব্বাচিত করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইটহুড প্রাপ্ত হন।

চার্লস উইলকিন্স সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃততর বিবরণ চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধ পড়িতে বলি—

(1) *The Library of the India Office* by A. J. Arberry (1938), pp. 13-56
(2) *The Asiatic Journal* for July, 1836, pp. 165-70 "Sir Charles Wilkins"

এই প্রবন্ধে রচয়িতার নাম না থাকিলেও ইহা বিখ্যাত প্রাচ্য-ভাষাবিৎ স্যর্ গ্রেভস চার্নি হটনের রচনা বলিয়া জানা যায়।

জন টমাস

"খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালাপদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালাগদ্যরচনা সম্যক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।"—রামগতি ন্যায়রত্ন, 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব,' ১ম সংস্করণ, সংবৎ ১৯৩০, পৃ. ২০২।

এই সাহেবদিগের অগ্রণী ছিলেন জন টমাস। ইনিই বঙ্গদেশে প্রথম ব্যাপটিষ্ট পাদরি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পোর্ত্তুগীজ রোমান কাথলিকদের ধর্ম্ম-প্রচারের উৎসাহে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব্বেই পোর্ত্তুগীজ প্রভাব সম্পূর্ণ হ্রাস পাইয়াছিল, বর্ব্বর 'নেটিব'-দিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য নূতন কোন পাদরি-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে নাই। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ ট্রাঙ্কেবার মিশনের ডেনিশ পাদরি

* A fragment of a Sanskrit vocabulary by Wilkins is preserved in MSS. Eur. D. 130 (India office).

কিয়ারনাণ্ডারকে বাংলা দেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্ম আনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিয়ারনাণ্ডারের সহিত দেশীয় সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিশেষ যোগ ছিল না, তিনি মূলতঃ পোর্ত্তুগীজ, আর্মেনিয়ান ও ফিরিঙ্গিদের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিতরণ করিতেন। কলিকাতা মিশন স্কুল ও মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা কিয়ারনাণ্ডার যদিও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, ধর্ম্মযাজক হিসাবে জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, তিনি ব্যক্তিগত নানা দৌর্ব্বল্যদোষে চরম দারিদ্র্যদশায় পতিত হন ও নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেলে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

এই সময়ে কলিকাতায় চার্লস গ্রাণ্টের বিশেষ প্রতিপত্তি। তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক বিভাগে চাকুরি লইয়া সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন, কিন্তু শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পুনরায় ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেঙ্গল এষ্টাব্লিশমেণ্টের এক জন রাইটাররূপে বাংলা দেশে আসেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান হন। পর পর কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় এই প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির শোকার্ত্ত মন ধর্ম্মের আশ্রয়ের জন্ম লালায়িত হইয়া উঠে, কলিকাতার ইংরেজ-সমাজে খ্রীষ্টমহিমা প্রতিষ্ঠার জন্ম তিনি চেষ্টিত হন। দেনার দায়ে যখন কিয়ারনাণ্ডারের সম্পত্তি নিলামে উঠে, চার্লস গ্রাণ্ট দশ হাজার টাকা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। গ্রাণ্টের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী, শাশুড়ী মিসেস্ ফ্রেজার ও ভগিনী থাকিতেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে তখন চেম্বার্স ভ্রাতৃদ্বয়ের (উইলিয়ম ও রবার্ট) বিশেষ প্রতিপত্তি। উইলিয়ম চেম্বার্স গ্রাণ্টের ভগিনীকে বিবাহ করেন। ডেবিড ব্রাউন ও জর্জ উড্নি প্রভৃতিও এই গ্রাণ্ট-গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাণ্ট কোম্পানীর মালদহের কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। গ্রাণ্ট যখন মালদহ হইতে পুনরায় কলিকাতায় আসেন তখন জর্জ উড্নিকে তাঁহার পদে বাহাল করা হয়। এই জর্জ উড্নির সহিত বাংলা সাহিত্যের পরোক্ষ যোগ আছে। তাঁহারই চেষ্টায় জন টমাস ও উইলিয়ম কেরী পরে যথাক্রমে মহীপালদীঘি ও মদনাবতীর কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

গ্রাণ্টের ভগিনীপতি উইলিয়ম চেম্বার্স সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী ইণ্টারপ্রিটার বা দোভাষী ছিলেন, ফার্সী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যলেখক রামরাম বসু উইলিয়ম চেম্বার্সের মুন্শী ছিলেন। চেম্বার্স নিউ টেষ্টামেণ্টের ফার্সী অনুবাদ করিতে মনস্থ করেন। কথা ছিল, রামরাম বসু ফার্সী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবেন। চেম্বার্সের মতলব কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দীর্ঘ সাত বৎসরের চেষ্টায় সেণ্ট ম্যাথুর ১৩ অধ্যায় মাত্র অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের কিয়দংশ গ্ল্যাডউইনের 'পার্সিয়ান মুন্শী' পুস্তকের শেষে মুদ্রিত হইয়াছিল।

জন টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে পদার্পণ করেন। ইংলণ্ডের গ্লষ্টারশায়ারে

ফেয়ারফোর্ডে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে আছে—

My father is deacon of a Baptist Church at *Fairford*, in *Cloucestershire* He trained me up in the nurture and admonition of the Lord, but I proved for a long time a hopeless child Very sharp convictions were often felt and repeatedly stifled till it pleased God to make my sins a heavy burden to me, in the year 1781 I had lately married and my nights and days were dreadful both to me and my wife At the time mentioned I was settled in Great Newport-street, in the practice of Surgery and Midwifery but finding the world more ready to receive credit than give it, I was obliged to sell all, and wait in lodgings, till an offer was made me of going to sea and in the year 1783, I sailed in capacity of *Surgeon* of the *Oxford* Indiaman to Bengal On my arrival at Calcutta, I sought for religious people, but found none

ধর্ম্ম ও নীতি-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া কলিকাতার ইংরেজ সমাজ তখন সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত, স্ত্রীলোক, ডুয়েল, মদ ও জুয়ার মোহে তাঁহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য; দেনার দায়ে দেশীয় পোদ্দার ও ধনীদের নিকট তাঁহাদের টিকি বাঁধা। ফলে তাঁহারা কালীঘাটে পূজা দিতেছেন ও হিন্দু পূজাপার্ব্বণে অবাধে যোগদান করিতেছেন। ভগবান ও ডেভিলের নাম একই নিশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া কথায় কথায় বাজি রাখিতে ও কটূক্তি করিতে তাঁহারা দ্বিধা করেন না। মর্ম্মাহত টমাস ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করিলেন—

RELIGIOUS SOCIETY

"A plan is now forming for the more effectually spreading the knowledge of Jesus Christ, and His glorious Gospel, in and about *Bengal* any serious persons of any denomination, rich or poor, high or low, who would heartily approve of, join in, or gladly forward such an undertaking, are hereby invited to give a small testimony of their inclination, that they may enjoy the satisfaction of forming a communion, the most useful, the most comfortable, and the most exalted, in the world Direct for A B. C. to be left with the Editor"

পরদিন টমাস এই বিজ্ঞাপনের দুইটি জবাব পান। একটির লেখক কলিকাতা প্রেসিডেন্সী চার্চের তৎকালীন চ্যাপলেন রেভারেণ্ড ডব্লিউ জনসন, অপরটি বেনামী। পরে জানা যায় উইলিয়াম চেম্বার্স ইহা লিখিয়াছিলেন। চেম্বার্সের জবাবটি এইরূপ—

"If A B C will open a subscription for a translation of the New Testament into the *Persian* and *Moorish languages* (under the direction of proper persons), he will meet with every assistance he can desire, and a competent number of subscribers to defray the expense"

প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের বীজ তখনই উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ-যোগেই টমাস স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি মালদহের রেসিডেণ্ট চার্লস গ্রাণ্টের অসাধারণ ধর্ম্মপ্রীতির কথা শুনিয়া যান। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ আর্ল অব অক্সফোর্ড জাহাজ পুনরায় ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হয়, টমাস সেই জাহাজেই ফিরিয়া আসেন ও ১৪ই জুলাই

তারিখে বাংলা দেশে পৌছান। অক্সফোর্ড জাহাজের চাকুরি তিনি তখনও ছাড়েন নাই। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি 'A Word of Comfort and Encouragement to the Poor Afflicted People of God' নামক একটি পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। সেই বৎসরেই কিয়ারনাণ্ডারের সম্পূর্ণ পতন হইয়াছে, রেভারেণ্ড ডেবিড ব্রাউন কলিকাতা অরফ্যান স্কুলের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। টমাস এই সময়েই জর্জ উডনি, উইলিয়াম চেম্বার্স প্রভৃতি গ্রাণ্টের ধর্ম্মপ্রাণ আত্মীয়দের সহিত পরিচিত হন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ডেবিড ব্রাউনের যাজকতা শুনিতে যাইতেন এবং মাঝে মাঝে নিজেরাও উপাসনা করিতে বসিতেন। ঠিক এই সময়ে চার্লস গ্রাণ্ট মালদহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসাতে ইঁহাদের শক্তি ও দল বৃদ্ধি হয়। গ্রাণ্টের বাড়ীতেই প্রত্যহ সন্ধ্যায় ইঁহারা মিলিত হইতেন। চার্লস গ্রাণ্ট টমাসকে জাহাজের চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে বসবাস করিতে এবং বাংলা ভাষা শিখিয়া হিন্দুদের মধ্যে 'গসপেল' প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এ-দেশের জলবায়ু টমাসের মোটেই সহ্য হইত না, তাছাড়া জাহাজের কাজ পরিত্যাগ করারও বাধা ছিল। তথাপি তিনি কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের চিন্তায় তিন চার সপ্তাহ নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অক্সফোর্ড জাহাজের চিকিৎসকের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানের কাজে আত্মসমর্পণ করিলেন।* ডাক্তার জন টমাস পাদ্রি টমাস হইলেন।

টমাস ও রামরাম বসু

নূতন কাজের গোড়াতেই টমাস বাংলা ভাষা এবং দেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। সাধারণ লোকের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার শেখাও আবশ্যক হইল। কিন্তু ভাষার বাধাই প্রধান। চার্লস গ্রাণ্ট ঠিক করিলেন, কিছু পরিমাণ ভাষা শিখিয়াই টমাস মালদহে কালা আদ্‌মিদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য চালাইবেন।† হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ এক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া টমাস শিক্ষা সুরু করিলেন। কিন্তু কাজ কিছুই অগ্রসর হইল না। টমাস বুঝিতে পারিলেন, গুরু ছাড়া ভাষা শিক্ষা অসম্ভব। তিনি চার্লস গ্রাণ্টকে জানাইলেন। গ্রাণ্ট ভগিনীপতি উইলিয়ম

* ". . after a few weeks I became greatly concerned at heart for the condition of these perishing multitude of Pagans in the darkness, and was inflamed with fervent desires to go and declare the glory of Christ among them. Waters enough have risen since to damp, but will never utterly extinguish what was lighted up at that time. After much prayer and many tears, I gave myself up to this work, and the Lord removed difficulties out of the way.. . " *Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society*, Vol. I p. 18.

† ". . . to teach to the black fellows at Malda " *The Life of John Thomas* by C. B. Lewis. p. 64.

চেম্বার্সের শরণাপন্ন হইলেন। চেম্বার্সের কাছে থাকিয়া তাঁহার মুন্সী রামরাম বসু তত দিনে ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু লিখিতে পড়িতে শিখেন নাই। মৎকার্য্য উদ্দেশ্যে চেম্বার্স নিজের মুন্সীকেই দান করিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে জন টমাস ও রামরাম বসুর যোগাযোগ ঘটিল। আধুনিক বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিপত্তন হইল।†

কলিকাতায় তিন মাস মুন্সী রামরাম বসুর নিকট বাংলা ভাষা ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গুরুশিষ্য উভয়েই মালদহ পৌঁছিলেন। চার্লস গ্রাণ্টের স্থলে জর্জ উড্‌নি তখন মালদহ কুঠির কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। টমাস ও মুন্সী উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহে বসবাস করিতে লাগিলেন। বৎসর কালের মধ্যে টমাস বাংলা যাহা শিখিলেন, তাহার একটিমাত্র পংক্তির নমুনা আমরা পাইয়াছি—

> গোনার মাহিনা মির্ত্তু কিন্তু খোদার দিয়া চির প্রমাই জিজচ ক্রাইষ্ট হইতে। এই মির্ত্তু এখন অবধ, তখন [এপ্রিল, ১৭৮৮ †

টমাস অবশ্য এই কালের মধ্যে রামরাম বসুর সাহায্যে ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স প্রভৃতির গস্‌পেল বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; পরবর্ত্তী কালের কেরীর অনুবাদের মধ্যে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন চিনিয়া বাহির করিবার উপায় নাই।

এ দেশের শাস্ত্র ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে টমাস যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

> "There are four *Shasters*, or laws, among the Hindus, which they call the Vedas, these they hold in the highest esteem, and say it is unlawful for any man to read or hear them read, except he is a *Bramin*. The Vedas are said to have been written many millions of years ago, which however, is easily disproved by other books and writings in use among themselves. These Vedas are written in *Sanscrit*, which may be called the Latin of the East, and they are the fountain of all their books of theology, as the Koran among the Moors, and the Bible among us. There are eighteen sacred books called *Poorans*, which are all commentaries on the Vedas and it is the custom of all the *Bramins* to learn a great part of these by heart and they are very apt and clever in quoting portions of them in conversation this they find the more easy to them, as all their books are written in verse . Some of these books hold up for their veneration characters which are very profligate, and contain dreadful doctrines, evidently of an infernal origin, which have a strange effect on their minds and manners . But I can truly say, whenever I have been conversing or preaching among them I have invariably found them willing to hear, and that they always behave with great decency and respect I trust also that the door of faith is opened to the Hindoos . "
>
> —Rippon's Baptist Register, No. V.

বাংলা ভাষা শিক্ষা এবং হিন্দুজাতি সম্পর্কে অন্যত্র টমাস বলিতেছেন—

> "As to the learning of the language, it is a work attended with difficulties, but when the whole time is devoted to it, three or four months will bring a man through the

* "Now the wages of sin is death But the gift of God is eternal life through Jesus Christ Our Lord."



উইলিয়ম কেরী

greatest of them; and he will begin to converse with the natives, with great amusement and pleasure to himself, and profit to them. And as to the barbarity of these people, it is not with them as it is with other Pagans, of whom we have read and heard for the Hindoos are certainly distinguished from all people on the face of the earth, for their harmless and inoffensive behaviour, and the province of *Bengal*, and its inhabitants, are proverbially distinguished from all other parts of *India*, for their gentleness of manners, and harmless behaviour to their enemies, as well as their friends. I have known among them, men of considerable power and authority who were highly offended with me, because they imagined my work affected their interests but I lived within a mile of them, in a lonely house, with my windows and doors wide open all night, without a sword or fire-arms, and free from the smallest apprehension of danger"

—Periodical Accounts, Vol. I p. 31.

কিন্তু টমাসের মনে ধর্মপ্রচারের উৎসাহ ও উত্তেজনা যতখানিই থাকুক, কাজে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার মুন্‌শী রামরাম বসু ও পার্ব্বতী নামীয় এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্ম্মোন্মাদনার সুযোগ লইয়া তাঁহাকে নানা মিথ্যা আশ্বাস দিয়া মোহন করিতে থাকেন ; দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তিনি এক জন হিন্দুকেও ধর্ম্ম বা জাতিচ্যুত করিতে সক্ষম হন নাই। এই পাঁচ বৎসরে রামরাম বসুর সহিত তাঁহার সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র (দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—৩) ভূমিকায় দেওয়া আছে। ভগ্নহৃদয় টমাস ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মালদহ পরিত্যাগ করিয়া "হিন্দু অক্সফোর্ড" নবদ্বীপ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

টমাসের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন

এই দীর্ঘকাল চার্লস গ্রাণ্ট তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম কত দূর বিস্তৃত হইল ইহা জানিতে চাহিয়া গ্রাণ্ট মাঝে মাঝে তাঁহাকে তাগাদা করিতেন ; টমাস নানা স্তোকবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নিজের মনেও বরাবর বিশ্বাস ছিল তিনি অন্ততঃ রামরাম বসু ও পার্ব্বতীকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে পারিবেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বাস ভাঙিয়া যায়। তা ছাড়া ধর্ম্মভাব তাঁহার যতই থাকুক তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল চরিত্রের লোক ছিলেন ; আয়ের অধিক ব্যয় করিতেন, এবং মাঝে মাঝে প্রলোভনে পড়িয়া জুয়া খেলিতেন। তাহাতে তিনি বারবার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উড্‌নি সাহেব কয়েক বার তাঁহাকে রক্ষা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চার্লস গ্রাণ্ট টমাস-চরিত্রের এই দুর্ব্বলতার কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করেন। উড্‌নি টমাসকে চাপ দিতে থাকেন। ঋণগ্রস্ত এবং লাঞ্ছিত টমাস অক্টোবর হইতে ১০ই ডিসেম্বর (১৭৯১) পর্য্যন্ত নবদ্বীপে থাকিয়া পদ্মলোচন পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধের পাঠ অসমাপ্ত রাখিয়াই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে টমাস তাঁহার পিতার নিকট এক পত্রে লেখেন "ম্যাথু এবং মার্কের বাংলা অনুবাদ শেষ করিয়াছি।" ঐ বৎসরের

সেপ্টেম্বর মাসে টমাস তাঁহার অনুবাদ সহ কৃষ্ণনগরে সার্ উইলিয়ম জোন্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে রামরাম বসু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। জোন্স টমাসকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং অনুবাদ মুদ্রিত হইলে ৪৮০ টাকায় ত্রিশ কপির গ্রাহক হইতে রাজী হইয়াছিলেন। টমাস সার্ উইলিয়মকে তাঁহার অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দিয়া এই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, তিনি যেন লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট অনুবাদের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে একটু সুপারিশ করেন। সার্ উইলিয়ম তখন বাংলা ভাষায় তাঁহার অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। টমাস ইহাতে না দমিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ অনুবাদের এক অনুষ্ঠানপত্র ছাপাইয়া বিলি করেন। টমাসের জর্ণাল হইতে জানা যায়—

The projected work was "to consist of seven parts (1) Promises and Prophecies, (2) Matthew, (3) Mark, (4) Texts and Precepts of the New Testament, for Newness of Life, (5) The Ten Commandments, and a dissertation on Scripture in general, (6) An explanation of the three first chapters of Matthew (7) A Glossary" The Price of the book was to be a gold mohur or Rs 16 per copy, to Europeans, and the natives were to receive it gratis

টমাসের এই স্বপ্ন এই যাত্রায় সফল হয় নাই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

THE PARTICULAR BAPTIST SOCIETY FOR PROPAGATING THE GOSPEL AMONGST THE HEATHEN

উপরি-উক্ত সমিতির সম্ভাবনার কথা উইলিয়ম কেরী নামক এক জন তন্তুবায়-পুত্রের মনে সর্ব্বপ্রথম উদিত হয়। তাঁহার বিরাট্ জীবন ও কীর্ত্তি আমাদের স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয় হইলেও টমাসের কাহিনী অনুসরণ করিয়া এখানেই তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইতেছে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুলটনে আসিয়া বসবাস করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মনে হিদেনদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের বাসনা জাগে। এখানেই তিনি "An Enquiry into the Obligations of Christians to use means for the conversion of the Heathen" নামক বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন—এই পুস্তক ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়। এই উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিয়া তিনি বহুকাল যাবৎ নানা ভৌগোলিক জ্ঞান সঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার বাসনা উত্তরোত্তর প্রবল হইতে থাকে এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ক্লিপষ্টোনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় সাট্‌ক্লিফ ও ফুলারের উপস্থিতিতে কেরী প্রশ্ন করেন, "হিদেন-জগতে গসপেল প্রচার সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হইলে তাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিনা।" ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে তারিখে নটিংহামে এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য পুনরায় সভা আহূত হয়। কেরী বক্তৃতা করেন; দুটি বিষয়ের তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেন

(১) That we should expect great things ও (২) that we should *attempt* great things বক্তৃতার শেষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—"That a plan be prepred against the next ministers' meeting at *Kettering* for forming a society among the Baptists for propagating the Gospel among the

Heathen"। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেটারিঙের এই ঐতিহাসিক সভা বসে। সভায় সমিতি-গঠনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন—John Ryland, Reynold Hogg, John Sutcliffe, A. Fuller, W. Carey, Abraham Greenwood, Edward Sharman, Joshua Burton, Samuel Pearce, Thomas Blundell, Wm. Heighton, John Eayres, ও Joseph Timms। রাইলাণ্ড, হগ, কেরী, সাটক্লিফ ও ফুলারের উপর সমিতি এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধনের অনুমতি দিয়া রাখেন। এই সভাই ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সমিতির প্রথম সভা। দ্বিতীয় সভা বসে ১৭৯২, ৩১শে অক্টোবর। ১৩ই নবেম্বর নরদামটনের প্রাইমারি সমিতির সভায় কেরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। একটি পত্রে তিনি সমিতিকে বঙ্গদেশীয় মিশনরী জন টমাসের কথা জানান। টমাসের সহিত তাঁহার ইতিমধ্যেই পরিচয় হইয়াছিল এবং টমাস তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম বাংলা দেশে তাঁহাদের প্রচারকার্য্য চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। টমাস বলেন, তিনি নিজেও বাংলা দেশে প্রচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য লণ্ডনে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন; এক জন সঙ্গী পাইলে তিনি বাংলা দেশে প্রচারের ভার লইতে রাজি আছেন। কেরীর পত্রের শেষে ছিল—

"The reason for my writing is a thought, that his fund for *Bengal* may interfere with our larger plan, and whether it would not be worthy of the Society, to try to make that and ours unite into one fund, for the purpose of sending the Gospel to the Heathen indefinitely."

কেরীর পত্র পঠিত হইলে সমিতি জন টমাস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। সমিতির সম্পাদকের উপর এই বিষয়ের ভার অর্পিত হয়। টমাসকে তাঁহার নিজের জীবন ও বাংলা দেশে তাঁহার কীর্ত্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী দাখিল করিতে বলা হয়। তাহাতে সমস্ত ব্যাপার বিশদ ভাবে বিবৃত করিয়া সর্ব্বশেষে টমাস লেখেন—

'In the year 1787, I began to learn to speak and write the *Bengalee* Till the month of June or July of this year, I was engaged at Calcutta, and preached to a few Europeans there. In 1788, I could *converse* freely with the natives, especially with those I was well acquainted with In 1789, I began to find that my pronunciation was generally very defective, and consequently my preaching, for the most part, could not be understood· I had also begun to translate I remained there the second time, from the middle of 1786, till the end of 1791, but had no thoughts of staying there till about the beginning of 1787, nor did I sit down to the work till about the middle of that year· so all the time spent among them was five years and a half,. Considering this, and the difficulties that must necessarily occur to the first adventurer, (for they have no dictionary, vocabulary, nor printed books to assist one, as in European countries), I say, considering these things, the time may be reckoned but two or three years, and I doubt not but a person of a moderate capacity, may attain, in that time, as much knowledge of the language as I have; and I can now express myself in *prayer*, *preaching* and conversation comfortably to myself, and so as to be understood by others."

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কেটারিঙে সমিতির অধিবেশনে 'টমাস-অনুসন্ধানের' ফল বিবৃত হইল; সমিতি ইহা সন্তোষজনক বিবেচনা করাতে মিঃ টমাসকে সমিতির পক্ষে

বাংলা দেশে প্রচারকার্য্য পরিচালনের অনুরোধ জ্ঞাপন করার প্রস্তাব হইল। টমাস যদি রাজি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী কে হইবেন, পূর্ব্বাহ্নেই তাহা স্থির করিবার কথা উঠিল। উইলিয়ম কেরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জন টমাসের সহকর্মীরূপে নিজের নাম প্রস্তাব করিলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে টমাস স্বয়ং কেটারিঙে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রামরাম বসু ও পার্ব্বতী ব্রাহ্মণ টমাসের হাতে রেভারেণ্ড 'এস'-এর নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন সমিতি হইতে এই মর্শ্মে তাহার জবাব লেখা হইল যে, ভগবান্ হিন্দুদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন; তাঁহার দুই জন সেবক সেই দেশে তাঁহার বাণী প্রচারার্থ যাইতেছেন। রামরাম বসু, পার্ব্বতী ও তাঁহাদের বন্ধুগণ যেন অবিলম্বে ব্যাপটাইজড হইয়া খ্রীষ্টের শরণাপন্ন হন।

এই পত্র এবং প্রভূত আশা লইয়া উইলিয়ম কেরী সপরিবারে এবং টমাস একাকী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-(Kron Princesse Marie) যোগে বঙ্গদেশ যাত্রা করিলেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর তারিখে কেরী ও টমাস কলিকাতায় পৌঁছিলেন; রামরাম বসু তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। টমাসের আরব্ধ কার্য্য কেরী নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে মৃত্যু পর্য্যন্ত জন টমাস কেরীর ছায়া-স্বরূপ জীবিত ছিলেন; কেরীর প্রসঙ্গে তাঁহারও অবশিষ্ট জীবন আলোচিত হইবে। টমাস শেষ-জীবনে উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন। তবে তিনি অসুস্থতা ও অশান্তির মধ্যে এইটুকু সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশে ব্যাপটিষ্ট মিশনের পক্ষে প্রথম বাঙালী ধর্ম্মান্তরগ্রহণকারী কৃষ্ণ পাল তাঁহারই প্ররোচনায় খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ওয়ার্ড, জোশুয়া মার্শম্যান, ব্রান্সডন ও গ্রাণ্টের আগমন ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৪৫

ভেল-সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি-লিট্

অগদ-তন্ত্র ও শল্যতন্ত্র, প্রধানতঃ এই দুই ধারায় আয়ুর্বেদ বা ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। এই দ্বিবিধ ধারায় যে সকল সংহিতা প্রণীত হইয়াছে, উহাদের অবদানে দুইজন প্রাচীন ঋষি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যথা—অগদ-তন্ত্রের অবদানে পুনর্বসু আত্রেয় এবং শল্য-তন্ত্রের অবদানে ধন্বন্তরি। অগ্নিবেশ, ভেল বা ভেড, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি, ভগবান পুনর্বসু আত্রেয়ের এই ছয় জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিষ্যের প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধি আছে। এই ছয় প্রাচীন সংহিতার কোনটিই সম্পূর্ণ এবং অবিকলভাবে এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। দৃঢবল-সংশোধিত চরক-সংহিতার মধ্যে অগ্নিবেশ-সংহিতা লীন হইয়াছে অথবা আত্মগোপন করিয়া আছে। অগ্নিবেশ-সংহিতার পৃথক্ অস্তিত্ব কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সংহিতা আবিষ্কৃত হইলে আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতাম, ঠিক কোন্ ভিত্তির উপর চরকের প্রতিসংস্কর্তা দৃঢবল তাঁহার সংহিতা-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জতুকর্ণাদি চারি সংহিতা সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে বলিলেও চলে। ছয় সংহিতার মধ্যে মাত্র ভেল-সংহিতারই এক পুথি তাঞ্জোর প্যালেস লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ছিল (বর্ণেল, ক্যাটালগ, নং ১০৭৭৩), এবং উহারই সাহায্যে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইং ১৯২১ সালে পরলোকগত স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় উক্ত সংহিতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। উক্ত ছয় সংহিতাই যে প্রচলিত চরক ও সুশ্রুতসংহিতার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহা বাগ্‌ভটের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে প্রমাণ করা চলে :—

> "ঋষি-প্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরক-সুশ্রুতম্,
> ভেড়াদ্যাঃ কিং ন পঠ্যন্তে, তস্মাদ্ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্ ॥
>
> [অষ্টাঙ্গ-হৃদয়, উত্তরস্থান, অঃ ৪০, শ্লোঃ ৮৫]

ভেল-সংহিতার মুদ্রিত সংস্করণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহার সূত্রস্থানের প্রথম তিন অধ্যায় এবং সিদ্ধিস্থানের কতিপয় অংশ বাদে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ আকারেই আছে। আউফ্রেক্টকৃত ক্যাটালোগাস্ ক্যাটালোগোরামে উল্লিখিত ৪১৬ নম্বরভুক্ত অপর পুথিপাঠের সাহায্যে অপ্রাপ্ত অধ্যায় এবং অংশগুলিরও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে। কথিত

উপায়ে সংহিতার সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিতে পারিলেও, সর্ব্বাংশে ইহার মূল পাঠোদ্ধার করা দুঃসাধ্য। মুদ্রিত সংস্করণে আমরা যে আকারে সংহিতাটি পাইতেছি, উহাতে মাত্র শরীর-স্থানেরই ৪র্থ হইতে ৮ম, এই পাঁচ অধ্যায় মধ্যে মধ্যে পদ্য-সন্নিবিষ্ট গদ্যে, এবং অবশিষ্ট অংশ সর্ব্বত্রই পদ্যে। গদ্যাংশ পদ্যে পরিণত হওয়ায় সংহিতা, বহু অংশে ইহার মূল পাঠ ও ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হারাইয়াছে। অদ্যাপি যে কয়টি অধ্যায় গদ্যে আত্মরক্ষা করিয়া আছে, উহারা পদ্য-নদীতে দ্বীপের ন্যায় বিরাজমান। বস্তুতঃ এই গদ্যাংশগুলিই সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব প্রমাণ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। শঙ্খ-লিখিতাদি কতিপয় স্মৃতিসংহিতার মধ্যেও পদ্য-রাক্ষসী গদ্য মূল হজম করিয়া গ্রন্থগুলির প্রাচীনত্বের নিদর্শন লুপ্ত করিয়াছে। প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে অধুনা ভেল-সংহিতার তেমন কোন বিশেষত্ব বা প্রয়োজন নাই। চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা অথবা অষ্টাঙ্গ-হৃদয়ের তুলনায় ভেল-সংহিতা যেন সূর্য্য অথবা চন্দ্রের নিকট সামান্য খদ্যোত, অথচ ইহার ঐতিহাসিক বিশেষত্ব যথেষ্ট। ভেল-সংহিতা, বিশেষতঃ ইহার গদ্যাংশ হইতে সহজে অনুমান করা যায়, পুরাতন কোন্ স্তর হইতে আয়ুর্ব্বেদ চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছে।

চরকের অন্তর্গত অগ্নিবেশ-সংহিতার ন্যায় ভেল-সংহিতাও যে পুনর্বসু অথবা ভগবান্ আত্রেয়-সম্প্রদায়ের অন্যতম আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ, তাহা সংহিতাই নিজে প্রমাণ করে। কারণ, এই সংহিতায় আত্রেয়-বচনই বেদবাক্য, আত্রেয়-মতই প্রতিপাদ্য বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। "ইত্যাহ ভগবান্ আত্রেয়ঃ", "নেত্যাহ ভগবান্ পুনর্বসুরাত্রেয়ঃ", ইত্যাকার উক্তি হইতে উক্ত বিষয়ে অপর সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে?

এখন প্রশ্ন হইতেছে—গদ্য অথবা পদ্য-সন্নিবিষ্ট গদ্য ভেল-সংহিতার রচনাকাল কত প্রাচীন হইতে পারে এবং তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায়ও বা কি আছে? প্রথমতঃ, ইহার গদ্যাংশের রচনারীতি অনেকাংশে অর্থশাস্ত্র, কামসূত্র, প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র ও পালি অভিধর্ম্ম পিটকের অনুরূপ। উপমাস্থলে:

"তত্রাহ কথং গর্ভো মাতুরুদরে তিষ্ঠতীতি? ঊর্দ্ধ্বমিতি শৌনকঃ। অবাক্শিরা ইতি ভরদ্বাজঃ। নেত্যাহ ভগবান্ পুনর্বসুরাত্রেয়। যদ্যূর্দ্ধ্বং তিষ্ঠেৎ তর্হি মাতৃমা(রঃ) স্যাৎ। যদ্যবাক্শিরা, তদা স্বমা(রঃ) স্যাৎ" (ভেঃ-সং, পৃঃ ৮৫)।

দ্বিতীয়তঃ, আত্মার দেহান্তর-উপক্রম বিষয়ে দেখিতে পাই, ভেল-সংহিতা বৃহদারণ্যক-উপনিষদুক্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতই খণ্ডন করিতে গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,

"যেমন তৃণ-জলৌকা তৃণাগ্রে গিয়া অপর এক তৃণের প্রতি অগ্রসর হইয়া নিজেকে গুটাইয়া পূর্ব্বতৃণ হইতে পরতৃণে গমন করে, তেমন আত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অবিদ্যা দূর করিয়া, অপর দেহের প্রতি অগ্রসর হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে।"

"তদ্যথা তৃণ-জলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমং আক্রম্যাত্মানং উপসংহরত্যেবমেবায়ম্ আত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যম্ আক্রমম্ আক্রম্যাত্মানম্ উপসংহরতি।"

[বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ, ৪-৪-৩]

উক্ত উপমার সাহায্যে অপর কোথাও আত্মার সংক্রমণ বা দেহান্তর-গমন বর্ণিত হয় নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপমা হইতেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

[ভগবদ্গীতা, ২-২২]

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করে।"

এই শেষোক্ত জাতীয় একাধিক উপমা পালি জাতক, পেতবত্থু, দীঘ-নিকায় ও মজ্ঝিম-নিকায়ে দৃষ্ট হয়, যথা :—

(১) উরগ-জাতক ও উরগ-পেতবত্থুতে—

"উরগো ব তচং জিন্নং, হিত্বা গচ্ছতি সন্তনুং।
এবং শরীরে নিব্ভোগে পেতে কালকতে সতি॥"

"উরগ যেমন জীর্ণ ত্বক পরিত্যাগ করিয়া নব রূপ গ্রহণ করে, তেমন দেহ-বিনাশে, মৃত্যু হইলে পর (সত্ত্ব নব দেহ গ্রহণ করে)।"

(২) নন্দিকাপেতবত্থুতে, দীঘ-নিকায়ের সামঞ্ঞফল এবং মজ্ঝিম-নিকায়ের মহা-অস্সপুরসুত্তে :—

"যথা গামতো নিক্খম্ম অঞ্ঞং গামং পবিসতি।
এবমেবম্পি সো জীবো অঞ্ঞং কায়ং পবিসতি॥
যথা গামতো নিক্খম্ম অঞ্ঞং গেহং পবিসতি।
এবমেবম্পি সো জীবো অঞ্ঞং বোন্দিং পবিসতি॥"

"যেমন কেহ গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য গ্রামে অথবা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করে, তেমন জীব (দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া) অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়।"[১]

এই সকল উপমা হইতে বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপমা প্রাচীনতর, এবং উপনিষদের উপমারই যুক্তি-খণ্ডন ভেল-সংহিতার গদ্যাংশে আছে :

"অথ প্রশ্নো ভবতি : কথময়ং দেহো দেহান্তরম্ উপক্রমত ইতি? অত্রোবাচ ভগবান্ আত্রেয়ঃ : জলুকায়া ইবাস্য কেচিদ্ গতিং ব্রুবতে। তন্ন যুক্তম্ ইতানীতিনাত্যন্তামূর্তত্বং যুগপৎ স্যাদেব" (ভেঃ সং, পৃ ৯৩)।

"অনন্তর প্রশ্ন হইতেছে : কিরূপে এই দেহী দেহান্তর গমন করে? এ বিষয়ে ভগবান্ আত্রেয় বলিতেছেন : কেহ কেহ বলেন যে, (তৃণ)জলৌকার তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমনের ন্যায়ই দেহীর দেহান্তর-গমন হইয়া থাকে। দেহীর ইহ হইতে পরলোক-গমনবিষয়ক এই উপমা যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু অত্যন্ত অমূর্ত হওয়ায় আত্মার পক্ষে যুগপৎ দেহ পরিত্যাগ ও দেহান্তর-গ্রহণ হইতে পারে।"

১। শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা-প্রণীত *The Buddhist Conception of Spirits* পৃ ৩ দ্রঃ। দীঘ ও মজ্ঝিম-নিকায়ের উপমা : "সেয়্যথা পুরিসো সকম্হা গামা অঞ্ঞং গামং গচ্ছেয্য, তম্হা পি গামা অঞ্ঞম্পি গামং গচ্ছেয্য, সো তম্হা গামা সকং যেব গামং পচ্চাগচ্ছেয্য, ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ, কতিপয় পরিভাষা ও দার্শনিক মতের সৌসাদৃশ্য হইতে বিচার করিলে ভেল সংহিতা ও পালি পঞ্চনিকায় একই সময়ের রচনা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

(১) পরিভাষার সৌসাদৃশ্য পালি নিকায় ও জৈন আগমের প্রমাণে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উদ্ভবকালে নিকায়, জাতি বা বর্ণ অর্থে কায় শব্দের প্রচলন হয়। ভেল সংহিতায় পৃথিবী-কায়, অপ কায়, জল-কায়, বায়ু-কায়, তেজঃকায়, এই পাচ সংজ্ঞার ব্যবহার আছে। পালি নিকায়োক্ত বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক এবং সামান্য পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিক পকুধ কচ্চায়নের (ককুদ কাত্যায়নের) দার্শনিক উক্তিতে অবিকল এই সকল পরিভাষা দৃষ্ট হয়ঃ

"পঠবি কায়ে, আপোকায়ে, তেজো কায়ে, বায়োকায়ে, সুখে দুক্খে, জীবে সত্তমে (দী নি সামঞ্ঞ ফলসুত্ত, ম নি, সন্দক সুত্ত জৈন সূত্রকৃতাঙ্গ, ইত্যাদি)।

পালি নিকায়ে প্রযুক্ত ব্রহ্ম কায়, দেব কায়, গন্ধর্ব্ব-কায়, অসুর কায় ইত্যাদির অনুরূপ পরিভাষা ভেল-সংহিতার ব্রহ্ম-কায়, দেব-কায়, বরুণ-কায়ং, গন্ধর্ব কায়, পিশাচ-কায়ং, অসুর-কায়ং ও মহারাজ কায়ং শব্দে পরিলক্ষিত হয়।

(২) দার্শনিক মতের ও উক্তির সৌসাদৃশ্য ঃ

(ক) ভেল-সংহিতা, পৃ ৮৯ ঃ

"স যদা ভেদং গচ্ছতি তদাপ অপকায়মেব যাতি বায়ুর্বায়ুকায়ং, তেজ তেজকায়, পৃথিবা পৃথিবী কায়, আকাশং আকাশ কায়মিতি। তদা বসো বস কায়ম ইন্দ্রিয়মিন্দ্রিয় কায় ভজতে। ভবতি চাত্র। ভিদ্যমানে শরীরে বৈ ধাতব তুং নিগচ্ছতি।"

(খ) পালি নিকায়োক্ত বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক ও সামান্য পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থিক অজিত কেশকম্বলীর দার্শনিক মত ও উক্তি ঃ

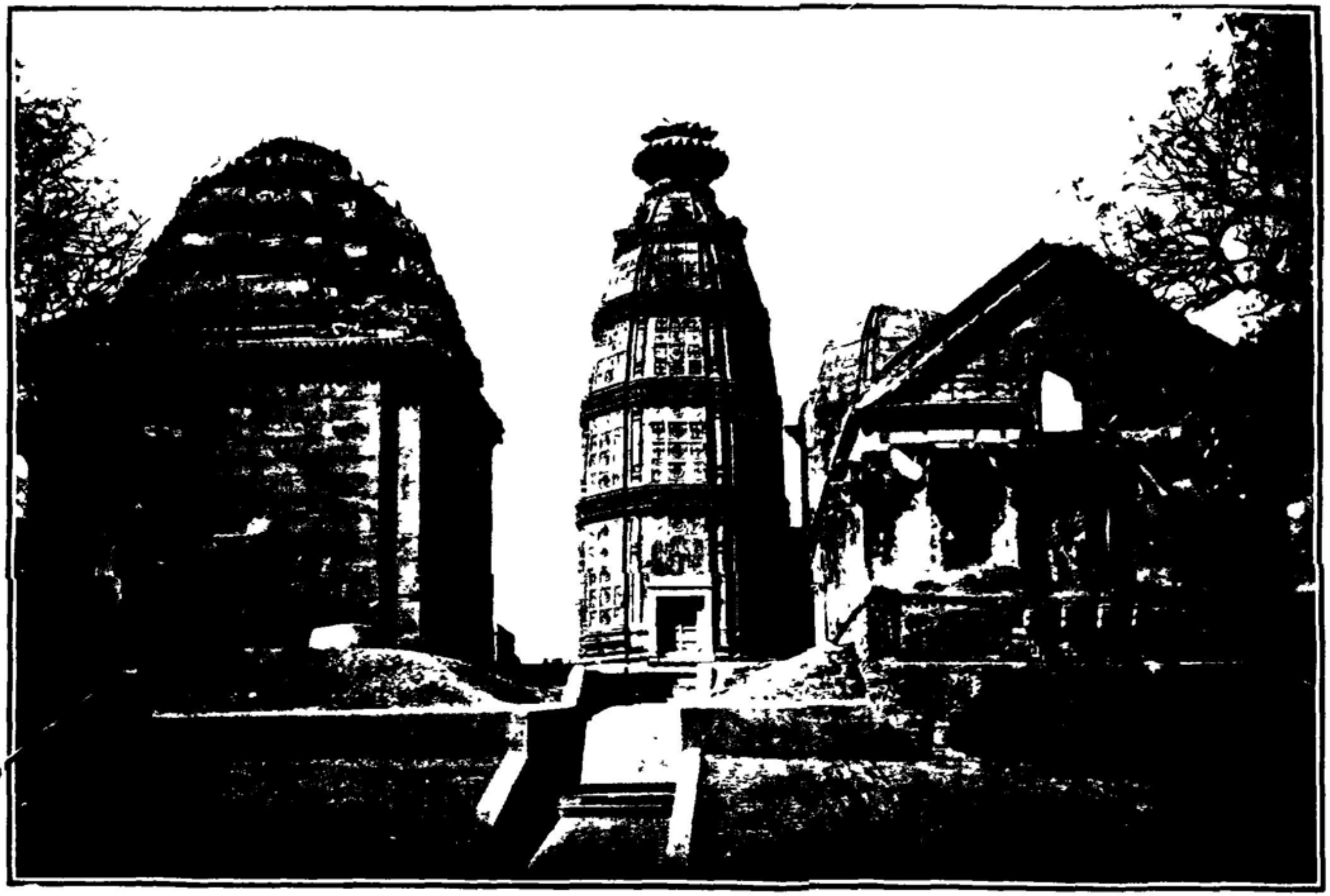
অয়ং পুরিসো যদা কালং করোতি পঠবী পঠবি-কায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আপো আপোকায় তেজো তেজোকায়ং, বায়ো বায়োকায়ং অনুপেতি অনুপগচ্ছতি, আকাসং ইন্দ্রিয়ানি সঙ্কমন্তি।'

(দীঃ নি. সামঞ্ঞ ফল-সুত্ত)

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবকালে অথবা পালি পঞ্চনিকায়ের যুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বারান্তরে আলোচনা করিব। উপসংহারে অগদ-তন্ত্র, শল্য-তন্ত্র, শালাক্য ও কৌমারভৃত্য বিষয়ে দীঘ-নিকায়ের ব্রহ্মজালাদি প্রথম তের সূত্রের অন্তর্গত সীলক্খন্ধ হইতে বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি। ভগবান্ বুদ্ধ বলিতেছেন ঃ

"একে সমণ-ব্রাহ্মণা এবরূপে তিরচ্ছান-বিজ্জায় মিচ্ছাজীবেন জীবিকং কপ্পেন্তি সেয্যথীদং ঃ বমনং বিরেচনং [উদ্ধ-বিরেচনং অধোবিরেচনং সীস-বিরেচনং] কণ্ণতেলং নেত্তপ্পনং নত্থুকম্মং অঞ্জনং পচ্চঞ্জনং সালাকিয়ং সল্লকত্তিয়ং দারক-তিকিচ্ছা মূলভেসজ্জানং অনুপ্পদানং ওসধীনং পটিমোক্খো ইতি।"

"কতিপয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এই প্রকার তিরশ্চীন বিদ্যা দ্বারা, মিথ্যাজীব দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, যথা ঃ বমন, বিরেচন, উর্দ্ধবিরেচন, অধঃ বিরেচন, শিরঃ বিরেচন, কর্ণতৈল, নেত্রাঞ্জন, নস্যকর্ম্ম, অঞ্জন, প্রত্যঞ্জন, শালাক্য, শল্যকর্ম্ম, শিশু-চিকিৎসা (কৌমারভৃত্য), মূল ভৈষজ্য উৎপাদন, ঔষধের ক্ষারণ।"



মদনমোহনজীর মন্দিব—বৃন্দাবন

বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়

ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

যাহারা এ পর্য্যন্ত বৃন্দাবনের পুরাতন ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন মধ্যযুগের মন্দিরগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মন্দিরের স্থাপত্য সৌষ্ঠব ভাস্কর্য্য ও অন্যবিধ শিল্পকলা সম্বন্ধেই বেশী আলোচনা করিয়াছেন, বিশদভাবে ঐগুলির ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। বৃন্দাবনের অধিকাংশ মন্দির সম্রাট আকবরের রাজত্বে রাজপুত সামন্তরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি কিংবা শিলালিপি হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহার ঐতিহাসিক বিচার এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

মদনমোহনজীর মন্দিরের নির্ম্মাতা কে?

এই মন্দির কচ্ছবাহ্-রাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে জনশ্রুতি প্রচলিত। মদনমোহনজী জয়পুর রাজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। জয়পুরের লোক উপহাসচ্ছলে বলে,—"লড়্‌নে ভড়্‌নেমে সীতারামজী, লাড্ডু খানেমে মদনমোহন।" অর্থাৎ লড়াই ঝগড়ায় সীতারামজী, আর লাড্ডু খাওয়ার বেলা মদনমোহন। পূর্ব্বে আম্বরের যুদ্ধপতাকার সঙ্গে সঙ্গে সীতারামজীও লড়াই করিতে যাইতেন। কথিত আছে, আওরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে ৺বিশ্বেশ্বর যখন বেগতিক দেখিয়া জ্ঞানবাপীতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, সে সময় মদনমোহনজীও আম্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবতঃ সত্য। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, মানসিংহ এ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গ্রাউস (Growse) সাহেব মথুরা গেজেটিয়ার লিখিয়াছিলেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত মানসিংহ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ জনশ্রুতির আভাস পাওয়া যায় না। লোকে বলে, রামদাস নামক জনৈক মুলতানী শেঠ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।*

মদনমোহনজীর মন্দির কখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে কোন তারিখযুক্ত শিলালিপি প্রভৃতি পাওয়া যায় নাই। ভক্তমাল গ্রন্থে কবি সুরদাসের নাম মদনমোহনজীর সহিত সংশ্লিষ্ট দেখা যায়:—

"শ্রীমদনমোহন সুরদাস্‌কী নাম-শৃঙ্খলা জোরী অটল।"

উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে, সুরদাসজী সাণ্ডিলা পরগণার বাদশাহী খাজনা তছরূপ করিয়াছিলেন, এই অপরাধে দেওয়ান টোডরমল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। পরে আকবরের কৃপায় মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বৃন্দাবনে আসেন এবং ইষ্টদেব মদনমোহনজীর প্রসাদে অপূর্ব্ব

---

* Mathura Gazetteer, Pt 1, p. 128.

কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। বর্ত্তমানে সুরদাসজীর কাল ১৫৪০—১৬২০ সংবৎ বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং ১৪৮৪ হইতে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে মদনমোহনজীর মন্দির সুপরিচিত ছিল, আমরা জনশ্রুতি হইতে ইহাই শুধু অনুমান করিতে পারি। আকবর-টোডরমল এবং সুরদাসজী-বিষয়ক গল্পের মূলে কোন সত্য নাই। রাজা টোডরমল আকবরের রাজত্বের দ্বাবিংশ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বার দেওয়ান-পদ পাইয়াছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে গ্রাউস্ সাহেব এই মন্দিরের বিগ্রহকক্ষের পূর্ব্বভাগে একমাত্র প্রবেশ-দ্বারের উপর একখানি লুপ্তপ্রায় শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। উক্ত লিপিতে কোন তারিখ নাই এবং ইহার ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু প্রশস্তিটি **প্রথমে** বাংলা অক্ষরে এবং **নীচে** দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। যিনি বাংলা ও নাগরী, দুই রকম অক্ষরে নিজের কীর্ত্তি অক্ষয় করিবার প্রয়াসী ছিলেন, তিনি বাঙালী ছাড়া অন্য দেশবাসী হইতেই পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসী যাত্রীরা সকলেই দেবনাগরী অক্ষর পড়িতে অভ্যস্ত নয়। সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালীর মধ্যে আজকালও শতকরা প্রায় ৮০ জন নাগরী অক্ষর লিখন-পঠনে সক্ষম নহে। যিনি মদনমোহনজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি বঙ্গজননীর সন্তান না হইলে বাংলা অক্ষরের সহিত তাঁহার নাড়ীর এ টান থাকিত না। শিলালিপিতে প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় এইরূপ দেওয়া হইয়াছে :—

> হর ইব গুরুবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো
> গুণিমণিরিব পুত্রো যস্য রাধাবসন্তঃ।
> সত্বৃত্তরাশিঃ শ্রীগুণানন্দনামা
> ব্যধিত বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥

এই শিলালিপি পাঠে আমরা জানিতে পারি, মদনমোহনজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দের পিতার নাম রামচন্দ্র, পুত্রের নাম রাধাবসন্ত, তিনি কোন উচ্চবংশ-সম্ভূত ব্যক্তি। গুণানন্দ ও রাধাবসন্ত বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাসে অপরিচিত। তবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা দেশে সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্‌র (১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীঃ) রাজত্বের শেষভাগে রামচন্দ্র খাঁ নামক এক পরাক্রান্ত হিন্দু জমিদারের উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবত অনুসারে ছত্রভোগের গ্রামপতি রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুকে নীলাচল গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেন না, তখন বাংলা ও উড়িষ্যার রাজার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং পথিকেরা "যাশু" (আরবী জাসুস্) বা গুপ্তচর সন্দেহে ধৃত হইয়া যুধ্যমান পক্ষদ্বয় কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছিল। তথাপি এই রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুকে উৎকলযাত্রায় সাহায্য করিয়াছিলেন। মাদ্‌লাপঞ্জী অনুসারে ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ীয় সেনা কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রান্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই রামচন্দ্র খাঁর প্রাদুর্ভাবকাল ঐ সময়ের কাছাকাছি হইবে। বৈষ্ণব-প্রবাদ অনুসারে মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ যখন বাংলা দেশে বৈষ্ণব

ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন, তখন যশোহর-বনগাঁ প্রদেশের দুর্দ্দান্ত জমিদার মহাশাক্ত রামচন্দ্র খাঁ নিত্যানন্দকে অপমানিত করিয়াছিলেন, এই পাপের ফল হাতে হাতে ফলিয়াছিল—গৌড়েশ্বরের জনৈক মুসলমান কর্ম্মচারী তাঁহার জাতি নাশ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গোহত্যা করিয়াছিল।* এই রামচন্দ্র খাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণানন্দ ও ভুবনানন্দের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। ভুবনানন্দ গৌড়াধিপের প্রিয়পাত্র হইয়া অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে দেশে বৃত্তি দান করাইয়াছিলেন।† পূর্ব্বোক্ত শিলালিপি-কথিত গুণানন্দ যশোহর-বনগাঁর জমিদার প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র খাঁর অন্যতম পুত্র বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণানন্দ, ভুবনানন্দ ও গুণানন্দের "আনন্দ" উপাধি দেখিয়া মনে হয়, রাজরোষে পতিত ও সর্ব্বস্বহারা হইয়া রামচন্দ্র খাঁর পুত্রগণ হয়ত গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন, পৌত্র রাধাবসন্ত সম্ভবতঃ তৎকালীন গৌড়াধিপের কৃপায় নিজ বংশের জমিদারি ও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের পুত্র গুণানন্দ কোন্ সময় মদনমোহনজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার মোটামুটি কাল অনুমানসাপেক্ষ। সুলতান সিকেন্দর লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৮-১৫১৭) মহাপ্রভু বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। তখন ব্রজমণ্ডলে কোন প্রসিদ্ধ মন্দির তিনি দেখেন নাই এবং কোন মন্দির থাকাও সম্ভবপর নহে। কারণ, মুসলমান-ইতিহাস অনুসারে সিকেন্দর লোদী মথুরার মন্দির ভগ্ন করিয়া দেবমূর্ত্তিসমূহ চূর্ণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিচূর্ণ পানের চূণের সহিত মিলাইয়া হিন্দুদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, এমন কি, নাপিতের উপর হুকুম হইয়াছিল, তাহারা হিন্দুদের দাড়ি কামাইতে পারিবে না। লোদী-রাজত্বে বাঙালীদের পক্ষে বৃন্দাবনে মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথা দূরে থাকুক, তীর্থভ্রমণও বিপদসঙ্কুল ছিল। যে "গৌড়াধিপে"র কৃপায় রামচন্দ্র খাঁর অন্যতম পুত্র ভুবনানন্দ অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করাইয়াছিলেন, সেই গৌড়েশ্বর শের শাহ্ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। কারণ, শের শাহ্ই একমাত্র গৌড়াধিপ, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিবার ক্ষমতা ও সৎসাহস অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মুসলমান-ইতিহাসেও শের শাহ্ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করার কথা লিখিত আছে। শের শাহ্র অপক্ষপাত শাসন ও দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত, চোর-ডাকাত সওদাগরের মাল ও পথিকের পুঁটুলি পাহারা দিত। নিজে খাঁটি মুসলমান হইলেও হিন্দুর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবশে মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া তাঁহার শাসননীতিবিরুদ্ধ ছিল। মোট কথা, ইংরেজ-রাজত্বে লালাবাবু বৃন্দাবনে যাহা করিতে পারিয়াছেন, আকবর-রাজত্বের পূর্ব্বে একমাত্র শের শাহ্ কিংবা ইস্লাম শাহ্র শাসনকালে বাঙালী গুণানন্দের পক্ষেও সেইরূপ মদনমোহনজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর ছিল। শের শাহ হোসেন-

* রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি-প্রণীত 'গৌড়ের ইতিহাস,' দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৩৬।

† সতীশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।

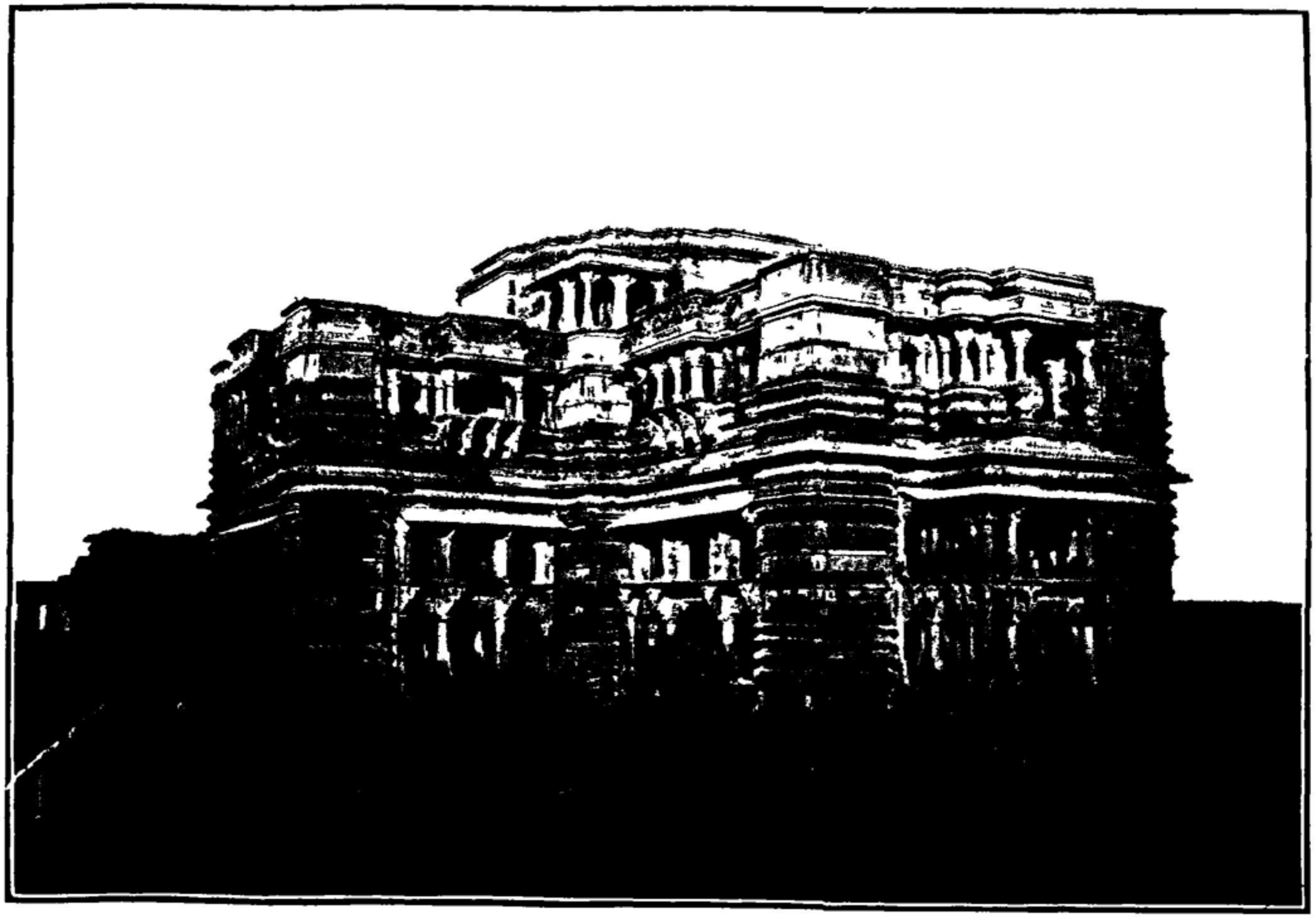
শাহী বংশকে ধ্বংস করিয়া ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ অধিকার করেন, সুতরাং হোসেনশাহী বংশের প্রতি জাতবিদ্বেষ রামচন্দ্র খাঁর পুত্রগণের পক্ষে শের শাহ্‌র পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা অক্ষরে কোন সংস্কৃত শিলালিপি-প্রশস্তি বাংলা দেশের বাহিরে কোথাও আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমার সঠিক জানা নাই। তবে মুঙ্গেরের দক্ষিণে বর্ত্তমান লক্ষ্মীসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন জয়নগর বিহারে ১১৯৭ হইতে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গয়াকর কায়স্থ কয়েকখানি তন্ত্রগ্রন্থ বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতে নকল করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে। মদনমোহনজীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিষয় গ্রাউস সাহেব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> That [the tower] surmounting the sacrarium is a lofty octagon of curvilinear outline tapering toward the summit, and attached to its south side is a tower-crowned chapel of similar elevation.·(*Mathura Gazetteer*, Pt I, p 127-128)

অষ্টকোণ আকৃতি শূর-বংশীয় স্থাপত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ—পুরাণা কিল্লার (দিল্লী) হামাম ও শেরমঞ্জিল এবং মসজিদের স্তূপ ও ফোয়ারা ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এ কথা সকলেই জানেন, বঙ্কিম রেখায় গঠিত (*curvilinear*) ছাদ ও গম্বুজ বাংলার মুসলমান-স্থাপত্যেরই একটা বিশেষত্ব। বাংলা দেশের দো-চালা বাংলা-ঘরের ইহা অনুকরণ মাত্র। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বযুগের এবং পরবর্ত্তী কালের হিন্দু মন্দিরাদির উহা একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। স্থাপত্য শিল্পে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকি, মন্দির বা মসজিদের কোন একটি বৈশিষ্ট্য যাহা গঠনকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, উহাই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর ভাবে অনুকরণ করিয়া অলঙ্করণ-কার্য্যে ব্যবহার করা হয়, যথা, বাংলা দেশের প্রাচীন মন্দিরাদির বঙ্কিম রেখায় গঠিত ছাদ এবং শের শাহর সাসেরামস্থ সমাধিমন্দিরের সূক্ষ্মচূড় খিলান-বিশিষ্ট দরজার অনুকরণে গম্বুজের ভিতরকার "খোল" হইতে ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত সমাধি-প্রকোষ্ঠের চারি কোণায় নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মচূড় খিলানের সারি, মূল গম্বুজের ভার বহন করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি মদনমোহনজীর মন্দির অটুট থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গ-স্থাপত্যের এই বৈশিষ্ট্য হয়ত মন্দিরের অন্যান্য অংশেও আমরা দেখিতে পাইতাম। সুতরাং আমার মনে হয়, মদনমোহনজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দ নিশ্চয় বাঙালী ছিলেন এবং এই মন্দির বঙ্গস্থাপত্যের ধারা অনেক পরিমাণে বজায় রাখিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহাও হয়ত অনেকে জানেন, রাধাকুণ্ড ও মদনমোহনজীর মন্দির একই দেবোত্তর সম্পত্তি। রাধাকুণ্ড এখনও বাঙালীদের অধিকারে আছে। আমার সন্দেহ হয়, মদনমোহনজীর প্রতিষ্ঠাতা গুণানন্দের পুত্র শিলালিপি-কথিত রাধাবসন্ত নিজনামে এই রাধাকুণ্ড নির্ম্মিত করিয়া উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মদনমোহনজী মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইলে ইঁহার সেবার



গোবিন্দজীর মন্দির—বৃন্দাবন

জন্য জয়পুর-দরবারের দেবোত্তর অবশ্যই থাকিত—যেমন গোবিন্দজীর মন্দিরের জন্য এখনও আছে।

গোবিন্দজীর মন্দির

গোবিন্দদেবের মন্দির মধ্যযুগে উত্তর-ভারতের হিন্দুস্থাপত্যের অনুপম কীর্ত্তি। বিক্রমাদিত্য-প্রতিম সম্রাট আকবরের নব-রত্ন সভার অন্যতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ রাজা মানসিংহ অজস্র অর্থব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কথিত আছে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বে সাম্রাজ্যব্যাপী হিন্দু-মন্দিরধ্বংসলীলার সময় গোবিন্দজীর মন্দিরের এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। হিন্দু মন্দিরের আকাশচুম্বী শিখরসমূহ ধূলিসাৎ করিয়া পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু সম্রাট হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের লাল কবি তাঁহার 'ছত্র-প্রকাশ' কাব্যে সম্রাটের এই মনোভাবের চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন :—

বুন্দেলখণ্ডের ফৌজদার ফিদাই খাঁর কাছে বাদশাহী ফরমান্ আসিল—

"নগর ওড়ছা মেঁ সুনৈ,
　　হিন্দু ধরৈ গুমান।
তে নিত পথর পূজিকৈ,
　　কৈসাবত বুফরান॥
উঁচী ধুজা দেবালন সাজৈ।
ঘণ্টা শংখ ঝালরৈ বাজৈ॥
ছাপৈ দেত তিলক ঠাটে।
মালা ধরে বঢ়ত মন বাটৈ॥
এসা হুকুম সরে' বা নাহী।
ক্যোঁ এ করত চিত কা চাহী॥
জো কঁহ কান শংখধুনি আবৈ।
মুসলমান তো ভিস্ত ন পাবৈ॥
সিসো ঔটি কান জো নাবৈ।
তো দোজখ তে খুদা বচাবৈ॥
তাতৈ ঢাহি দেবালৈ দীজৈ।
তিনকে ঠোর মসীদৈ কীজৈ॥
মূলনা তঁহা নিবাজ গুদারৈ।
বাগ দেহি নিত সাংঝ সকারৈ॥
ন্যাউ চুকাবৈ ফাজিলকাজী।
জাতে রহে গুসাই রাজী।

অর্থাৎ "শুনিলাম, ওড়ছা শহরে হিন্দুর বড়ই গুমর। সেখানে নিত্য পাথর পূজা করিয়া তাহারা বে-ইমানী জাহির করিতেছে, উচ্চধ্বজা-বিরাজিত দেবালয়ে শঙ্খ, ঘণ্টা ও ঝাঁজ (cymbals) বাদ্য হইতেছে। হিন্দুরা ঠাট করিয়া তিলক কাটে, বুক ফুলাইয়া মালা জপে। শরিয়তের এ প্রকার হুকুম নাই কেন ইহারা যা ইচ্ছা তাই করে? কানে যদি কখনও শঙ্খধ্বনি আসে, তাহা হইলে মুসলমান ত বেহেশ্‌তে (স্বর্গে) যাইতে পারিবে না। একমাত্র কানে ফুটন্ত গরম সীসা ঢালিয়া দিলে দোজখ হইতে খোদা তাহাদিগকে রেহাই দিতে পারেন। ওখানকার মন্দিরগুলি ভাঙিয়া মসজিদ করিয়া দাও। মৌলানারা ওখানে নমাজ পড়িবে, সকাল সন্ধ্যা আজান দিবে, এলেমদার কাজীরা* মামলা বিচার করিবে—যাহাতে খোদা আমাদের উপর রাজী থাকেন।"

* মস্‌জিদে বসিয়া কাজীদের মোকদ্দমা বিচার করিবার প্রথা বহুদিন হইতে মুসলমান রাজ্যে প্রচলিত ছিল।

যাহা হউক, সমাট্ আওরঙ্গজেব বুন্দেলখণ্ডের ফৌজদারকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মথুরার ফৌজদারের উপরও বোধ হয়, সে রকম আদেশ হইয়াছিল। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বাদশাহী ফরমান্ জারি হইল,—সুবাদারেরা যেন নিজ নিজ এলাকায় হিন্দুদের মন্দির ও টোলগুলি ধ্বংস করিয়া, হিন্দুর শিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চা কঠোর ভাবে দমন করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ কাল পর্য্যন্ত এ আদেশ বলবৎ ছিল। জুলফিকর খাঁ ও মোগল খাঁ নামক কর্ম্মচারিদ্বয় ইহাতে একটু শৈথিল্য প্রকাশ করায় তাঁহারা বাদশাহের কাছে ধমক খাইয়াছিলেন—"হিন্দুর মন্দিরের ত পা নাই যে, ঐগুলি হাঁটিয়া চলিয়া যাইবে?"

১৬৬০ হইতে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শেখ আবদুন্নবী ছিলেন মথুরার ফৌজদার। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়া উহার ভিত্তির উপর মথুরার বর্ত্তমান সুবৃহৎ জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। রাজা বীরসিংহ দেব বুন্দেলা ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কেশবজীর [কেশব রায়] যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার একটি ভগ্ন রেলিং বা আবেষ্টনী শাহজাদা দারা শুকো পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে আবদুন্নবী উহা ধ্বংস করেন। জাঠদের হাতে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আবদুন্নবীর জীবনলীলা সাঙ্গ হওয়াতে মথুরাবাসীরা একটি গান বাঁধিয়াছিল। উহার ভণিতা—"নবীজী, তু বিনা সুন্ন মথুরা"—নবীজী, তোমা বিনা মথুরা আজ শূন্যপুরী। ১৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রমজান মাসের রোজার সময় ধর্ম্মপ্রাণ সম্রাট কেশবজীর মন্দির ধ্বংস করিতে জরুরি আদেশ দিয়াছিলেন অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার কর্ম্মচারীরা এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ছোট বড় মূর্ত্তিগুলি আগ্রায় পাঠাইয়াছিল। এগুলি এখন আগ্রার জাহানারা-মসজিদের সিঁড়ির নীচে প্রোথিত আছে।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির কোন বৎসর ধ্বংস করা হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কেশবজীর মন্দির ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অল্পকাল পরে বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দজীর মন্দিরের গর্ভগৃহ—যেখানে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল, সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইয়াছিল, অন্যান্য অংশ মণ্ডপের ছাদের বরাবর করিয়া ভাঙা হইয়াছে। মুসলমানেরা বোধ হয়, মন্দিরের বর্ত্তমান অংশকে উচ্চ মঞ্চে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার উপর মথুরার মসজিদের মত একটি মসজিদ তৈয়ার করিবার অভিপ্রায়ে ইহা প্রায় অটুট রাখিয়াছিল। মধ্যচূড়ার ভগ্ন অংশের চারি দিকে একটা সামান্য ইটের দেওয়াল গাঁথা ছিল। বর্ত্তমানে ঐ কদর্য্য অংশ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কথিত আছে, এই ভাবে ইহাকে একটা মসজিদের মত করা হইয়াছিল, আওরঙ্গজেব উহাতে নমাজ পড়িয়াছিলেন। গোবিন্দজীর বিগ্রহ মন্দির-ধ্বংসের পূর্ব্বেই গোপনে আম্বরে নীত হইয়াছিল, এখন তিনি সেখানে পূজা পাইতেছেন। গোবিন্দজীর ভগ্ন গর্ভগৃহ পরবর্ত্তী কালে ইট-সুরকী দিয়া কোন প্রকারে দেবস্থানের উপযোগী করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বিগ্রহ গিরিগোবর্দ্ধনধারীর মূর্ত্তি; দুই পাশে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ।

মণ্ডপের পশ্চিম ভাগে একটি সংস্কৃত-প্রশস্তি লেখা ছিল। উহার ভগ্ন অংশটুকু গ্রাউস সাহেবের সময়ও পাঠোদ্ধারের প্রায় অযোগ্য ছিল। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, ১৬৪৭ বিক্রমাব্দে (১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে) কচ্ছবাহ-রাজ মানসিংহ রূপ-সনাতন গুরুদ্বয়ের নির্দ্দেশানুসারে এ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গোসাই রূপ ও সনাতন হোসেন-শাহী আমলের লোক। গ্রাউস সাহেব লিখিয়াছেন, ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং নিধুবনে তাঁহাদের কৃপায় বাদশাহ্ লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সনাতন গোস্বামীর মৃত্যু ১৫৫৮ এবং রূপ-গোস্বামীর মৃত্যু ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।* সুতরাং ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ তাঁহাদের প্রতি ভক্তিবশতঃ এ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—এ কথা বলা যায় না। গোস্বামীরা বৃন্দাবনে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দা দেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ঐ মন্দির "সেবাকুঞ্জে"র মধ্যে অবস্থিত ছিল, বৃন্দা দেবীর মন্দিরের কোন নিদর্শন নাই। অন্য প্রবাদ, গোবিন্দজীর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম মণ্ডপের বহিঃপ্রাঙ্গণের মধ্যে "পাতালদেবী' নামক যে ভগ্নস্তূপ গুম্ফা আছে, উহাই গোঁসাইগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বৃন্দা দেবীর আদি মন্দির।

উক্ত শিলালিপি মানসিংহ কর্ত্তৃক খোদিত আদি প্রশস্তি কি না বিশেষ সন্দেহ আছে। আমার মনে হয়, পরবর্ত্তী কালে বাঙালী গোস্বামিগণ এই ভগ্ন মন্দিরে বর্ত্তমান বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া মন্দিরের উপর নিজেদের দাবী দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই প্রশস্তি পরে যোজনা করিয়াছেন। গোবিন্দজীর পূজারী পাণ্ডারা এখনও জয়পুরে আছেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ এই গোস্বামিদ্বয়ের কোন বাঙালী সেবক ছিলেন, ইহা প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত গোবিন্দজীর মন্দির-নির্ম্মাণে বাঙালী গোস্বামীদের কোন সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যাহা হউক, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দজীর মন্দির যে রাজা মানসিংহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, মন্দির-গাত্রে খোদিত মন্দির-নির্ম্মাতা শিল্পীদের নামযুক্ত একখানি হিন্দী শিলালিপি দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়। গ্রাউস্ সাহেব ইহার নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছেন :—

"সংবত ৩৪ শ্রী শকবন্ধ অকবর শাহ রাজ শ্রীকর্ম্মকুল শ্রী পৃথিরাজাধিরাজ বংশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রী মানসিংহদেব শ্রী বৃন্দাবন জোগপীঠস্থান মন্দির করাজৈ শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রী কল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিকচন্দ চোপাড়ু শিল্পকারি গোবিন্দদাস দীলবলি কারিগরুঃ দঃ। গোরখদস্তবৌংভবল্ ॥"†

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃ ৩১০।

† এই শিলালিপির কোন শুদ্ধ পাঠ কোথাও ছাপা হইয়াছে কি না, আমার জানা নাই। দঃ শব্দটির কোন অর্থ গ্রাউস্ সাহেব দেন নাই। মুসলমানেরা "Peace be on him" অর্থদ্যোতক আরবী কথা কয়েকটির পরিবর্ত্তে সংক্ষেপতঃ "দঃ" ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং "দীলবলি কারিগরু" সম্ভবতঃ কোন মুসলমান কারিগরের নাম—যাহার জন্য "দঃ" "Peace be on him"—প্রার্থনাবাণী যোজনা করা হইয়াছে।

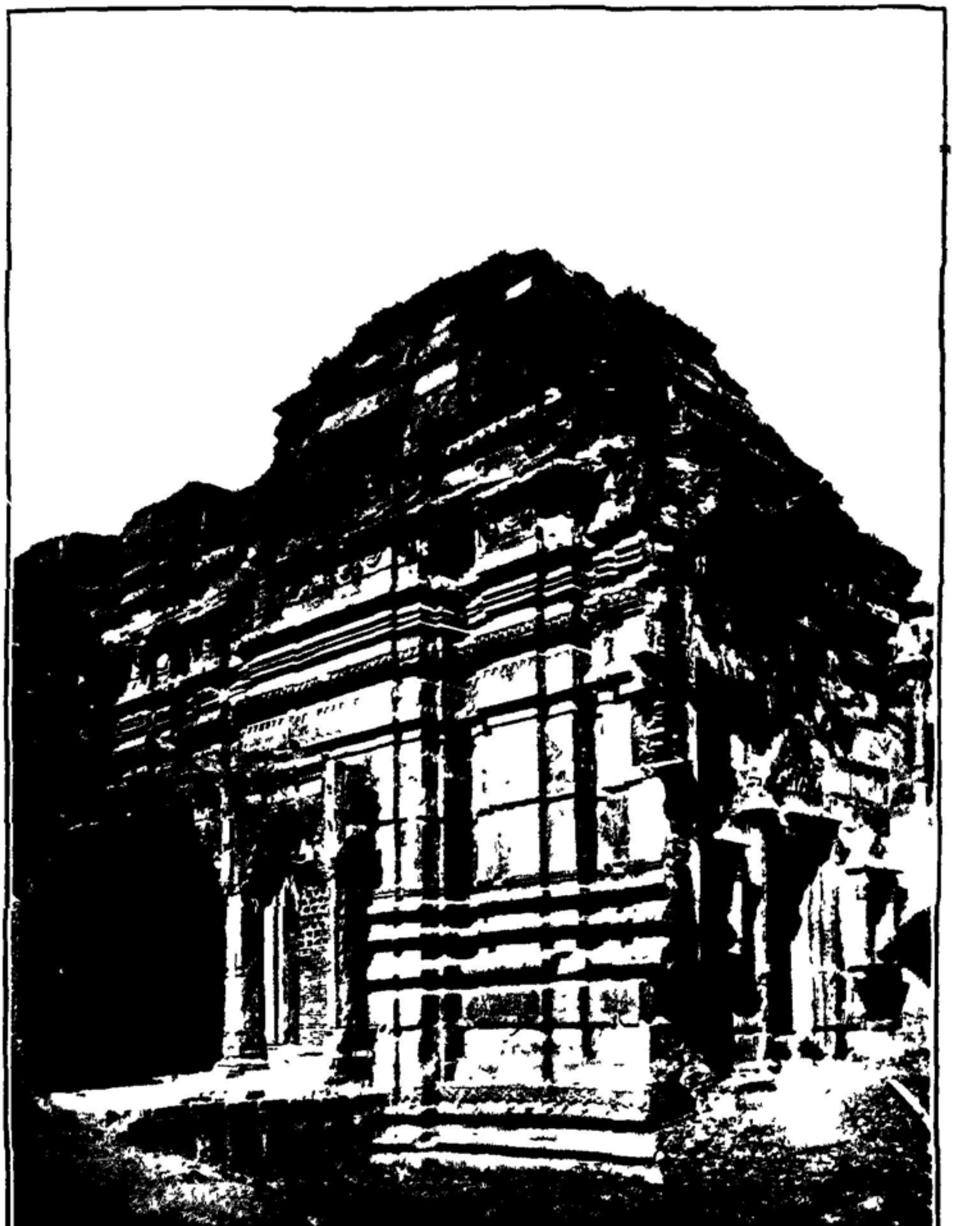
শ্রীবিক্রমাদিত্য আকবর শাহ্ রাজ-সংবৎ (regnal year) চতুস্ত্রিংশ বর্ষে কূর্ম্মকুলোদ্ভব [কচ্ছবাহ = কচ্ছপঘাত] রাজাধিরাজ শ্রীপৃথ্বীরাজবংশজাত মহারাজ শ্রীভগবন্ত দাস-সুত মহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহ দেব কর্তৃক যোগ-পীঠস্থান শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের এই মন্দির নির্ম্মিত হইল। [ইহার] কাম-উপরি [সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ?] শ্রীকল্যাণ দাস, আজ্ঞাকারী [পরিচালক] শ্রীমাণিকচাঁদ চোপাড় (?), শিল্পকারী [architect] গোবিন্দদাস· ✽

গ্রাউস্ সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"In the 34th year of the era inaugurated by the reign of the Emperor Akbar, Sri Maharaj Man Sinh Deva Son of Maharaj Bhagavan Das, of the family of Maharaj Prithiraj, founded, at the holy shrine of Brindaban, this temple of Govind Deva. The head of the work Kalyan Das, the Assistant Superintendent, Manik Chan Chopar (?), the architect, Govind Das of Delhi, the sculptor, Gorakh Das" (*ibid*, p 145)

উক্ত অনুবাদে "শকবন্ধ" শব্দটি বাদ পড়িয়াছে। হিন্দুরা আকবর বাদশাহকে শকবন্ধ বা "শকারি বিক্রমাদিত্য" বলিয়া অভিহিত করিত। "কম কুল" সংস্কৃত কূর্ম্মকুল বা রাজস্থানী "কচ্ছবাহ"-বংশোদ্ভব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "কাম-উপরি" রাজস্থানী কারবারী এবং মারাঠা "কারভারী" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। টাকাপয়সার হিসাবরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) অর্থে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে। "আজ্ঞাকারী" বোধ হয় আসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নয়, ইহা আজ্ঞাকারক অর্থাৎ পরিচালক (supervisor) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। "Chopar" কোন শব্দ নাই, মাণিকচাঁদ চোপ্‌রা ক্ষত্রী হইতে পারে। চোপ্‌রা পঞ্জাবী ক্ষত্রী [বৈশ্য]দের মধ্যে এখনও প্রচলিত উপাধি। "দীলবলি" শব্দটি গ্রাউস সাহেব "দেহেল্‌বী" অর্থাৎ দিল্লীওয়ালা অর্থে লইয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহা ভুল। যদি এই শব্দদ্বারা উহাই প্রকাশ করা লেখকের অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে শুধু "দীলবি" লেখা হইত। "দীলবলি" মুসলমানী নাম Dilwar [দিলবর] বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কারণ, দঃ [Peace be on him !] এই আশীর্ব্বাণী কোন মুসলমানের নামের পর লিখিবার প্রথা আছে। দ্বিতীয়তঃ, সম্রাট আকবর হিন্দু ও মুসলমান উভয় স্থাপত্যধারার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয়তাদ্যোতক নূতন যে স্থাপত্যকলা প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং যাহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন তাঁহার ফতেপুর সিক্রী—সেই নূতন ধারা অনুসারে গোবিন্দজীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। গম্বুজাদি-নির্ম্মাণে মুসলমানেরাই অধিকতর দক্ষ ছিল। সুতরাং মনে হয়, হিন্দু গোবিন্দ দাস ছিল architect এবং "দিলবর" নামক ব্যক্তি ছিল কারিগর অর্থাৎ প্রধান রাজমিস্ত্রী।

✽ কামি-উপরি = মারাঠা কারভারী, হিন্দী কারবারী, আজ্ঞাকারী = আজ্ঞাকারক অর্থাৎ পরিচালক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, চোপাড় = চোপরা, পঞ্জাবী ক্ষত্রী অর্থাৎ বৈশ্যদিগের মধ্যে এই উপাধি প্রচলিত আছে।



গোপীনাথজীর মন্দির—বৃন্দাবন

যাহা হউক, এই দ্বিতীয় শিলালিপিদ্বারা নিঃসংশয় প্রমাণিত হইতেছে, মহারাজ মানসিংহ আকবরের রাজত্বের ৩৪ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গোবিন্দজীর মন্দিরের দক্ষিণ-মণ্ডপের সম্মুখে একটি "ছত্রী" ছিল। বর্ত্তমানে উহা পশ্চিমাংশে নূতন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। মহারাণা অমর সিংহের দ্বিতীয় পুত্র রাজা ভীমের বিধবা পত্নী রম্ভাবতী এই চৌখণ্ডী বা ছত্রী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের রাজত্বে ১৬৯৩ বিক্রম-সংবৎ (১৬৩৬ খ্রীঃ) কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। ছত্রীর একটী স্তম্ভের গাত্রে রাজপুতানী ভাষায় লিখিত একটি শিলালিপি পাঠে উক্ত বিবরণ জানা যায় (*ibid*, p. 146)। শাহ্‌জাহানের দরবারী ইতিহাস আব্দুল হামিদ লাহোরী-লিখিত বাদশাহনামায় উল্লেখ আছে—জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরা তাঁহার রাজ্যে কোথাও নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। এই নিষেধ প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে হিন্দুরা যে সমস্ত মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিল, শাহ্‌জাহানের রাজ্যারোহণের পর সেই অর্দ্ধনির্ম্মিত মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ করিবার প্রার্থনা করিয়া তাহারা এক আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে ফল হইল বিপরীত। সম্রাট্ আদেশ দিলেন, নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করা দূরে থাক্, পূর্ব্বকৃত মন্দিরগুলিও ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। বাদশাহ্‌নামার এক স্থানে লেখা আছে—অমুক তারিখে খবর পৌঁছিল, একমাত্র কাশীর আশপাশে ৭২টি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হইয়াছে। সুতরাং এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান সম্রাটের রাজত্বে রাণী রম্ভাবতী-কর্ত্তৃক এই ছত্রী নির্ম্মিত হওয়ার পশ্চাতে হয়ত কিছু ইতিহাস আছে। রাজা ভীম জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী খুর্‌রম বা শাহ্‌জাহানের বিশেষ বন্ধু এবং বিপৎকালের সহচর ছিলেন এবং তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিয়া মারা গিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় শাহজাহান কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া তাঁহার বিধবা বন্ধুপত্নীর এই শরিয়ৎ-বিরোধী কার্য্য অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহার অবশ্য নজীরও ছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কাংড়ার জ্বালামুখী-মন্দিরে গোহত্যা করিয়া উহাকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন, কিন্তু আবার তিনিই আবুলফজলের হত্যাকারী বীরসিংহ দেব বুন্দেলা কর্ত্তৃক মথুরায় সুবিশাল কারুকার্য্যখচিত কেশবজীর মন্দির নির্ম্মাণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বাদশাহী খেয়াল, কিন্তু আওরঙ্গজেব ছিলেন শরিয়তের একনিষ্ঠ সাধক।

মহারাজা মানসিংহ গোবিন্দজীর সেবার জন্য বিপুল ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন। জয়পুরের মহারাজারা এই মন্দিরের পুরুষানুক্রমিক অভিভাবক। ইহার জমিদারির আয় প্রায় ৪৫০০৲ টাকা। জয়পুর এলাকায় একটি ও আল্‌ওয়ার রাজ্যে একটি গ্রাম এই জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। বৃন্দাবনে রাধাবাগ এবং অনেক বাড়ীও গোবিন্দজীর সম্পত্তি। লালাবাবুর মন্দিরের জমিও গোবিন্দজীর জমিদারি হইতে খরিদ করা হইয়াছে। এ জন্য লালাবাবুরা প্রতিবৎসর ১০২৲ টাকা জমা দিয়া থাকেন।

গোপীনাথজীর মন্দির

গোপীনাথজীর মন্দির মদনমোহনজীর মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শেখাবতী-রাজ্যের কচ্ছবাহ্ সামন্ত রায়সালজী। আকবরনামায় ইনি রায়সাল দরবারী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহার মণ্ডপটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইয়াছে। এই মণ্ডপের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যও অপূর্ব্ব ছিল। ইহার উত্তরাংশে গোপীনাথজীর বর্ত্তমান মন্দির অবস্থিত। আকবরনামা, মাসির-উল-উমারা ও টডের রাজস্থানে রায়সালজীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই মন্দিরের নির্ম্মাণকাল অবশ্য আকবরের রাজত্বসময়ে। কিন্তু সঠিক তারিখযুক্ত কোন শিলালিপির অনুসন্ধান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ইহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয় বার্ষিক ১২০০ টাকা। গোপীনাথজীর দেবোত্তর হইতে বার্ষিক ১৮৲ টাকা জমায় শেঠ-উদ্যানের জমির কিছু অংশ ক্রয় করা হইয়াছে।

যুগলকিশোরজীর মন্দির

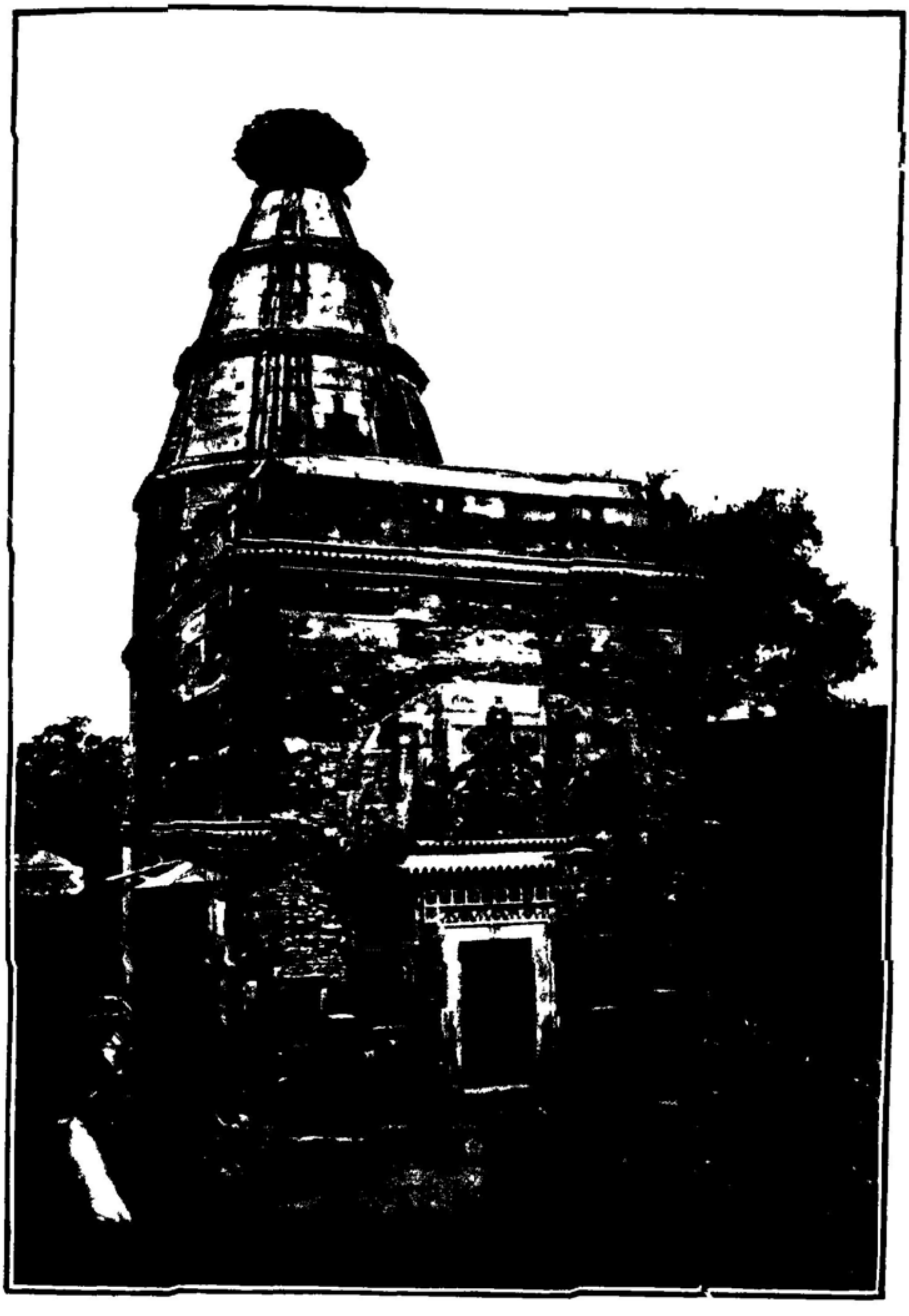
বৃন্দাবনে মধ্যযুগের হিন্দু স্থাপত্যের আর একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যুগলকিশোরজীর মন্দির। কেশীঘাটের নিকট এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। ইহার গর্ভগৃহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। গ্রাউস্ সাহেব এই মন্দির ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেন নাই। জনশ্রুতি অনুসারে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নোন-করণ (বা লুনকরণ) নামক একজন চৌহান ঠাকুর। এই নামের কোন চৌহান ঠাকুরের ঐতিহাসিক পরিচয় তাঁহার জানা ছিল না বলিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—এই নোন-করণ বোধ হয়, গোপীনাথজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শেখাবৎ রায়সালজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নোন্-করণ। জনশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া এইরূপ অনুমানের পক্ষে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। নোন্-করণ বা লুনকরণ নামে রাজপুতানায় সম্ভরের এক রাজা ছিলেন। আকবরনামায় এই নোন্-করণ বা লুনকরণের একাধিক বার উল্লেখ আছে। মারবাড়ের রাও মালদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় ইনি নাগোরের শাসনকর্ত্তা মীর্জা শরফ-উদ্দীনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, পরে তিনি কচ্ছবাহ্ রাজ ভড়মলের [বিহারী মল] সহিত একত্র হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। আকবরের সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়া তিনি অনেক যুদ্ধে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার সময়—আকবরের রাজত্বের প্রথম ভাগ। শূরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজের সময় হইতে সম্ভর-রাজ্য চৌহানকুলের অধীন ছিল। পৃথ্বীরাজও হিন্দী কাব্যাদিতে সম্ভরী-রায়* বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সুতরাং এই চৌহান-বংশীয় নোন্-করণই যুগলকিশোরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া যে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, উহা ঐতিহাসিক সত্য সন্দেহ নাই। স্থাপত্যধারার দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলেও ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই মন্দির আকবরের সমকালীন।

---

* চাঁদকবির পুত্র জলহন্ পৃথ্বীরাজের মৃত্যুবর্ণনায় লিখিয়াছেন :—

পরিয়ো সংভরী রায় দীসৈ উতংগা,
মনো মের বজ্রী কিয় শৃংগ ভংগা।

অর্থাৎ সংভর-পতি ভূপাতিত হইলে অষ্ট দিক্ কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল, যেন বজ্রধারী ইন্দ্রদেব মেরুশৃঙ্গ ভূপাতিত করিলেন।



যুগলকিশোরজীর মন্দির—বৃন্দাবন

চোরের পাঁচালি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম-এ,

'চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা,' এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে বহু গল্প বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে। চোরের বুদ্ধির প্রখরতা এই সকল গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই জাতীয় কোন কোন গল্পের সহিত অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বাংলার নানা প্রান্তে চুরিবিদ্যার উৎকর্ষ ও চোরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন উপাখ্যান বা রূপকথার প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সন্দেশ' নামক অধুনালুপ্ত শিশুদের মাসিক-পত্রে 'চোরচক্রবর্তী' নামে এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। গুরুর নিকট চুরিবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া পাখীর ডানার তলা হইতে পাখীকে না জানাইয়া ডিম চুরি করা, কোনও দ্বীপের রাজাকে পূর্বে সতর্ক করিয়া চুরির উপদ্রবে তাহার রাজ্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা প্রভৃতি পরীক্ষায় সর্বথা কৃতকার্যতা লাভ করিয়া চাষীর ছেলে কিরূপে 'চোরচক্রবর্তী' উপাধি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিল, তাহার বিবরণ এই উপাখ্যানে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তি-প্রণীত 'চোরচূড়ামণি'[১] নামক এক পুস্তকে এক রাজপুত্রের চুরিবিদ্যায় কৃতিত্বের বিবরণ পাওয়া যায়। সমস্ত বিদ্যা অধিগত হইবার পর রাজপুত্র চুরিবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পাখীকে না জানাইয়া তাহার ডানার তলা হইতে ডিম চুরি, রাজার গলা হইতে হার চুরি, এবং দেশান্তরের রাজাকে খবর দিয়া তাহার কন্যার গলা হইতে বহুমূল্য হার চুরি করা প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সকলকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়-লিখিত 'মজার গল্প' নামক পুস্তকেও চোরের কৃতিত্ববিষয়ক একটি গল্প আছে। বস্তুতঃ চোরের পাচালি বা চোরের উপাখ্যানমূলক এক জাতীয় পুস্তক পুরান বাংলা-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পুরান বাংলায় রচিত এইরূপ একাধিক পাচালির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একখানি পাচালি কয়েকবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার নাম 'চোরচক্রবর্তি'। ইহার চতুর্থ সংস্করণের ১৩১৩ হিজরি বা ১৮৯৫-৬ খ্রীষ্টাব্দের গোলাম মওলা নামাঙ্কিত মোহরযুক্ত এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে আছে। ইহার পাতাগুলি তথাকথিত 'মুসলমানী বাংলা পুথি'র মত ডান হইতে বাঁ দিকে সাজান। মূল পুস্তকের রচয়িতা, প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রকাশকের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এই পুস্তকের মুসাবিদাকারক মৃত পশুপতি এবং স্থানে স্থানে বির কাসিম্বর সরু লেখা আছে[২]।

১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাসও 'চোরচূড়ামণি' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

২। কালিকাপ্রসাদে রচে কবি কালিদাসে—পৃঃ ৩। বলে বীর কাশীশ্বর সদয় ভগবতী—পৃঃ ১০। বলে বীর কাশীশ্বর দেবীর চরণে—পৃঃ ২০। গোলাম মওলা কয়—পৃঃ ২৩। বলে, বীর কাশীশ্বর কালিকার বরে—পৃঃ ২৮। গোলাম মওলা বলে—পৃঃ ১৬।

এই চোর চক্রবর্তির পুস্তক জেলা বগুড়ার কল্লুমগাড়ি সাকিনের শ্রীজুত মুন্সি সতরুল্লা ও উক্ত সাহেবের সাগ্রেদ শ্রীমুন্সি জমিরদ্দি আখন্দ সাহেবানদিগের সম্পুর্ণ সাহায্যে ও মেহেরবানিতে ঐ মুসবিদা আনাইয়া আমি শ্রীগোলাম মণ্ডলা অনেক পরিশ্রমে ঐ মুসবিদার কাপি সংসোধনপূর্ব্বক এবং স্থানে ২ নিজে রচনা করিয়া নিজ খরচ পত্রে সিবাদহ হাজিপাড়া সাকিনে আমার হবিবি প্রেসে চতুর্থবার ছাপাইয়া প্রকাশ করিলাম।

এই পুস্তকে 'চোরচক্রবর্তী' উপাধিধারী প্রসিদ্ধ চোরের চমকপ্রদ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। এই চোরচক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত আর একখানি পুস্তকের পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রসঙ্গে পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ ইহাকে একখানি মূল্যবান পুথি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পুথির আলোচ্য বিষয়ের কোনও পরিচয় এ যাবৎ কেহ প্রদান করেন নাই, কি হিসাবে ইহার মূল্য, তাহাও নির্ণীত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুই প্রসঙ্গেরই যথাসম্ভব আলোচনা করা হইবে।

এক প্রসিদ্ধ সুচতুর চোরের চৌর্য বর্ণনাই এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে পূর্বকথিত মুদ্রিত পুস্তকের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও মিল নাই।[৩] এই পুথিতেও বীর কাশীশ্বরের ভণিতা আছে সত্য, তথাপি ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। বোধ হয়, পুথিতে প্রাপ্ত কাশীশ্বরের গ্রন্থাবলম্বনে মুদ্রিত গ্রন্থখানি পশুপতিকর্তৃক রচিত ও গোলাম মণ্ডলা কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল। পুথির নকলের তারিখ ১১৭২ সাল। দুই পুস্তকেই চোর কালীর উপাসক—মুদ্রিত পুস্তকের মতে কালীর নিকট হইতেই চোর চুরিবিদ্যা শিক্ষা করে (পৃঃ ৩)।[৪] উভয় পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় এক—খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। এই সকল পার্থক্যের কথা পুথিখানির বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিম্নে যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। মনে হয়, এক যুগে চোর-চক্রবর্তীর নাম বাংলা দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার কীর্তিবিষয়ক নানা উপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত উপাখ্যান ও চোরচূড়ামণির উপাখ্যান এই বহুপ্রচলিত বিক্ষিপ্ত উপাখ্যান-সমষ্টির অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। এই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এক গ্রন্থের

৩। মাঝে মাঝে দুই এক পংক্তি প্রায় মিলিয়া যায়:—

এক হাতে গুআ পান আর হাতে ঝাড়ি।
স্বামীকে ভেটিতে জায় সাধুর কুমারী॥ (১৮ খ, পৃঃ ৩১)।
অকুলীন ধন হৈলে হয়ত কুলীন।
কুলীন নির্ধন হৈলে হয় বড় হীন। (১৯ ক, পৃঃ ৩২)

৪। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি, কার্তিকেয়কে চৌর্যশাস্ত্রের প্রবর্তক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

কথা ১২১৩ সনে রাজা পৃথ্বীচন্দ্র-রচিত 'গৌরীমঙ্গল' নামক গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে।[৫] আমাদের উল্লিখিত কোনও গ্রন্থের সহিত পৃথ্বীচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থ অভিন্ন কি না, বলিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাদের কোনখানিরই রচনা-কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর নহে। তবে এই দুইখানি পুস্তক হইতে দেবতার পাঁচালিপরিপূর্ণ পুরান বাংলা সাহিত্যে এক নূতন ধরণের পাঁচালির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, প্রাচীন সাহিত্যামোদীর নিকট ইহাদের কিছু মূল্য আছে। তাই ইহাদের একটু বিস্তৃত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। রূপকথার ইতিহাসের দিক্ হইতেও এই সমস্ত গল্পের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে প্রচলিত এই জাতীয় গল্পগুলি সুশৃঙ্খল আলোচনার অভাবে পণ্ডিতসমাজের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাই ব্লুমফীল্ড নামক প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত "The art of stealing in Hindu fiction"[৬] নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে বাংলা দেশে প্রচলিত উপাখ্যানের বিশেষ বিবরণ প্রদান করিতে পারেন নাই।

চোরের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য— চোরের প্রশংসা বা চৌর্যের উৎসাহ প্রদান ইহার কাম্য নহে। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন,—

চৌরচক্রবর্তিকথা শুনিতে মোধুর।
জে কথা শুনিলে লোক হয় ত চতুর ॥[৭]

চোরের নাম খরবর—পিতা বিজয়নগরের রাজার পাত্র উগ্রসেন, মাতা গুণবতী (পত্র ১ খ, ২ খ)।[৮] কাব্য, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খরবর 'কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চৌরবিদ্যা' (৩৬ ক)।[৯] অতঃপর, চম্পাবতী নগরীর কর্তৃপক্ষের

৫। চোরচক্রবর্ত্তীকীর্ত্তি ভাষায় রচিল।
বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার কবিল ॥—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৩, পৃ ৫০।

এই কবিতায় দুইখানি গ্রন্থের কথা ('চোরচক্রবর্তিকীর্তি' ও 'বিক্রমাদিত্যকীর্তি') উল্লিখিত হইয়াছে মনে হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ১৩) ইহাতে চোরচক্রবর্তিরচিত বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। *American Journal of Philology*, ৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১৩৩, ১৯৩-২২৯।

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মতে—'চোরচক্রবর্তি নাম রহে জার ঘরে। চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার মন্দিরে' (পৃঃ ২)। 'এই পুথি যেই জন ঘরেতে রাখিবে। তার ঘরে চোর চুরি করিতে নারিবে' (পৃঃ ৭৯)।

৮। মুদ্রিত পুস্তকে রাজার নাম রত্নেশ্বর বা বাণেশ্বর, পাত্রের স্ত্রীর নাম কলাবতী, চোরের বাড়ী বিক্রমপুর—'সোনার গ্রাম বিক্রমপুর মোর বাড়ীঘর' (পৃঃ ১১)। পুথিতেও এক স্থানে (৩৬ ক) কলাবতী নাম আছে। এই স্থানে চোরের আসল নামের উল্লেখও আছে—'বাছিএল রাখিল মোর নাম কৃষ্ণ করি।'

৯। যে চতুঃষষ্টিকলা লোকের নিকট বিশেষ আদর ও সম্মান পাইত, তাহার মধ্যে চুরি-

অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া চোরের দল চোরচক্রবর্তীর নিকট নিজেদের দুঃখের কথা জানাইলে

শুনিঞা প্রতিজ্ঞা কৈল চোর থরবর ॥
তবে চৌরচক্রবর্ত্তী নাম সাফল।
জতেক চোরের মধ্যে আমি নরপতি।
চাম্পাবতী পুরীখান করিমু বিকল ॥
আমা বিদ্যমানে করে এতেক দুর্গতি ॥
নগরিঞা লোক সব করিমু ভিখারী।
শুনিঞা চোরের কথা কোপিল প্রচণ্ড।
কেমতে রাখিবে রাজা আপনার পুরী ॥ (১খ)
চাম্পাবতী পুরীখান করিমু লণ্ডভণ্ড ॥

গোপনে যাওয়া লজ্জার বিষয় মনে করিয়া চোর, এক পত্র দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞার কথা প্রথমে রাজাকে জানাইয়া দিল। তার পর চোর 'উর্দ্ধজানু করিঞা' কালীর ধ্যান করিল এবং দেবীর বরে বলীয়ান্ হইয়া প্রত্যূষে যাত্রা করিল। তপস্বীর বেশে চাম্পাবতী পুরীতে প্রবেশ করিয়া চৌকিদারের নিকট নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিল—

শিশুকাল হইতে আমি হইলাউ সন্ন্যাস।
অযোধ্যাতে ঘর আমার নাম কৃষ্ণদাস ॥
নানাতীর্থ ভ্রমিতে আমি হাবিলাস করি। (৩খ)

তীর্থভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণে সন্তুষ্ট না হইয়া চৌকিদার চোরকে রাজার নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে চোর কপট ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ভয়ে চৌকিদারও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নগরের মধ্যে রাজার মালীর নিকট নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়া, চোর তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিল। মালীও তাহাকে অভয় প্রদান করিল—

রাজার প্রসাদে অমি কাকো না ডরাই।
মহাসুখে থাক তুমি না ভাবিহ ডর।
বিশেষে রাজাকে আমি পুষ্প জোগাই ॥
নির্ভয়ে থাক তুমি আমার ঘর ॥ (৭ক)

চোর তখন তপস্বীর বেশ ত্যাগ করিয়া, সাধু বা সদাগরের বেশ ধারণ করিল।

কর্ণের কুণ্ডল খসাঞা মালির হাথে দিল।
বিচারিঞা কেশ মাথে লোটাঞা বান্ধিল ॥ (৮ক)

বিদ্যারও স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। মল্লিখিত Two New Lists of kalas—*Indian Historical Quarterly* (৮।৫৪৭) দ্রষ্টব্য। রাজকুমারেরা অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় চুরিবিদ্যায়ও শিক্ষালাভ করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা দশকুমারচরিত (কালের সংস্করণ, পৃঃ ২২) প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই বিদ্যাসম্বন্ধে প্রাচীন যুগে সংস্কৃতে বই লেখা হইয়াছিল। দুই একখানি বইয়ের পুথি এখনও পাওয়া যায়। একখানির নাম ষণ্মুখকল্প, আর একখানির নাম চৌরচর্যা বা চৌর্যস্বরূপ। প্রথমখানির পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীতে ও দ্বিতীয়খানির পুথি পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে আছে। কর্ণীসুত বা মূলদেব ছিলেন এই শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থকার। মূলদেব লিখিত কোন বই এখন পাওয়া যায় না। তবে তামিল সাহিত্যে মূলদেবকৃত একখানি চৌর্যশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ চোর ছিলেন। তাঁহার চুরির গল্পও এক যুগে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার কিছু বিবরণ কথাসরিৎসাগর নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এইরূপ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া চোর প্রথম দিন বাজারের গোয়ালিনীকে ঠকাইয়া প্রচুর দধিদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করিল—দ্বিতীয় দিন নাপিতকে ঠকাইয়া ক্ষৌরকার্য সমাধা করিল এবং তাঁতীদের ফাঁকি দিয়া বিবিধ মূল্যবান্ বস্ত্র সংগ্রহ করিল। ইহার পর সে নগরের ঘরে ঘরে নিয়মিত চুরি আরম্ভ করিল।

রাত্রি চুরি করে চৌর দিনে যায় নিন্দ।　　নগরিঞা লোক কান্দে মাথে হাথ দিঞা।
প্রভাতে উঠিঞা দেখ সর্ব্বঘরে সিন্ধ॥　　হায় হায় করে লোক বিকল হৈঞা॥ (১৩ ক)

কিন্তু এত সব করিয়াও চোরের মনে তৃপ্তি হইল না—সে রাজগৃহে চুরি করিবার জন্য কালিকার আরাধনা করিতে লাগিল—

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।
চরণে পড়হু মাতা আইস এই ধাম॥ (১৪ খ)

দেবী বর দিলেন—'যাহ রাজঘরে আমি থাকিব সঙ্গতি' (১৪ খ)। কিন্তু চোরের ধনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না—

চোর বোলে ধন লৈঞা আমি কি করিব।
রানি চুরি করি আমি কলঙ্ক থুইব॥ (১৫ ক)

চোর 'রাজার মন্দিরে গিঞা নিদালি ভেজাইল।' সকলে নিদ্রায় অচেতন হইলে

রানিক লইঞা চোর বাহির করিল॥　　চিড়াকুটির স্ত্রীকে নিল সঙ্কেত করিঞা॥
পথেত যাইতে চোর মোনেক ভাবিল।　　ত্বরায় আইল চোর রাজার পুরিতে।
চিড়াকুটির[১০] বাড়ি জাঞা প্রবেশ হৈল॥　　চিড়াকুটির স্ত্রীকে থুইল রাজ্যাতে [রাজার শয্যাতে॥]
চিড়াকুটির শয্যাতে রানিক থুইঞা।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেখিলেন—পাশে শুইয়া এক রাক্ষসী। 'গুণী' ডাকা হইল—তাহারা মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষসী তাড়াইতে চেষ্টা করিল। এ দিকে চিড়াকুটি ভাবিল—তাহার ঘরে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাই পাড়াপড়শী সকলে মিলিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রাজাও আসিলেন এবং তখন সকলে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন।

এবার চোর ঠিক করিল, কোটাল দোসাহুর ঘরে চুরি করিয়া নিজ নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করিবে।

তবে চৌরচক্রবর্ত্তী নাম পাড়াব।
জাতিনাশ ধননাশ কোটালের করিব॥ (১৬খ)

দরোয়ানের সহিত কথাপ্রসঙ্গে চোর জানিতে পারিল—কোটালের একমাত্র কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়া সদাগরকুমার বিদ্যাধর দীর্ঘকাল বিদেশে গিয়াছে। কয়েক দিন পরে সদাগরের বেশ ধারণ করিয়া চোর কোটালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং কোটালের

১০। মুদ্রিত পুস্তকে চিড়াকুটির-স্থানে সূত্রধরের কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ৪৪)।

জামাতা বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। পরম আদর যত্নে সে সেখানে রাত্রি যাপন করিল—লীলাবতী 'যৌবনের মদে পতি না চিহ্নে আপনার' (২০ক)। প্রাতঃকালে কোটাল রাজবাড়ী গেলে চোর রটাইয়া দিল—রাজা কোটালকে বন্দী করিয়াছেন—

> হাথেতে বান্ধিঞা রাখিল কারাগারে।
> না জানিএ রাজা কিবা করে আরে॥
> জাতিপ্রাণ লঞা বুলিল পালাইতে মোরে। (২১ ক)

সুতরাং চোর কোটালের দুই স্ত্রী, কন্যা, ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিল। এদিকে রাজা চোর ধরিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া কলাধর নামক সর্বজান বা সর্বজ্ঞকে আনাইলেন। লোক লইয়া কলাধর চোর ধরিবার জন্য যাত্রা করিল।

> বেস্ত হঞা জায় চোর স্থান নাই পায়।
> পলাইঞা চোর ধোবার ঘাটে জায়॥ (২৪ খ)

ঘাটে মনোহর ধোপা কাপড় কাচিতেছিল। চোর তাহাকে বলিল,—'রাজার আদেশে কোটাল তোমাকে কাটিতে আসিতেছে।'

> চোর বোলে শুন ধোবা আমার বচন। এক গোটা পাতিল মুণ্ডের উপর দিঞা।
> জলেত প্রবেশ করি থাকহ এখন॥ জলের ভিতরে তুমি থাকহ লুকাঞা॥ (২৫ ক)

প্রাণের ভয়ে ধোপা চোরের পরামর্শানুযায়ী কাজ করিল—চোর তাহার জায়গায় কাপড় কাচিতে লাগিল। কলাধর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে ধোপা-বেশী চোর তাহাকে জানাইয়া দিল যে, চোর জলের মধ্যে লুকাইয়া আছে। তাহার কথামত রাজার লোকেরা ধোপাকে জলের ভিতর হইতে উঠাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। এদিকে চোর ধোপার সমস্ত কাপড় লইয়া পলায়ন করিল।

আসল চোর ধরিতে না পাবায় কোটাল কলাধরকে উপহাস করিতে লাগিল। কলাধরও সাহঙ্কারে বলিল—

> তবে মোকে সর্বজান বুলিহ কলাধর।
> কালি ধরিঞা দিমু চোর খরবর॥ (২৭ ক)

এদিকে চোরচক্রবর্তীও চিন্তিত হইয়া চণ্ডী দেবীকে ডাকিতে লাগিল। রাত্রিতে 'গুয়াপান' ও একখানি কাটারি লইয়া চোর কলাধরের বাসায় উপস্থিত হইল। অনেক ডাকাডাকির পর কলাধর জাগরিত হইলে চোর তাহাকে বলিল—'রাজায় গুআপান তোমাকে পাঠাইল।' তখন "গুয়া পান" গ্রহণ করিবার জন্য কলাধর হাত বাড়াইবা মাত্র কাটারিস এক আঘাতে চোর তাহা দুই খণ্ড করিল। তার পর সেই কাটা হাত লইয়া রাজবাড়ীতে গেল এবং রাজার ঘরে সিঁধ কাটিল। কেহ জাগরিত আছে কি না, দেখিবার জন্য যেই চোর সেই কাটা হাতখানি ঘরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিল, অমনি রাজা তাহার উপর খড়্গাঘাত করিলেন। চোরও কাটা হাত ফেলিয়া পলায়ন করিল। রাজা ভাবিলেন—এইবার চোরকে সনাক্ত করিবার উপায় হইল।

প্রাতঃকালে চোর গণকের বেশ ধারণ করিয়া রাজার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। চোরের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—

পাজি পুথি এড়ি দৈবক মালসাট মারে। আমিত ধরিঞা দিব চোরচক্রবর্ত্তি।
তবে রুদ্রধড়ি গোসাই বুলিহ আমারে। নৃপতি বলিল তবে বুজিব তোমার শক্তি। (৩০ক)

তার পর রাজাকে সঙ্গে লইয়া চোর কলাধরেব বাসায় উপস্থিত হইয়া বলিল—'এই ঘরে চোর আছে।'

নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া সান্ধাইল ঘরে। কাটাহাত দেখিঞা সবে বোলে চোর করি।
দেখে শুতিয়া আছে সর্ব্বজান কলাধরে॥ রাজাব সাক্ষাতে লঞা আইলেন ধরি॥ (৩১ ক)

রাজা তাহাকে দেখিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন এবং তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। পাইকগণ কলাধবকে বাঁধিয়া লইয়া গেল—নগরের লোকে তাহাকে মনের সুখে প্রহার করিল।

সর্ব্বজানের হাথ টুটা কবিল চোরবরে।
নড়িতে না পারে তবে লোকে প্রহার কবে। (৩৪ খ)

ইহা দেখিয়া চোরচক্রবর্তীর মনে দুঃখ হইল এবং রাজার নিকট পূর্বাপর সমস্ত কথা প্রকাশ কবিয়া বলিল। কোটালকে শিক্ষা দেওয়াই যে তাহার উদ্দেশ্য—চুরি করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। কোটালের চোর তাড়াইবার বিপুল আগ্রহকে উপহাস করিয়া সে বলিল—

হেন ছাড বড়াই করিলে কিসের কারণ।
কন্যা গেল নারী গেল তোমার ব্যর্থ জীবন। (৪০ খ)

সমস্ত শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে চোরের সহিত নিজ কন্যা মালাবতীর বিবাহ দিলেন। চোরও কিছু জিনিষ মালীকে দিয়া অপহৃত সমস্ত জিনিষের বাকী অংশ ফিরাইয়া দিল। কোটালেব স্ত্রীকন্যাকেও ফিরাইয়া আনিল।

নাগরিকগণ মুক্তকণ্ঠে চোরের প্রশংসা ও কোটালের নিন্দা করিতে লাগিল—

হাবাইলে বস্ত্র সব কেবা দিতে পারে। অল্প মনিষ্য হঞা কোটাল বড় সাদ।
ধন্য ধন্য চক্রবর্ত্তী আইল নগরে॥ এমন জনাব সনে মরিতে করে বাদ॥
নগরিঞা লোক বোলে ধন্য নাম থরবর। রাজা[র পু]ত্র হইঞা জেবা করে চুরি।
বটকের বস্ত্র না নেহ আপন ঘর॥ অন্য জন তাব সনে নহে বরাবরি॥ (৪১ খ)

নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া চোর স্বদেশে গমন করিল। সেখানে ব্রাহ্মণগণকে অনেক টাকা দক্ষিণা দিল এবং সকল চোরকে উপহার প্রদান করিল। তার পর চোরদের উপদেশ দিয়া বলিল—

আপনার সুখে তোমরা জথা তথা জাও। ব্রাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিন জন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন এড়ি চুবি করি খাও। ইহার ঘরে চুরি না করিহ কখন। (৪১ খ)

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে কয় জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া যায়, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহাদের অন্যতম। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, তিনি এক সময় রামমোহন রায়ের সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাংলা-গদ্যের লেখক হিসাবেও তাঁহার স্থান উচ্চে। তাঁহার গদ্য-রচনা অতি সরস ছিল। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র ও সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি হইতে তাঁহার জীবনকথা যেটুকু উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

কাশীনাথের কর্ম্মজীবন

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-সকল ইংরেজকে শাসনকার্য পরিচালনের জন্য এদেশে পাঠাইতেন, তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে অবশ্যপ্রয়োজন, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ সনের শেষাশেষি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০১ সনের ৭ঠা মে তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন—পাদরী উইলিয়ম কেরী। তাঁহার অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ('তর্কালঙ্কার' নহে) প্রধান পণ্ডিতের পদে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে যথাক্রমে দুই শত ও এক শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া মাসিক ৪০৲ বেতনে আরও ছয় জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হন, কাশীনাথ ইঁহাদের মধ্যে এক জন।

কাশীনাথ এই পদে প্রায় ২৪ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন।* ৭ ডিসেম্বর ১৮২০ তারিখে কলেজ-কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যবিবরণ-পুস্তকের মধ্যে পাইয়াছি। পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের নাম, বয়স, পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা প্রভৃতির বিবরণযুক্ত একটি তালিকা প্রতিবৎসর সংস্কৃত কলেজ হইতে শিক্ষা-পরিষদে প্রেরিত হইত। ১ মে ১৮৪৭ তারিখের

মহামহিম শ্রীযুত কালেজ কৌন্‌সলের সাহেবান বরাবরেষু

কালেজের পণ্ডিত শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের নিবেদনমিদং আমি ন্যায়দর্শনের ভাষাপরিচ্ছেদ পুস্তকের গৌড়দেশীয় সাধুভাষাতে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি টীকার অনুসারে স্পষ্টরূপে অর্থপ্রকাশ করিতেছি যে শাস্ত্রের অতি কাঠিন্যপ্রযুক্ত অর্থপ্রকাশ করণে অদ্যাপি কোন্‌ পণ্ডিত প্রবৃত্ত হয়েন নাই—মেস্তর পিয়র সাহেবের মুদ্রাগৃহে এই পুস্তকের মূলসহিত মুদ্রাকরণে পঞ্চ শত মুদ্রা ব্যয় হইবেক পুস্তকের মূল্যে [?] শ্রীযুতেরদিগের বিবেচনায় নির্ভর করিয়া দৃষ্টি করিবার নিমিত্তে পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমর্পণ করিতেছি এইরূপ বিংশতি ভাগ হইবেক তাহাতে শ্রীযুতেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক শত পুস্তক গ্রহণ করিলে পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে ও আমার পরিশ্রম সফল হয় এবং কালেজের পাঠার্থি সাহেবদিগের অল্পায়াসে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিদ্যা ও বাঙ্গালাভাষাতে নৈপুণ্য হইতে পারে অতএব নিবেদন যে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই প্রতিপাল্য ব্যক্তির প্রতি সফলা আজ্ঞা হয় ইতি ১৮২০ সাল তারিখ ৭ দিসম্বর

শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণঃ।

কলেজ-কাউন্সিল দশ খণ্ড পুস্তক ৫০৲ মূল্যে ক্রয় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক

১ জানুয়ারি ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়।*

এইরূপ একটি তালিকায় (কাশীনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক) কাশীনাথ পূর্ব্বে যে-যে চাকরি করিয়াছিলেন, তাহার এইরূপ বিবরণ আছে :—

Pundit of the College of Fort William from 1813 to 1824. Professor of Smriti in the Government Sanscrit College from 1825 to 1826 Pundit and Sudder Ameen of the District of 24 Purganahs from 1827 to 1831

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কাশীনাথ ১৮০১ সনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

* গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ প্রথমে ৬৬ নং বহুবাজারে অবস্থিত ছিল, ১৮২৬ সনের ১ মে পটলডাঙ্গার নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। এই বাটী গবর্মেণ্টের খরচে ১৮২৪-২৫ সনে বার্ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজও এই বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই বাটীর কোন্‌ অংশে হিন্দু কলেজ প্রথমে অবস্থিত ছিল, ২৮ জুন ১৮৩৭ তারিখে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশনকে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রামকমল সেনের পত্র হইতে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

". . . . the Buildings attached to the Hindoo College are occupied as follows — The Centre upper roomed house by the Sanscrit College. The two wings lower roomed houses by the Hindu College."

১৯ মে ১৮৩৫ তারিখে রামকমল সেন মাসিক ১০০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং এই পদে তিনি ১৮৩৮ সনের শেষ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এই সময় হইতে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পর-বৎসর নবেম্বর (?) মাসে বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হইলে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিমুল্যা-নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এই পদের জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ৮০৲ বেতনে এই শূন্য পদে নিযুক্ত হন। কাশীনাথের এই পদপ্রাপ্তি উপলক্ষে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি প্রকাশিত হয়:—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত।—শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্যানিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন যে কর্ম্ম ৺রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছিল।
>
> শুনা গেল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমন হইলে তৎপদপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় অনেক স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরা ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহাতে ঐ বিজ্ঞ বিচক্ষণাপক্ষপাতি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাঁহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন যে এই প্রশ্নের যিনি সদুত্তর লিখিয়া প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক। অনন্তর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় তাবতেই লিখিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের উত্তরে সন্তোষ পাইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।—৩ ডিসেম্বর ১৮২৫ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৯ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখ হইতে বেতন লইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৭ সনের পুরা এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

চব্বিশ-পরগণার জজ-পণ্ডিত ও সদর আমীন

বৎসরাধিক কাল সংস্কৃত কলেজে যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিবার পর, ১৮২৭ সনের মে মাসে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ২৪-পরগণা জেলার জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই সংবাদে 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখিয়াছিলেন:—

> পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।—১২ মে ১৮২৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

১৮২৭ হইতে ১৮৩১ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ ২৪-পরগণার পণ্ডিত ও সদর আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—সংস্কৃত কলেজের নথিপত্র হইতে ইহা জানা গিয়াছে। ইহার পর তিনি চাকুরী হইতে বরখাস্ত হন। কাউন্সিল অব এডুকেশনের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনের কার্য্যবিবরণে প্রকাশ—

> He was dismissed by order of the Sudder Dewany Audalat but by a subsequent proceedings of that Court it appearing that the said order did not prohibit his future employment . . his name was registered in the Council's list for employment . . .

১৮৩২ হইতে ১৮৪৬ সন পর্য্যন্ত কাশীনাথ কি করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। ১৮৪৭ সনে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন।

গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চারিটি শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কারণে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লেখেন। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। সেক্রেটরী রসময় দত্ত* এই পদে কাশীনাথকে নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষা-পরিষদ্‌কে সুপারিশ করিয়াছিলেন, কাশীনাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল। শিক্ষা-পরিষৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

কাশীনাথ ১২ই মার্চ ১৮৪৭ হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ

কাশীনাথ যখন ৫ম ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে তাঁহার দ্বারা চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও অস্থায়ী সেক্রেটরীরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কারকল্পে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, কাশীনাথকে ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ হইতে সরাইয়া গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে, এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদ হইতে ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব এই রিপোর্টে ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs 40 a month, .

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষৎ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের বেতনের রসিদ-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

মৃত্যু

অভাবের তাড়নায় বৃদ্ধ বয়সে অপটু স্বাস্থ্য লইয়া কাশীনাথ অতিকষ্টে পদব্রজে সংস্কৃত কলেজে আসিতেন। ইহাতে তাঁহার অতিশয় ক্লেশ হইত। এই কারণে ১৯ জুলাই

* রসময় দত্ত ১৭ এপ্রিল ১৮৪১ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি ১৮৪৯ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৫১ তারিখে তিনি যানারোহণে গমনাগমনের সুবিধার জন্য মাসে মাসে অতিরিক্ত কুড়ি টাকা প্রার্থনা করিয়া কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেন। তাঁহার আবেদনপত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি :—

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় পণ্ডিত প্রধান—
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়েষু—

গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন পণ্ডিতের সাময়িক বিজ্ঞাপন—,

ইং ১৮২৫ শালে এই সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনাকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলাম আমার শিষ্যশাখায় এই বিদ্যালয় এবং দেশে দেশে ধর্ম্মাধিকরণ শোভিত হইয়াছে ইডুকেশন গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গীয় অধ্যক্ষ মহাশয়েরা প্রায় সকলেই আমার বিদ্যাবুদ্ধি বয়স ও দুরবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন এইক্ষণে আমি এই কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্নাভাবে সপরিবারের মৃত্যু হয় কর্ম্ম করিলে পদব্রজে গমনাগমন করিতে পথমধ্যেই মৃত্যু উপস্থিত হয় উভয়থাই মৃত্যুসম্ভাবনায় মহাশঙ্কট উপস্থিত অতএব এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে আমাকে যানারোহণে গমনাগমনার্থ ২০ টাকা মাসং দিতে আজ্ঞা হয় পুস্তকাধ্যক্ষের বেতন পূর্ব্বে ৬০ টাকা ছিল সে বিবেচনায় ইহাতে অধিক ব্যয় হইতে পারে না এবং ফোর্ট উলিয়ম কালেজে বৃদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবির প্রতি এমত রীতি আছে পরন্তু আমাকে অধিক কাল পর্য্যন্ত দিতে হবে এমত বোধ হয় না অথবা সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষার্থ আমাকে নিযুক্ত করিলে ঐ বেতনে আমার যানারোহণ স্বচ্ছন্দ রূপ নির্ব্বাহ হইতে পারে অথবা সংস্কৃত কালেজের লেখকদ্বারা যেসকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে সে সকল পুস্তকের শোধনবিনা বৃথাব্যয়মাত্র অতএব ঐ সকল পুস্তকশোধনার্থ আমার তদুপযুক্ত বিশিষ্ট বেতন স্থির হয়। আমার এই নিবেদনপত্র আপনি ইংলণ্ডীয় ভাষায় শ্রীযুত দয়াময় অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের চক্ষুঃ কর্ণগোচর করিলে পূর্ব্বলিখিত যে আমার উভয়থাই মৃত্যুশঙ্কট উপস্থিত তাহার আবশ্যক নিবারণ হইতে পারে ইহাতে এই প্রাচীন বৃদ্ধ পণ্ডিতের প্রতি যেমত অনুমতি হয় বিজ্ঞাপনমিতি ইং ১৮৫১ ১৯ জুলাই—

সংস্কৃতবিদ্যালয় পুস্তকাধ্যক্ষস্য—
শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননস্য

পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষা-পরিষদের নিকট ইংরেজী অনুবাদ-সমেত আবেদনপত্রখানি পাঠাইয়া বিদ্যাসাগর মন্তব্য করিলেন :—"If his old age be taken into consideration the applicant deserves the kind attention of the Council" কিন্তু শিক্ষা-পরিষদের মন ভিজিল না, তাঁহারা ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে কাশীনাথের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসামর্থ্যসূচক মন্তব্য করিলেন।

এই ঘটনার পর দুই মাস যাইতে-না-যাইতে ৮ নবেম্বর ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথ সকল যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর* হইয়াছিল। ১০ই নবেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লিখিলেন :—

* সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ, ১ মে ১৮৫১ তারিখে কাশীনাথের বয়স ছিল "৬৩"।

I have the honor to report for the information of the Council of Education, that on the 8th Instant, Pundit Kasinath Tarkapanchanen the Librarian expired.

রচনাবলী

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার যে-কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

১। বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ। পৃ ২৮

১৮১৮ সনে রামমোহন রায় সহমরণের বিরুদ্ধে 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' প্রকাশ করিলে তাহার উত্তর-স্বরূপ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' প্রকাশ করেন, ইহাতে সহমরণের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছিল।

এই পুস্তকের কোনরূপ আখ্যা-পত্র নাই, মলাটের উপর হস্তাক্ষরে লিখিত নিম্নাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, কালাচাঁদ বসু মহাশয়ের আদেশে কাশীনাথ এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন :—

॥ নত্বা শ্রীশং বিরচিতং শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণা।
আদেশাদতুল শ্রীল কালাচাঁদ বসোরিদং॥

১৮১৯ সনের জুলাই মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে পুস্তকখানির প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা হইতেও গ্রন্থকারের নাম ও পুস্তকের প্রকাশকাল জানা যায়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন :—

On the Burning of Widows

. . a small work in defence of this practice just published in quarto without name or date, but a manuscript note on the first blank leaf informs us that it is published by *Cassee-nat h-turkubagish*, by the desire of Cala chund bhose It is in the form of a dialogue, written in Bengalee with an English Translation This work we shall carefully examine in a future Number—*The Friend of India* for July 1819, pp. 332-33

পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রে (পৃ. ৪৫৩-৮৪) এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল :—

প্রথম বিধায়কের বাক্য

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতাদ্বাপরকলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ের ব্যবস্থা দিতেছেন এমন বিষয়ে যে তোমরা প্রতিবন্ধক হও এ বড় অনুচিত

নিষেধকের উত্তর

তোমরা শাস্ত্র না জানিয়া কহিতেছ যে এ অনুচিত কিন্তু শাস্ত্র জানিলে এমন কহিবা না

বিধায়ক

আমরা শাস্ত্র জানি না ইহা তুমি কহিতেছ অতএব সহমরণ অনুমরণ বিষয় শাস্ত্র কহি শুন। অঙ্গিরার বচন ॥ * ॥ মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনং। সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ (পৃ. ১)

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের বাংলা অংশের দুইটি খণ্ড আছে।

২। A | System of Logic, | written in Sunscrit by | The Venerable Sage Boodh, | and explained in a Sunscrit commentary by | The Very Learned Viswonath Turkaluncar. | Translated into Bengalee | By | Kashee Nath Turkopunchanun. | মহর্ষি গোতমকৃত | **ন্যায়দর্শন** ; | মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারকৃত তদীয় | ভাষাপরিচ্ছেদঃ। | শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননকৃত তদীয়ার্থ সাধুভাষা সংগ্রহঃ। | **গ্রন্থনাম পদার্থকৌমুদী**। | স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা কলিকাতা মিসন মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইল। | C S. B S | Calcutta : | Printed for the Calcutta School-Book Society, | At the Baptist Mission Press, Circular Road. | 1821. | [পৃ. ১৮৫]

এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রের পর-পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের নিবাস ও গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—

শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয় ভাষাপরিচ্ছেদ। |

আবিয়াদহ গ্রামনিবাসি শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কৃতঃ গৌড | দেশ প্রচলিত সাধুভাষা রচিত, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী সম্মত, তদীয়ার্থ | সারসংগ্রহ। |

গ্রন্থনাম পদার্থ কৌমুদী

কলিকাতা নগরে মিসন মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা সন ১২২৭ শালের | চৈত্র মাসে ২ তারিকে মুদ্রিত হইল। |

রচনার নিদর্শন :—

বুদ্ধি দুই প্রকার হয় অনুভব ও স্মরণ। সেই অনুভব চারি প্রকার প্রত্যক্ষ অনুমিতি উপমিতি ও শাব্দ। এই প্রত্যক্ষাদি অনুভব চতুষ্টয়ের করণ যে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান ও শব্দ তাহার নাম প্রমাণ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় করণক যে অনুভব তাহার নাম প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষের করণ যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ব্যাপ্তি জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম অনুমিতি। সেই অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তি জ্ঞান তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। সাদৃশ্য জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম উপমিতি। সেই উপমিতির করণ যে সাদৃশ্য জ্ঞান তাহার নাম উপমান প্রমাণ। পদ জ্ঞান করণক যে অনুভব তাহার নাম শাব্দ। সেই শাব্দের করণ যে পদ জ্ঞান তাহার নাম শব্দ প্রমাণ (পৃ. ৩৭-৩৮)

৩। শ্রীশ্রীহরিঃ।—| শ্রী আদি পুরুষায় নমঃ।—| উৎপত্তি স্থিতি লয়, জগতের যাঁয় হয়, পুনর্জন্ম হরে যাঁর | জ্ঞান। অনাদি অনন্ত শান্ত, যাঁর মায়ায় জগ|দ্ভ্রান্ত, স্মরি সেই পুরুষ প্রধান। | গ্রন্থনাম **আত্মতত্ত্ব কৌমুদী**। | শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিশ্র কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীকাশীনাথ | তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধরন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি | কৃত, সাধুভাষা রচিত তদীয়ার্থ সংগ্রহ। | গ্রন্থের সংখ্যা ছয় অঙ্ক, প্রথমাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যম, | দ্বিতীয়াঙ্কের নাম মহামোহোদ্যোগ, তৃতীয়াঙ্কের নাম পাষ| ণ্ডবিড়ম্বন, চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ, পঞ্চমাঙ্কের নাম | বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষষ্ঠাঙ্কের নামে প্রবোধোৎপত্তি, এই | গ্রন্থের নাট্য-শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাশব্দের অর্থ এবং মোহবিবেকা|দির লক্ষণ তত্তৎ শব্দার্থের নির্ঘণ্টপত্রে অকারাদিক্রমে দৃষ্টি | করিয়া অবগত হইবা। পুস্তকের মূল্য ৭ মুদ্রাচতুষ্টয় মাত্র। | মহেন্দ্রলাল প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | সন ১২২৯ শাল। | [পৃ ১৮৯+শব্দার্থে নির্ঘণ্ট পত্র ৫]

'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'র রচনার নিদর্শনস্বরূপ কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :—

একি আশ্চর্য্য অজ্ঞানিলোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কিং আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময় স্বর্ণনূপুর, কুঙ্কুমের রাগ সুগন্ধি কুসুম রচিত আশ্চর্য্য মাল্য এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তাহারাদির শোভাতে শোভিতা কিন্তু ফলতঃ রক্ত মাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই এই নারী কি পরমা সুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপে দর্শন করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা তাবৎ বস্তুর বাহ্য ও অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে। (পৃ ১০০-১০১)

রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে এক খণ্ড 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' আছে। এই পুস্তক ১২৬৯ সালে 'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক' নামে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৪। মুগ্ধবোধ কৌমুদী।

২ জুন ১৮২১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই "ইস্তাহার" মুদ্রিত হয়—

মুগ্ধবোধ কৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ। গৌড় দেশীয় সাধু ভাষায় অর্থ। শ্রীবোপদেব গোস্বামির কৃত এতদ্দেশে প্রচরদ্রূপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও তৎকৃত কবিকল্পদ্রুমনামক গণের পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যেতে দুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ করা গিয়াছে।

কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থ ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রামতর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাবার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক· উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইবেক প্রতিপুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি। শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা।

এই গ্রন্থ ছাপা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমি কোথাও দেখি নাই।

৫। শ্রীশ্রীদুর্গা ॥—| জয়তি ॥—| (পাষণ্ডপীডন নামক প্রত্যুত্তর)| A | Reply, Entitled | "A TORMENT TO THE IRRELIGIOUS" | কোন ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষি কর্ত্তৃক কোন পণ্ডি- | তের সহায়তায় স্বদেশীয় লোক হিতার্থ | প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল | PREPARED AND PUBLISHED WITH THE ASSISTANCE | OF A PUNDIT, | *By a Person, wishing to defend and disseminate* | *Religious principles.* | FOR THE BENEFIT OF HIS COUNTRYMEN | সমাচার চন্দ্রিকা মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ॥ | [Printed at] the Sumachara Chundrica Press. | CALCUTTA, | 1823. | কলিকাতা সন ১২২৯ ২০ মাঘ। | [পৃ সংখ্যা ২৮৫]

'পাষণ্ডপীড়ন'-রচনার ইতিহাস এইরূপ। ৬ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনরীদের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই ছদ্ম স্বাক্ষরে এক ব্যক্তি চারিটি প্রশ্ন করেন, এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের ইঙ্গিত রামমোহন রায়কে লক্ষ্য করিয়া। ১৮২২ সনের ১১ই মে রামমোহন কর্ত্তৃক এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর প্রকাশিত হয়, উহা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে 'চারি প্রশ্নের উত্তর' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী" এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত্তর-স্বরূপ ১৮২৩ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি 'পাষণ্ডপীডন' পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র চারি প্রশ্ন, "ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানী"র উত্তর, এবং "ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী"র প্রত্যুত্তর একত্র মুদ্রিত হয়।

'পাষণ্ডপীড়ন' উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক রচিত হয়। উমানন্দন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-গোষ্ঠীর হরিমোহন ঠাকুরের পুত্র। পুস্তকে গ্রন্থকাররূপে কাশীনাথের নাম না থাকিলেও, রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে তাহার ইঙ্গিত আছে, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "আর যদি এক ব্যক্তি বহু কাল ম্লেচ্ছসেবা ও ম্লেচ্ছকে শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া এবং ন্যায় দর্শনের অর্থ ভাষাতে রচনাপূর্ব্বক ম্লেচ্ছকে তাহা বিক্রয় করিতে পারে সে আস্ফালন করিয়া অন্যরে কহে যে তুমি ম্লেচ্ছের সংসর্গ কর ও দর্শনের অর্থ ভাষায় বিবরণ করিয়া ম্লেচ্ছকে দেও অতএব তুমি স্বধর্ম্মচ্যুত হও তবে সে ব্যক্তিকে কি কহা উচিত হয়।"

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'পাষণ্ডপীড়নে'র প্রকৃত রচয়িতা কে, জানিতেন না, কিন্তু তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' "সংবাদপত্র ও দেশীয় ভাষা এবং রচনা" প্রসঙ্গে 'পাষণ্ডপীড়নে'র ভাষা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

দেওয়ানজী [রামমোহন রায়] জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না। ৺বাবু উমানন্দন ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' প্রভৃতি যে কয়েক খানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছেন।—'সংবাদ প্রভাকর', ১৩ মার্চ ১৮৫৪।

'পাষণ্ডপীড়ন' সম্প্রতি "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায়" পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। সাধু সন্তোষিণী।

মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় পাদরী লং এই পুস্তকের নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়াছেন :—

> *In 1826, the Sadhu Sant sh ne to prove that* AFFIDAVITS *on the Ganges water* are forbidden by the Hindu Law, by Kashinath Tarkapanchanan. (Long's *Descriptive Catalogue*, p 56).

এই পুস্তকখানি এখনও পাওয়া যায় নাই।

৭। শ্যামাসন্তোষণ

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'শ্যামাসন্তোষণস্তোত্র' নামে একখানি পুথি আছে। পুথিতে ইহার রচনাকাল—চৈত্র ১৭৫৬ শক (=১৮৩৫ সন) এইরূপ দেওয়া আছে :—

> রসশরমুনিচন্দ্রে রক্ষিতেহস্মিন্ শকাব্দে
> গগনগুণমিতাংশে সৌরচৈত্রে শুভাহে।
> স্তুতিবিয়মতিসাধ্বী সম্মুখাম্ভোজজাতা
> ভবতু চিরনবন্যাং

চতুর্থ পংক্তির শেষ অংশটুকু পুথিতে নাই। পরবর্ত্তী কালে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন বঙ্গানুবাদ-সমেত স্তোত্রটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে। ১ পৌষ ১৭৬৮ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'শ্যামাসন্তোষণ' পুস্তকের উল্লেখ আছে :—

> ·শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ নামক গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন যথা ·। (পৃ. ৩৮৫)
>
> বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধূতের প্রসঙ্গ লেখেন,·। (পৃ. ৩৮৭, পাদটীকা)

ভারতের মানব ও মানব-সমাজ

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি

পাশ্চাত্যে নৃতত্ত্ব-অনুশীলনের ইতিহাস

এক শতাব্দী মাত্র হইল, পাশ্চাত্য দেশে নৃতত্ত্ব বা Anthropology নামে বিজ্ঞানের একটি অভিনব শাখার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস নগরে *Societe Anthropologie de Paris* নাম দিয়া একটি নৃতত্ত্ব-সমিতি গঠিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরীতেও "এথ্‌নলজিক্যাল সোসাইটি" নামে একটি নৃতত্ত্ব-সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিদ্বয় প্রধানতঃ বিভিন্ন দেশের, বিশেষতঃ ইউরোপের বিভিন্ন জাতির, মানবের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য ও বৈষম্য বিচারপূর্ব্বক তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ ও পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই উভয় সমিতিই উদ্যমহীন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী ডারউইনের *Origin of Species* নামক যুগান্তকারী পুস্তক প্রকাশিত হইলে উক্ত উভয় সমিতিই পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। ডারউইন এবং ওয়ালেসের প্রচারিত বিবর্ত্তনবাদ নৃতত্ত্বসেবীদিগকে নূতন দৃষ্টি ও লক্ষ্য, নব উদ্যম, নব ঔৎসুক্য ও আশায় অনুপ্রাণিত করিল। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের নৃতত্ত্ব-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে নৃতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য ও সমিতির নাম লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। তখন উহার সভ্যমণ্ডলীর এক দল মূল-সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "এন্‌থ্রপলজিক্যাল সোসাইটি অব লণ্ডন" নামে একটি স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপন করিলেন।

ইহার দুই বৎসর পরে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, এডোয়ার্ড টাইলর তাঁহার *Researches into the History of Mankind* নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে বিভিন্ন অসভ্য জাতিদের রীতিনীতি, আচার ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বহুল দৃষ্টান্তদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, সভ্য মানবের বহুবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার ও ধারণা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মক্রিয়ার মূলের পরিচয় অসভ্য বা অনুন্নত জাতিদের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং ঐ সমস্ত জাতির জীবনধারা ও রীতিনীতি, সংস্কার ও বিশ্বাসের সহিত সম্যক্ পরিচয় না হইলে সভ্য মানব আপনাদিগের বহুবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস, সংস্কার ও ক্রিয়াকলাপের তাৎপর্য্য ও মূল উদ্দেশ্য যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। নৃতত্ত্বের এই প্রথম পুস্তক পাঠে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্বসেবীদের দৃষ্টির প্রসার ও অনুশীলনের ক্ষেত্রের পরিসর বৃদ্ধি হইল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌থ্রপলজিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর হাণ্ট তাঁহার অভিভাষণে এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, "অনতিবিলম্বে সামাজিক মনস্তত্ত্ব

দৈহিক নৃতত্ত্বের আলোচনার অনুগমন করিবে" ("After a time, I think, it will be found that the study of physical anthropology will be followed by researches in psychological anthropology")। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের *Anthropological Review* (Vol. V, p. LXVII) পত্রিকায় তাহার ঐ অভিভাষণটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পত্রিকাতে L'Owen Pike নিশ্চয়তার সহিত, জোর কলমে লিখিলেন, "মনস্তত্ত্বের জ্ঞান ব্যতিরেকে নৃতত্ত্বের অনুশীলন অসম্ভব" ("Without psychology, there is no anthropology")। ঐ বৎসর টাইলরের *Primitive Culture* নামক সুপ্রসিদ্ধ দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইল। তাহার পর বৎসরেই ইংলণ্ডের নৃতত্ত্বসেবী সমিতিদ্বয়, অর্থাৎ "Anthropologists" এবং 'Ethnologists", আবার পুনর্মিলিত হইল। এই সম্মিলিত সমিতির নাম হইল "এনথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অব গ্রেট ব্রিটেন"। ইহাই এখন "রয়াল এনথ্রপলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অব গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ার্লাণ্ড" নামে পৃথিবীর নৃতত্ত্ব-সমিতিগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। তখন হইতে পাশ্চাত্য দেশে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব (Prehistoric Archæology), দৈহিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) ও সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের (Social বা Cultural Anthropology) একত্রে অনুশীলন চলিতেছে।

এই প্রবন্ধে কেবল ভারতের সামাজিক নৃতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব (Social Anthropology বা Sociology) সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে সামান্য আলোচনা করিব, বিশদভাবে আলোচনা স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক নৃতত্ত্বের ভিত্তি মূলতঃ মনস্তত্ত্বের উপর অধিষ্ঠিত। মন যন্ত্রী ও সমাজ যন্ত্র। নৈসর্গিক ও সামাজিক আবেষ্টনের ও জনসংখ্যার দ্বারা সমাজযন্ত্রের নির্ম্মাণভঙ্গী ও রূপ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজযন্ত্রের সাহায্যেই ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সুকুমার কলা, ধর্ম্ম, নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল উপাদান-গুলি গঠিত হয়।

সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু

মানব-জগৎ নিরন্তর আনন্দ-বিষাদ, আশা-নৈরাশ্য, উত্থান-পতন, যুদ্ধ-দ্বন্দ্বের অবিশ্রান্ত কলরবে মুখরিত। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং কবির ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীরও কারবার এই বিশাল জগৎ-মেলার আসা-যাওয়া, ভাঙ্গা-গড়া, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, ভাবধারা, রীতি-নীতি, সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান (institutions), কার্য্যকলাপ ও অবদান লইয়া। ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার সমষ্টি-জীবনের বিবিধ সমস্যা ও বিশেষতঃ ব্যষ্টি-জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাবনা-কামনা, সাফল্য ও পরাভব, অন্তরের দ্বন্দ্ব-বেদনা, তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর সমবেদনা, সহানুভূতি ও একাত্মবোধের দ্বারা উপলব্ধি করেন, এবং তাঁহাদের রসানুভূতি ও সৃজনশক্তির সাহায্যে সমাজ-বিশেষের ও ব্যষ্টি-জীবনের বিভিন্ন দিকের বাস্তবানুগত কাল্পনিক খণ্ড চিত্র 'ভাষা দিয়া, ভাব দিয়া, আর ভালবাসা দিয়া' কলা-কৌশলে অঙ্কিত করেন।

আর জগতের রহস্যময় শ্রান্তিহীন কলরোলে উদ্বেলিত কবি-চিত্তে, বিশ্বসংসারের তরঙ্গ-আঘাত যে অনাদি সুখ-দুঃখ, গীতধ্বনি নিরন্তর বহন করিয়া আনিতেছে, কবি প্রতিভাবলে "শতলক্ষ সুরে গুঞ্জরিত" সেই বিশ্বগীতি ও "অসংখ্য ভঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত" সেই বিশ্বনৃত্যকে যথাযথ ভাবে ভাষা ও ভাবসংযোগে মূর্ত্ত করিয়া অসীমের সীমা রচনা করেন—ভাষাতীত অরূপকে রূপ দিয়া ভাষার বাঁধনে বাঁধেন। তাঁহার ঐশ আলোক-দীপ্ত মানসপটে বিশ্বনাট্যের সমগ্র চিত্রই নিত্য নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়।

বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-বিজ্ঞান-সেবী কবিসুলভ ঐশী অনুপ্রেরণার ও অপরোক্ষানুভূতির দাবী করিতে পারেন না। অন্ততঃ তাহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করেন না। আর ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের নিপুণ কল্পনাসৃষ্টিও সমাজ-বিজ্ঞান-সেবীর পক্ষে বিহিত নহে। সুতরাং তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সামাজিক তথ্যনিচয় যথাশক্তি পর্য্যবেক্ষণ ও সমাহরণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিয়া তাহার পুনঃসংযোগ ও সমাবেশের সাহায্যে মানব-সমাজের উদ্ভব, সংগঠন ও গতিপ্রকৃতি, উন্নতি ও অবনতির ধারার যথাযথ রূপ ও কারণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান। আর শৃঙ্খলাসূত্রের অনুসন্ধানে এই অসীম জগৎ-জনতার বেসুরো জটিলতার মধ্যে সুরের খোঁজ করেন।

আপাতদৃষ্টিতে যাহা মানব-জনতার অশ্রান্ত বিশৃঙ্খলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারা তাহার মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলার রহস্য ক্রমে উদ্ঘাটিত হয়, ছন্দ ক্রমে পরিস্ফুট হয়, সুর ধরা পড়ে। এই বিশ্ব-কোলাহলের মধ্যে কবি যে "অপূর্ব্ব গীতি, আলোকছন্দ" ও বিশ্ব-তন্ত্রী-নিঃসৃত "বিশ্ব-প্লাবিনী অমৃত উৎস-ধারা রাগিণী" শুনিতে পান, সমাজ-বিজ্ঞানের অনুশীলনের সাহায্যে হয়ত সেই রাগিণীর সামান্য প্রতিধ্বনি আমাদের অনুভূতিগম্য হইতে পারে।

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞানও এই বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে যে, ইহার আলোচ্য যে মানব-সমাজ, তাহাও বিশ্বশৃঙ্খলার অঙ্গীভূত, তাহাও শাশ্বত নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজ-বিজ্ঞানেরও কার্য্য বিশ্ব-সৃষ্টির অংশ-বিশেষের কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মাবলীর অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও ব্যাখ্যান। সমাজতত্ত্ব যে মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত, ভূমিকাস্বরূপ সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন।

মানবের জীবন-যাত্রার আদিম সরঞ্জাম

বিশ্ববিজয়ের জন্য অমৃতের সন্তান মানব যখন তাহার কর্ম্মক্ষেত্র এই জগতে আবির্ভূত হইল, তখন মানবের জীবন-যাত্রার আদিম সম্বল ও সরঞ্জাম ছিল কেবল তাহার শরীর ও ইন্দ্রিয়জ বোধশক্তি (senses), মন এবং কতকগুলি স্বাভাবিক সংস্কার বা প্রবৃত্তি (instincts)—যেমন আত্মপোষণ (self-maintenance) প্রবৃত্তি, যৌনপ্রবৃত্তি (sex-instinct), দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তি (pugnacity), [অনভ্যস্ত বস্তুদর্শনে] পলায়ন-তৎপরতা (instinct of flight),

ঔৎসুক্য (curiosity), সংগঠনশীলতা (constructive instinct), আত্মখ্যাপন ও আত্ম-অবনমনশীলতা (instinct of self-assertion and self-abasement), এবং অর্জ্জনস্পৃহা (acquisitiveness)।

পুনরাবৃত্তির ও অভ্যাসের ফলে সহজাত প্রবৃত্তিগুলির সহিত কতকগুলি সংশ্লিষ্ট সাড়া (conditioned reflex) জড়িত হইল। স্মৃতিশক্তির সাহায্যে ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সংস্কারগুলির অল্পাধিক রূপান্তর ঘটিল। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর মানসিক ক্রিয়ার (psychic processএর) প্রভাব বর্ত্তায়।

মানবের নৈতিক জীবনের ভিত্তি

মানব-মনের অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ এবং আবেষ্টনের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টায় সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি হয়। মনের তিনটি দিক্ বা রূপ আছে—ব্যক্ত ও জ্ঞানগত (conscious), অব্যক্ত ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন (unconscious); এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রচ্ছন্নপ্রায় মন বা মগ্নচৈতন্য (sub-conscious mind)। মানবের সহজাত সংস্কারগুলি যদিও আবহমান কাল তাহার মনের উপর ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে, তথাপি তাহারা প্রাণিজগতের অন্যান্য জীবের উপর যেরূপ আধিপত্য করে, মানবের উপর তদ্রূপ করিতে পারে না। পশুর সহজাত সংস্কার অপেক্ষা মানবের সহজ সংস্কারগুলির সংখ্যাধিক্য-নিবন্ধন ঐ সংস্কারগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে ও তাহার ফলে এক সংস্কার অপরাপর সংস্কারকে সংযমিত বা প্রতিহত করিতে পারে, এবং মানব-মনের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরিচালনা দ্বারা প্রবৃত্তিবিশেষকে নির্ব্বাচন ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবৃত্তিগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার অবসর ঘটে। সাধারণতঃ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সংগ্রাম ও জয় পরাজয় মগ্নচৈতন্যেই অভিনীত হয়। একই সহজাত সংস্কার বিভিন্ন আবেষ্টনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যেমন হঠাৎ কোন অপরূপ বস্তু বা জীব দেখিলে মানবের মনে ভয়, ঔৎসুক্য, ক্রোধ, অথবা বশ্যতার ভাব প্রভৃতি নানাবিধ প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে পারে, এবং তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্যক্তিবিশেষ এই বিভিন্ন প্রবৃত্তির মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণ ও অপরগুলিকে অল্পাধিক বা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করে।

মানব সংঘবদ্ধ হইয়া কিরূপে অজ্ঞানান্ধ সহজাত সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত পশুপ্রায় জীবন অতিক্রম করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত ও জ্ঞানালোকে আলোকিত জীবন প্রাপ্ত হয়,—হিন্দুর মনোবিজ্ঞানের ভাষায় কিরূপে অন্নময় কোষ হইতে মানব বিজ্ঞানময় কোষে পৌঁছায়,—তাহারই অনুসন্ধান নৃতত্ত্বের কার্য্য।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলির মূল লক্ষ্য আত্মসংরক্ষণ। আত্মসংরক্ষণকল্পে মানবের সহজাত এই সংস্কারগুলি তাহার আত্মশক্তির অপচয় কিংবা অপরের ক্ষতিবৃদ্ধির দিকে

দৃষ্টিপাত করে না। বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষকে তাহার শক্তির মিতব্যয়িতা সাধনে তৎপর করে এবং সংযত অথচ প্রশস্ত জীবনযাত্রার পথ নির্দ্দেশ করে।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—'আত্মসংরক্ষণকারী' প্রবৃত্তি (self-maintaining instincts) এবং 'সমাজ-সংরক্ষণকারী' প্রবৃত্তি (group-maintaining instincts)। আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক, এবং সমাজ-সংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি সহযোগমূলক।

আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে আত্মপোষণ প্রবৃত্তি, আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি হইতেছে মৌলিক প্রবৃত্তি, এবং যৌন প্রবৃত্তির আনুষঙ্গিক লজ্জা, ঈর্ষা ও আত্মপ্রদর্শন ও শিশুলালন প্রবৃত্তি প্রভৃতি গৌণ প্রবৃত্তি। আত্মপ্রাধান্যস্থাপন, [স্বত্ববোধের মূলীভূত] অর্জ্জন-লিপ্সা, ভয়, বিবাদপ্রিয়তা [যাহা হইতে যুদ্ধপ্রিয়তা, এমন কি, মৃগয়া-প্রিয়তাও জন্মে] এইগুলিও আত্মসংরক্ষণশীল প্রবৃত্তি।

দলসংগঠনপ্রবৃত্তি ও তাহার আনুষঙ্গিক অনুকরণপ্রবৃত্তি, ইঙ্গিত-অনুসরণ-প্রবণতা, বশ্যতা, ভক্তি ও আত্মোৎসর্গ, যৌথ-ক্রীড়া প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি "দলসংরক্ষণকারী"।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর সংস্কারগুলি মানুষকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে। সমাজ-ধর্ম্মের ও নীতিধর্ম্মের প্রধান কার্য্য—এই সংস্কারনিচয়ের সুব্যবস্থিত পরিচালনা ও সংযমন দ্বারা মানবজীবনের ও সমাজের উৎকর্ষসাধন।

আত্মরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলি দলরক্ষণশীল প্রবৃত্তিগুলির মূলতঃ কতকটা বিরোধী হইলেও পরস্পরের সহায়ক হইয়া জাতি বা সমাজ সংরক্ষণের উপযোগী হইতে পারে। সমকক্ষতা-প্রিয়তা এবং আত্মনির্ভরশীলতা, এই উভয় প্রবৃত্তিই কার্য্যতঃ মানবসমাজের উন্নতি-বিধায়ক হইতে পারে।

যখন মানবের জীবনযাত্রার উপযোগী দৈহিক পরিবর্ত্তন ও ক্রমপরিণতি স্থগিত হইল, তখনই আরম্ভ হইল মানসিক ক্রমোন্নতি। অপরাপর কতকগুলি জন্তুর দেহ অপেক্ষা মানবদেহ হীনবল হইলেও মানসিক অভিব্যক্তির সাহায্যে মানবদেহ নব শক্তিতে বলীয়ান্ হইতে লাগিল। বুদ্ধিবলে অস্ত্রাদি উদ্ভাবন করিয়া মানব তাহার বাহুর বল বহুগুণ বর্দ্ধিত করিল। আর কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ-দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়া জড়-জগৎ ও জীবজগতের উপর কতকটা প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইল।

পরস্পরের সংস্পর্শে বিভিন্ন ব্যক্তির মগ্নচৈতন্যে একজাতিত্ব-বোধ বা স্বজাতি-চেতনা জাগ্রত হইল, আর পরস্পরের সংসর্গে মানব-মনের স্বাভাবিক সংস্কারগুলি রস-সমন্বিত হইয়া চিত্তবৃত্তি বা হৃদয়াবেগ রূপে সাড়া দিল, যেমন যৌনপ্রবৃত্তি হইতে অনুরাগ বা প্রেম, পলায়নপ্রবৃত্তি হইতে ভয়, ঔৎসুক্য হইতে বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা, বিরুদ্ধতা হইতে ক্রোধ, ইত্যাদি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত একাধিক চিত্তবৃত্তি একত্র সংযুক্ত হওয়ায় মানবের ধীশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের অবকাশ

উপস্থিত হইল। ইহা হইতে ব্যক্তিত্বের ও নৈতিক স্বাধীনতার উদ্ভব হইল। ইহাই মানবের নৈতিক জীবনের ভিত্তি।

মানবের সহজাত সংস্কারগুলির সাহায্যে কেবল ইন্দ্রিয়বোধগম্য জগতের সহিত প্রথম পরিচয় ও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, আর চিত্তবৃত্তিগুলি মানবকে ভাব-সংযোগে মানস জগতের সহিত মিলনের বিচিত্র অনুভূতির আস্বাদন দান করিল। মানবের সহিত মানবের নানাবিধ সম্বন্ধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়া সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হইতে লাগিল।

মানব-সমাজের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়

'সমাজ' শব্দের অর্থ, অমরকোষের মতে, "পশুভিন্নানাং সংঘঃ"। প্রকৃতপক্ষে 'সমাজ' কেবল ব্যক্তিসমষ্টি মাত্র নহে, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ও উচ্চতর বস্তু। সমাজের জীবন তাহার অতীতের ও বর্ত্তমানের ভাবধারা, চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারায় পরিপুষ্ট হইয়া তাহার ভবিষ্যতের নিয়ামক হয়। সংগঠনই সমাজের আত্মা। সংগঠনের ফলে সমাজের পরিচালন-ক্ষমতা জন্মে, শক্তি সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হয়, কার্য্যবিভাগের ফলে শক্তির, উপকরণের ও সময়ের অপচয় নিবারিত হয়। জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) যথার্থই বলিয়াছেন, "সমাজের মধ্যেই মানুষ মানুস হয়", অর্থাৎ পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উন্নীত হয়। "Man only becomes man among men" বস্তুতঃ সমাজের অঙ্গীভূত বলিয়াই ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট ও রূপায়িত হয়।

মানবের সুদূরতম অতীতের যাহা কিছু নিদর্শন ভূগর্ভ, নদীগর্ভ, গিরিগহ্বর প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, মানব-জীবনের প্রাক্কালেই আদিমানব জীবনীশক্তির অন্তঃপ্রেরণায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধভাবে খাদ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত। সংঘবদ্ধ জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতকটা ত্যাগ করিতে হয়, আর স্বেচ্ছায় কেহ সে ত্যাগ স্বীকার করে না. এজন্য অনুমান হয় যে, দলবদ্ধ হইয়া থাকিবার বাসনা মানবের সহজাত নহে। সভ্যতার ইতিহাসের যত গোড়ার দিকে যাওয়া যায়, ততই সংঘের ক্ষুদ্রতা ও জটিলতার ন্যূনতা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, লাটিন ভাষায় 'অপরিচিত ব্যক্তি' এবং 'শত্রু' এই দুই অর্থে একই বাক্য (*hostis*) ব্যবহৃত হয়।

সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, অসহায় আদিম অবস্থায় জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার অনিবার্য্য প্রেরণায়,—বিচার বা চুক্তি দ্বারা নহে,—আদিম মানবের আংশিক বিরোধমূলক সম্বন্ধও অজ্ঞাতসারে সহযোগিতায় পরিণত হইয়া স্থায়ী সঙ্ঘ বা 'সমাজ' গঠিত হইয়াছিল।

কেবল আত্মপোষণ ও আত্মসংস্থিতি (self-perpetuation), এই দুই প্রবৃত্তির প্রণোদনেই আদিম মানবের সমাজ উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। এই প্রবৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার প্রচেষ্টায় খাদ্যসংগ্রহ ও শ্রমসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপন (economic and industrial organization) ও পারিবারিক সংগঠন প্রভৃতি মূল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিতে পারে। সমাজের জনসংখ্যার সহিত উপজীব্যের সামঞ্জস্য সাধনকল্পেই স্বত্বের উৎপত্তি

এবং বিবাহ-ব্যবস্থা, দায়ভাগ ও দণ্ডবিধির উৎপত্তি হয়। যদিও আদিম মানব-সঙ্ঘগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ পারিবারিক স্বাতন্ত্র্য ছিল না, ক্রমে তাহা ধীরে ধীরে উদ্ভূত হইল।

আদিম সমাজবন্ধনের একটি প্রধান উপাদান বা সহায় ছিল—আধিভৌতিক ভীতি। মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির দর্শনে এবং অন্যবিধ অলৌকিক ঘটনার অনুভূতি হইতে ভয় জন্মে। ভয়ে মানুষ পরস্পরকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়, আর ভয়ের কারণ নিরাকরণের জন্য সম্মিলিত হইয়া যাদু ও ধর্ম্মক্রিয়ার উদ্ভাবন ও অনুসরণ করে। সান্নিধ্য ও সাদৃশ্যজনিত মানসিক সংযোগের (associationএর) নিয়মানুসারে আদিম সমাজে যাদুক্রিয়ার উদ্ভব হইল।

আদিম মানব প্রাকৃতিক শক্তির সমগ্রভাবে ধারণা করিতে অসমর্থ হওয়ায় উহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখে এবং বহুবিধ স্বতন্ত্র দৈবশক্তির কল্পনা করে ও তাহাদিগকে মন্ত্রতন্ত্রের বলে বা কৌশলে বশীভূত অথবা স্তবস্তুতি ও নৈবেদ্য বা বলি দ্বারা প্রীত করিতে প্রয়াস পায়।

ক্রমে নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক শক্তির প্রভাবে মানব-জীবনের ও মানব-সমাজের আদিম সরঞ্জামগুলি পরিবর্দ্ধিত, সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইল। যখন মৌলিক প্রয়োজন সাধনোপযোগী প্রবৃত্তিগুলির প্রণোদনে জীবনোপায়ের মূল প্রতিষ্ঠানগুলি (maintenance-institutions) গড়িয়া উঠিল, তখন আত্ম-প্রীতিসাধক প্রবৃত্তিগুলি (impulses to self-gratification) জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল হইতে লাগিল। আত্মপ্রশ্রয়, আত্ম-গর্ব্ব ও আত্ম-খ্যাপনের (self-assertion) উপায়-স্বরূপ বেশভূষা, অলঙ্কারাদি, যুদ্ধ ও ক্রীড়াদি, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার, শিল্প, চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীতাদি ও অন্যান্য চারুকলার উদ্ভব হইল। যদিও সৌন্দর্য্যস্পৃহা ও সুকুমার কলা সমাজের পোষণ ও রক্ষণের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় নহে, তবু ইহাদের প্রণোদক প্রবৃত্তিগুলি এত প্রবল যে, তাহার জন্য মানব প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এই প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে মানবমনের শক্তি ও উদ্যমের অদ্ভুত প্রকাশ দেখা যায়। আত্ম-গর্ব্ব অহঙ্কাররূপে পরিশুদ্ধ হইয়া ব্যক্তিত্বের ও শ্রেণীর বা জাতির বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সূচিত করে, এক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলে অপর আকাঙ্ক্ষা আসে ও ক্রমে আদর্শ-প্রবণতা জন্মে। এইরূপে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, প্রকৃতি ও চরিত্র, নীতি, ধর্ম্ম ও শাসন-প্রণালী, সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞানের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হইল।

মোটের উপর সহযোগিতা এবং আত্ম-বিস্তৃতির বা মিলনের আকাঙ্ক্ষাই মানব-সমাজের মূল সুর—প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সহিত মিলন বা সামঞ্জস্য সাধন, মানুষে মানুষে মিলন, সমাজে বৈষম্যের মধ্যেও সাম্য স্থাপন ও আধিভৌতিক জগতের সহিত ঐকতান স্থাপনের প্রচেষ্টাতেই সমাজের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়। এই মিলন, সাম্য বা ঐকতান যত নিবিড় ও গভীর হইতে থাকে, সমাজও তত উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়।

ধর্ম্মনীতি ও রাষ্ট্র-সংহতি সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন কোন সমাজের উপর ধর্ম্মের

প্রাধান্য অধিক, যেমন হিন্দু সমাজে, আর কোন কোন সমাজে রাষ্ট্রের প্রাধান্য অধিক, যেমন সাধারণতঃ পাশ্চাত্য সমাজে।

নৈতিক জীবনের উদ্ভব ও পরিণতি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মানবের সহজাত সংস্কারগুলির সংখ্যাবহুলতা মানব-জীবনের মূল্যবান্ সম্পত্তি। ইহারা পরস্পরকে সংযত করিয়া জীবন নিয়মিত করিতে পারে। আর ইহাদের সংখ্যাধিক্যের জন্যই মানবের ইচ্ছা-শক্তি প্রথমে কার্য্যকরী হয় ও সদসৎ বিচার-পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে হিতকরী বা সৎ প্রবৃত্তি নির্ব্বাচন ও অহিতকরী বা অসৎ প্রবৃত্তি পরিহার করিতে পারে। মূল প্রবৃত্তিগুলি লইয়া হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন জাতি ও সমাজ বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং সেই অভিজ্ঞতানুযায়ী বিভিন্ন জীবনধারা অবলম্বন করিয়াছে। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সাহায্যে বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপনের বিভিন্ন পন্থা অনুযায়ী বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি বা সভ্যতা বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। আদিম সমাজে যুবক-যুবতীদের দীক্ষা ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদিগকে স্ব-স্ব সমাজের আদর্শানুযায়ী জীবন ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করে।

অভ্যাস,—নৈতিক জীবনের প্রারম্ভ।—পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তিনিচয়ের তাড়না হইতে আত্মরক্ষার জন্য অবস্থাবিশেষে মানব-মন প্রবৃত্তিবিশেষকে অনুসরণযোগ্য বলিয়া মনোনীত করে; পরে অনুরূপ অবস্থায় সেই প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, এইরূপে উহা অভ্যাসে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত অভ্যাস উত্তরাধিকার-সূত্রে বর্ত্তায় না। কিন্তু সমাজগত অভ্যাস বংশপরম্পরার উপর প্রভাব বিস্তার করে। পিতামাতার শিক্ষা ও শাসন, সমাজের ভয় ও পূর্ব্বপুরুষদের ভয়, দেবতাদের ভয় ও ঋদ্ধি বা সৌভাগ্য অর্জ্জনের স্পৃহা, এই সমস্ত শক্তির প্রভাবে সমাজানুমোদিত অভ্যাসগুলি বদ্ধমূল হয়। প্রচলিত সামাজিক অভ্যাসগুলিকেই সামাজিক রীতিনীতি বা আচারধর্ম্ম বলা হয়। এই রীতিনীতিই মানবসভ্যতার প্রথম অবস্থার নীতিশাস্ত্র। এই ব্যাবহারিক বিধিনিয়মের সামান্য ব্যতিক্রমও সমাজে দণ্ডার্হ হয়। আদিম সমাজে আত্ম-সমালোচনা বিশেষভাবে জাগ্রত হয় নাই। পুরুষানুক্রমিক আচার-ব্যবহারই সনাতন ধর্ম্মরূপে অবশ্যপালনীয়। উহার কোন দফায় কোন ত্রুটি বা অভাব থাকিতে পারে, এই ধারণা মনে অস্পষ্টভাবে জাগ্রত হইলেও, কেহই তাহার সংশোধনের প্রয়াস পাইতে সাধারণতঃ সাহসী হয় না।

আইন ও ধর্ম্ম।—প্রচলিত রীতিনীতিই আদিম সমাজে আইনের পদাভিষিক্ত হয়। প্রত্যেক আদিম সমাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নেতার প্রভাব দৃষ্ট হয়। নেতার বা সমাজের প্রভুত্ব ও শাসন প্রত্যেক পরিবারে পিতামাতার প্রভুত্ব ও শাসনের স্থান অধিকার করে। আদিম সমাজে শৈশব কাল হইতে মানব আদেশানুবর্ত্তিতাতে এরূপ অভ্যস্ত হয় যে, সামাজিক আচারনীতি তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক অথবা ঐশ বিধিনিয়ম বলিয়াই

প্রতীত হয় ; আর তাহার ব্যতিক্রম অচিন্তনীয়। বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমের জন্য প্রকৃতিদেবী অথবা দেবতারা অবশ্য শাস্তি দিবেন, এই বিশ্বাস তাহাদের মনে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ। স্বগোত্রে যৌন সম্বন্ধ বর্জ্জন, স্বগোত্রীয়ের প্রাণহননকারীর বিনাশ-সাধন, তাহাদের নিকট এরূপ স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি সমাজ সৃষ্ট নীতিমাত্র, এ ধারণা তাহাদের কল্পনাতেও স্থান পায় না। বস্তুতঃ যত দিন পর্য্যন্ত উচ্চনীচভেদবিহীন (classless) আদিম (tribal) সমাজের স্থলে উচ্চনীচ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও রাজশক্তির উদ্ভব না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত সামাজিক বিধিনিষেধ ও দণ্ডনীতি ধর্ম্মের অংশীভূত বলিয়া গণ্য হয়। অনেক স্থলেই এক হিসাবে আইন অপেক্ষা ধর্ম্ম অধিকতর শক্তিশালী ও সংযমনক্ষম। আদিম সমাজের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্মের নিষেধ (taboo) অমান্য করিলে দৈব অভিশাপ ও দুর্ভাগ্য অনিবার্য্য, সমাজের বা গোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষের পাপে, অর্থাৎ সামাজিক বিধি-লঙ্ঘনের ফলস্বরূপ সমগ্র সমাজ বা গোষ্ঠী পাপী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, অপবিত্র ও কলুষিত হয় ও দৈব দণ্ডে দণ্ডার্হ হয়। সুতরাং সমাজের বা গোষ্ঠীর অপরাধ ক্ষালনের ও পবিত্রতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বহিষ্করণ করাই বিধি। আদিম সমাজে সনাতন আচারবিধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুষ্ঠানের অলংঘ্যতা ও পবিত্রতার ধারণাই আদিম সমাজের আচার-নিষ্ঠতা ও রক্ষণশীলতার মূল কারণ।

আদিম সমাজের ধর্ম্ম-জীবন কেবল নিষেধ-নীতিতে (tabooতে) পর্য্যবসিত হয় না, তাহাদের বিশ্বাস যে, এই নিষেধ-নীতি-প্রসূত সংযমের ফলে নিগূঢ় শক্তি ('mana') অর্জ্জন করা যায়, আর ঐ শক্তি সংক্রামক, এবং উহার প্রভাবে আদিম সমাজগুলি স্ব-স্ব সৌভাগ্য বা ঋদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। এই বিশ্বাস আদিম সমাজগুলির মনে নিশ্চিন্ততা ও বল প্রদান করে। পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের জ্ঞান ও দেবানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সমস্ত বিধিনিষেধের বিধানপূর্ব্বক স্বজাতির কল্যাণের ও শক্তি সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন, এই ধারণায় তাঁহাদের প্রতি সমধিক ভক্তিমান্ হয়। এই দৈবী শক্তির বর্ম্মে আবৃত হইয়া আদিম জাতিরা জীবনসংগ্রামে বলীয়ান্ হয়। কিন্তু এই বর্ম্ম একেবারে স্থিতিস্থাপকতাবিহীন।

আদিম সমাজের ন্যায়-অন্যায় বোধ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান এবং সভ্য মানব অপেক্ষা আদিম মানবের মনের উপর সদসৎ বিবেকের প্রভাব সমধিক প্রবল হইলেও, তাহাদের ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শ অনমনীয়, এজন্য তাহাদের স্বাধীন চিন্তার স্থান বা ক্রিয়া-ক্ষেত্র নাই বলিলেই চলে। নির্দ্দিষ্ট বিধি-নিয়মের তিলমাত্র অন্যথাচরণ করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, নূতন বা অনভ্যস্ত আচরণে মানুষকে অশুচি করে ও তজ্জন্য তাহার সংস্পর্শ অপরকেও অশুচি করিতে পারে বলিয়া ঐরূপ কদাচারী ব্যক্তি সমাজে পরিত্যাজ্য। আদিম সমাজ ব্যক্তিবিশেষের আচরণের উদ্দেশ্য বিচার করে না, স্বাধীন চিন্তা, ও আচরণের প্রশ্রয় প্রদান করে না। কেবল অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, সাহস, বদান্যতা প্রভৃতি সাধারণ গুণের উৎকর্ষ অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে দলপতি বা সমাজনেতা মনোনীত

করা হয়, এবং কালক্রমে অনেক স্থলে উত্তরাধিকারিসূত্রেও দলপতির পদ বর্ত্তায়। এই সমস্ত সমাজ-নেতা সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে সমাজকে স্ব-স্ব পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেও, অপ্রত্যাশিত সঙ্কট হইতে সমাজের উদ্ধারের জন্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন অন্যবিধ নেতার প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিশিষ্ট নেতা দৈবশক্তির সহিত কারকারবারের জন্য জনসাধারণ হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে ও আভ্যন্তরীণ জীবনের দিকে মনোনিবেশ করে। এই জন্য ইহাদেরই স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের সুবিধা হয়। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও বিকাশ হইতেই সভ্যতার স্ফুরণ ও উন্নতি হয়। চিন্তাশীল স্বাধীনচেতা ব্যক্তিই সমাজের প্রকৃত নেতৃত্বের উপযোগী। কিন্তু সেরূপ ব্যক্তি আদিম সমাজে বিরল, এবং সভ্য সমাজেও প্রচুর নহে।

সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি

সভ্যতার উন্নতির অনুপাতে সমষ্টিজীবনের যোগসূত্র ও পরিসর বৃদ্ধি হয়, পরস্পরের কর্ত্তব্যের ও দায়িত্বের বন্ধনও দৃঢ় হয় ও গুণভেদে প্রত্যেকের অধিকার নির্ণীত হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোন কার্য্য করিতে গেলে নেতার প্রয়োজন হয়। আন্দামান দ্বীপবাসী মিনকোপি জাতির বা লঙ্কাদ্বীপের বেদ্দা জাতির ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা আদিম সমাজে নেতা নির্ব্বাচন করার রীতি বিরল, অপেক্ষাকৃত সুচতুর ব্যক্তি স্বতঃই দলনেতা হইয়া দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে নির্ব্বাচন দ্বারা বুদ্ধিতে, বয়সে ও অভিজ্ঞতায় এবং কোন কোন স্থলে বংশ-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে দলপতি বা নায়ক নিযুক্ত করা হয়।

মৃগয়ার জন্য অথবা পশুচারণের জন্য প্রত্যেক মানব-সঙ্ঘের স্ব-স্ব কর্ম্মক্ষেত্রস্বরূপ বিভিন্ন জঙ্গলে বা অধিকৃত ভূমিতে ক্রমে স্ব-স্ব অধিকার বা স্বত্ববোধ জাগ্রত হয়। প্রথমে এই স্বত্ব ছিল অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ স্বত্ব, ক্রমে হইল যৌথ স্বত্ব, তাহা অবশেষে পরিণত হইল বিভিন্ন নির্দ্দিষ্ট অংশে ব্যক্তিগত স্বত্বে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আদান-প্রদানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূচনা হইতে লাগিল। প্রথমে পণ্যবিনিময়, পরে শস্য বা গৃহপালিত পশুপক্ষী, বস্ত্রাদি বা অন্য কোন দ্রব্য (যেমন আসাম-বর্মার সীমান্ত প্রদেশে কোথাও কোথাও পেটা ঘণ্টার আকারে পিত্তলের চাকতি) বিনিময়ের বাহনস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পরে বিভিন্ন প্রাচীন দেশে মুদ্রা ও চীনদেশে প্রথম কাগজের 'নোট'এর উদ্ভব ও প্রচলন হইয়াছিল। বাণিজ্য ও সম্পত্তি বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আর্থিক বৈষম্য ও ধনি-দরিদ্রে সম্প্রদায়ভেদ উপস্থিত হইল।

কালক্রমে যখন বিভিন্ন মানব-সঙ্ঘের গতানুগতিকভাবে কার্য্য-ব্যবস্থা ও জীবন-প্রণালী গতিহীন হইয়া পড়ে, মানসিক জড়তা আসিয়া প্রগতির পথ রুদ্ধ হয়, জীবন-সঙ্গীতের সুর কাটিয়া যায়, তাল ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে, এরূপ সময় অনেক স্থলে দেখা যায় যে, এক বা একাধিক নবাগত জাতির বা সমাজের সংস্পর্শের ফলে ঐ স্থিতিশীল সমাজের

নবচেতনা আসে, ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা উদ্দীপিত হয়। মানবসমাজের প্রকৃত উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমাজানুবর্ত্তিতা, উভয়েরই পুষ্টি অবশ্য-প্রয়োজনীয়। সমাজের কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি অভ্যস্ত বিধিনিষেধের তুলনামূলক বিচার দ্বারা তাহাদের আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হন ও অনেক সময় তাহাতে কৃতকার্য্য হন, আর আগন্তুকদের সমস্ত রীতি-নীতি, মত ও বিশ্বাস অনুমোদন না করিলেও তাহাদিগকে তাহা মানিয়া চলিতে দিয়া এবং নিজেরাও আগন্তুক জাতির কোন কোন বিশেষ প্রথা, আচার বা মত আপন সমাজে গ্রহণ করিয়া উদারতার পরিচয় দেন। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণই উন্নতিশীল সমাজের লক্ষণ। এইরূপে নৈতিক স্বাধীনতার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চলিতে থাকে। বিভিন্ন জাতি বা সংস্কৃতির দ্বারা আনীত নূতন ভাব, চিন্তা ও রীতিনীতির সংস্পর্শে স্বাধীন চিন্তা জাগ্রত হইলে দেখা যায় যে, একাধিক মনীষাশালী পুরুষ স্বীয় সমাজে নূতন ভাবধারা, নূতন আদর্শ ও শক্তি আনয়ন করেন ও সময়ের অনুপযোগী কোন কোন বিধিনিষেধের পরিবর্ত্তন সাধন ও নূতন নিয়ম বা প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া সমাজের উন্নতির গতি উন্মুক্ত করিয়া দেন। এইরূপ এক বা একাধিক পুরুষসিংহের সাময়িক আবির্ভাবের অভাবে যে সঙ্ঘগুলি সময়োপযোগী সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আপনাদিগকে নূতন সামাজিক আবেষ্টনীর সহিত সমীকরণ করিতে সমর্থ না হয়, তাহারা .জীবন-সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইয়া ধ্বংসোন্মুখী হয়; ইহা কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। যেমন সমাজের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও পরিপুষ্টি হয় ও মানুষ গড়িয়া উঠে, তেমনই আবার বিশেষ বিশেষ শক্তিমান্ মানুষই স্বীয় সমাজকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে।

সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে বা সংমিশ্রণে যে সঙ্ঘগুলির উন্নতির গতি উন্মুক্ত ও বেগ বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেক স্থলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন গ্রামের স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্ত্তে, সঙ্ঘে সম্মিলিত এক বা একাধিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন গ্রাম-নেতাদের নেতৃত্বে ক্রমে ক্রমে ঐরূপ রাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসন লুপ্ত হয়। রাজশক্তি এক বা একাধিক নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং সামন্ত বা অভিজাত-বংশের উদ্ভব হয়। অনেক স্থলে জায়গীর-প্রথা (feudalism) প্রবর্ত্তিত হয়। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভাগ বৃদ্ধি হয়। অনেক স্থলে দাস শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শ্রমশিল্পের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্তর পরিবর্ত্তন বা গতিশীলতা (class-mobility) উপস্থিত হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি স্ব-স্ব শক্তি বা যোগ্যতা অনুসারে নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং কেহ কেহ যোগ্যতার অভাবে উচ্চতর শ্রেণী হইতে নিম্নতর শ্রেণীতে অবনমিত হয়। অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশে যদিও উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদ বর্ত্তমান, তথাপি প্রায় সর্ব্বত্রই ঐ শ্রেণীবিভাগ এইরূপ গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল। তবুও এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অসাম্যের জন্য তথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে বিভিন্ন রাষ্ট্রতান্ত্রিক মতের মধ্যে—যেমন ধনসাম্যবাদ,[১] বিপ্লবী সাম্যবাদ,[২] বিপ্লববাদ,[৩] সমাজতন্ত্রবাদ,[৪] গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রবাদ,[৫] গণতন্ত্রবাদ,[৬] প্রজাতন্ত্রবাদ,[৭] সঙ্ঘবদ্ধ

শ্রমিক সমাজতন্ত্রবাদ,[৮] এক-নায়কত্ববাদ,[৯] ধনতান্ত্রিকতা,[১০] রাষ্ট্রচালিত ও রাষ্ট্রপরিকল্পিত ধনতন্ত্রবাদ,[১১] অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও ব্যক্তিগত বণ্টননীতি[১২] এবং শ্রেণীগত বৈষম্যহীন সমাজ বা শ্রেণীহীন সমাজ।[১৩]

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ভারতে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন স্তরের জন-সমষ্টি লইয়া বৈষম্যের মধ্যে এমন সাম্যবিশিষ্ট শাশ্বত ধর্ম্মাশ্রিত রাষ্ট্র ও সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, ভারতে এ সমস্ত সমস্যার উদয় এত কাল হয় নাই। কিন্তু প্রায় এক সহস্র বর্ষ যাবৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারাইয়া ও গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন করিবার পরে সম্প্রতি প্রায় দুই শত বর্ষ যাবৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এখন এইরূপ সমস্যার আবির্ভাব হইতেছে। আমাদের সমাজের গতিশীলতা ক্রমে প্রায় বিলুপ্ত হওয়াতে এই সব সমস্যা সম্প্রতি ঘনীভূত হইতেছে।

ভারত-সমাজের বিভিন্ন উপাদান

যুগে যুগে ভারতমাতা নানা জাতিকে সম্তাননির্ব্বিশেষে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির বিচিত্র সুরের ধারা এখনও ভারত-শোণিতে ধ্বনিত রহিয়াছে।

সর্ব্বসমন্বয়কারিণী ভারতমাতা এই সমস্ত বিভিন্ন সুরের যথাসম্ভব ঐকতান সাধন করিয়া এক অনন্যসাধারণ মহিমামণ্ডিত বিশাল হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের ভাবনা, সাধনা ও সুচিন্তিত ব্যবস্থার ফলে বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে মহান বিচিত্র হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাহার প্রভূত অবনতি ঘটিলেও তাহার বহুযুগব্যাপী সজীবতা, বিশিষ্টতা, বিশিষ্ট রূপ ও বিশিষ্ট উচ্চ আদর্শ প্রণিধানযোগ্য। প্রাচীন ভারতে এক বিরাট্ সমাজে বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একতানের, বহুত্বের মধ্যে একত্বের যে বিচিত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছিল পৃথিবীতে অন্য কোথাও তাহা দেখা যায় নাই।

নিম্নে ভারত-সমাজের বিভিন্ন মৌলিক জাতীয় উপাদানের যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতেছি, ইহা হইতে এ ধারণা ভুল হইবে যে, বর্ত্তমানে ভারতের কোন জাতি নিছক অমিশ্র 'নর্ডিক-আর্য্য' বা অমিশ্র 'আল্পাইন-আর্য্য,' বা অমিশ্র 'প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড' বা অমিশ্র 'ইন্দো-মেডিটেরানিয়ান' বা অমিশ্র 'মঙ্গোলিয়ান'। বস্তুতঃ ভারতে বা জগতে অমিশ্র জাতির অস্তিত্ব বহুকাল যাবৎ লোপ পাইয়াছে, হয়ত আণ্ডামানদ্বীপবাসী নেগ্রিটোদের ন্যায় দুই

১। Communism, ২। Revolutionary Communism; ৩। Bolshevism; ৪। Socialism; ৫। Democratic Socialism; ৬। Democracy; ৭। Republicanism; ৮। Syndicalism; ৯। Fascism; ১০। Capitalism, ১১। State-controlled and State-planned Capitalism; ১২। Economic democracy and Individual appropriation; ১৩। Classless Society.

একটি মাত্র জাতি খানিকটা অমিশ্র অবস্থায় আছে। এ প্রবন্ধে কেবল জাতি-বিশেষের আনুমানিক মৌলিক উপাদান (radical element) হিসাবে 'নর্ডিক', 'আল্‌পাইন' প্রভৃতি নামে তাহাদিগকে অভিহিত করিয়াছি।

ভারতের বিলুপ্ত নেগ্রিটো-প্রায় জাতি

আধুনিক পণ্ডিতদের গবেষণার আলোকে যখন ভারতের তমসাচ্ছন্ন সুদূরতম অতীতের যবনিকা অপসারিত হইল, তখন পাওয়া গেল, দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতে কতকগুলি অমার্জ্জিত প্রস্তরায়ুধ এবং সামান্য কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক গুহা-চিত্র। ঐগুলি ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসীদের নিদর্শন বলিয়া সুধীসমাজে গৃহীত হইয়াছে। আর দক্ষিণ-ভারতে কাডার, পুলায়া, উরালি প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় দুই চারিটি বন্য অসভ্য জাতির মধ্যে অল্পসংখ্যক খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণকায়, অনুন্নতনাসিকা ও উর্ণাসদৃশ, কেশ-যুক্ত ব্যক্তির দেহাবয়ব দেখিয়া ও তাহাদের পরিমাপ লইয়া কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন যে, উহাদের ধমনীতে এখনও নেগ্রিটো-রক্তের ক্ষীণ ধারা বহিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, ভারতের সর্ব্বপ্রথম অধিবাসী ছিল এক বা একাধিক নেগ্রিটো জাতি। আসামের কোনিয়াক নাগাদের মধ্যেও নেগ্রিটো-শোণিতের ক্ষীণ ধারা বর্ত্তমান, এই মর্ম্মে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গৌহাটী অনুসন্ধান-সমিতিতে ডাঃ হাটনের একটি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। * উত্তর-ভারতে ও বাংলা দেশেও এক সময়ে ঐ নেগ্রিটো জাতির অবস্থিতি অসম্ভব নহে। যদি কাডার প্রভৃতি জাতির অথবা আণ্ডামানের কিংবা মেলেনেসিয়ার আধুনিক নেগ্রিটো জাতিদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ভারতের বিলুপ্ত নেগ্রিটো-সমাজের অবস্থা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বন্য ফল-মূল আহরণ এবং মৃগয়া ও মৎস্য-শিকার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। তাহাদের মধ্যেও দল-নেতা ছিল, যৌন সম্বন্ধ বিধি-নিয়মের দ্বারা নিয়মিত হইত, মৃতদেহ সংকারের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং পরলোকে বিশ্বাস ও ভূতের ভয় ছিল। হিন্দুর সমাজ-বিজ্ঞানের গুণ-বিভাগ অনুসারে উহারা তমোগুণ-প্রধান জাতি ছিল। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান ভারতের সংস্কৃতিতে ঐ বিলুপ্ত নেগ্রিটো জাতি কোনও ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, এরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। ডাক্তার হাটন বলেন যে, অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা এবং তীর-ধনুকের ব্যবহার এই নেগ্রিটো জাতির দান। কিন্তু তীর-ধনুর ব্যবহার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসী ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আদিম মানবের

* ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের *Man in India* পত্রিকায় ২৫৫-২৬২ পৃঃ "A Negrito Substratum in the Population of Assam শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে প্রচলিত থাকার প্রমাণ আছে। আর অশ্বত্থবৃক্ষের পূজা আওামানিজ্ম* প্রভৃতি বর্ত্তমান নেগ্রিটোদের মধ্যে দেখা যায় না।

ভারতের দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড জাতি

এই অধুনাবিলুপ্ত কৃষ্ণকায় নেগ্রিটো জাতির জীবন-নাট্য অভিনয়ের শেষভাগে ভারত-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল—প্রস্তরের অস্ত্রাদি হস্তে বর্ত্তমান মুণ্ডা, ভীল, সাঁওতাল, ওরাঁও-খণ্ড-গন্দ প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্বজরা। ইহারা সম্ভবতঃ ছিল • ককেশীয় জাতির একটি অধস্তন শাখা।† ইহাদের বংশধরেরা বর্ত্তমানে 'কোল', 'ধাঙ্গড়' প্রভৃতি নিন্দাত্মক আখ্যায় পরিচিত। পণ্ডিতদের মতে ইহারা অষ্ট্রেলিয়ার বর্ত্তমান অসভ্য জাতিদের নিকটতম জ্ঞাতি, সেই জন্য তাঁহারা ইহাদিগকে 'প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড' জাতি বলেন এবং ইহাদের ভাষাকে 'অষ্ট্রিক' ভাষার অন্তর্ভুক্ত করেন। 'দ্রাবিড়ী' জাতিদের পূর্ব্বে ইহারা ভারতে আগমন করিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' বা Pre-Dravidian জাতিও বলা যায়। ইহারা আপনাদিগকে 'হোড', 'হোড়ো' 'হো', 'কোড-কু', 'কোড়োয়া' প্রভৃতি মানবসংজ্ঞাত্মক নামে অভিহিত করে, কারণ, ইহাদের ধারণা, নিজেরা ছাড়া আর সকল জাতিই এত হেয় যে, 'মানব' নামের যোগ্য নহে।

ইহারা ক্রমে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বহুকাল ভারতে আধিপত্য করে। অনুমান হয় যে, ইহারা পূর্ব্বতন নেগ্রিটো অধিবাসীদিগকে আংশিক নাশ ও আংশিক গ্রাস করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে এই নবাগত "প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড" মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির দৈহিক আকৃতির অপকর্ষ ঘটিয়াছিল।

এই দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা প্রোটো-অষ্টালয়েড জাতিগুলিকে ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসীদের মূল-স্তবক (substratum) বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাদের বিভিন্ন শাখা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের পরিমাণ অনুসারে, সংস্কৃতি বা সভ্যতা ও সমাজ-নীতির উৎকর্ষাপকর্ষ হিসাবে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত। কোন কোন শাখা মৃগয়াজীবী, কোন শাখা পশুপালক, কোন শাখা অস্থায়িভাবে কৃষিকার্য্য করে। কয়েকটি শাখা স্থায়ী কৃষিজীবী, কোন কোন শাখা অমার্জ্জিত হস্ত-শিল্পী অথবা শ্রম-শিল্পিরূপে জীবিকা অর্জ্জন করে। আর কতকগুলি শাখা জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্ষেত্রদাস রূপে কিংবা নানাবিধ উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

* E. A. Man *On the Original Inhabitants of the Andaman Islands*, p. 95.

† বর্ত্তমান মানবজাতির (*Homo sapiens*এর) আদিম নমুনাস্বরূপ যে কয়েকটি কঙ্কাল যবদ্বীপের Pleistocene স্তরে পাওয়া গিয়াছে, ঐ Wadjak জাতির সহিত বর্ত্তমান অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীদিগের সাদৃশ্য থাকায় ইহাদিগকে Wadjak জাতির অধঃপতিত একটি শাখা বলিয়া অনুমিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রাপ্ত Talgai skull এই দুই জাতির মধ্যবর্ত্তী যোগসূত্র বলিয়া অনুমান করা হয়। আর কেহ কেহ মনে করেন যে, এই Wadjak race দক্ষিণ-ভারতের কতকগুলি অসভ্য জাতির পূর্ব্বজ ছিল।

তবে এই বৃত্তিবিভাগ অনমনীয় বা দৃঢ় নহে। ইহাদের মধ্যে গ্রাম-নেতা ও গ্রাম-পুরোহিত সম্মানিত হইলেও সামাজিক উচ্চ-নীচ শ্রেণীবিভেদ বিশেষ দৃষ্ট হয় না। কেবল কয়েকটি অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষিজীবী শাখার মধ্যে দেখা যায় যে, কোনও বিশেষ গোষ্ঠী জঙ্গল আবাদ করিয়া গ্রাম স্থাপন করিলে তাহাদিগকে 'ভুঁইহার' বা 'খুঁটকাট্টিদার' প্রভৃতি সম্মানসূচক আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সে জন্য সামাজিক ব্যবহারের বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। যদিও ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ কোন কোন শাখা সম্ভবতঃ সভ্যতর দ্রাবিড় জাতিদের সহিত সংঘর্ষে ক্লিষ্ট ও অধঃপতিত হইয়াছিল, ইহাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত শাখাগুলি দ্রাবিড়দের সংমিশ্রণে ও সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে চালিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান অসমীচীন হইবে না।

ইহাদের কৃষিজীবী শাখাগুলির মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা ও সম্মিলনের বা ঐকতানের অপেক্ষাকৃত নিবিড়তা পরিস্ফুট হইয়াছিল। কৃষিজাত খাদ্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্যের জন্য উহাদের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কোন কোন পরিবার আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও অবসরবহুলতার জন্য মনের অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ সাধনে অল্পাধিক মনোযোগী হয়। বাহ্য সম্পদ্ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় শাখার সামাজিক ও ব্যক্তিগত আত্মপ্রসার ও মানসিক সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছিল। যদিও এই 'দ্রাবিড়পূর্ব্ব' কৃষিজীবী জাতিগুলির সমাজের কেন্দ্র গ্রামেই ছিল, তথাপি ইহাদের মধ্যে মুণ্ডা, ওরাঁও প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত প্রগতি-শীল জাতির সমাজ-বন্ধন স্বগ্রামেই আবদ্ধ হয় নাই। অনেকগুলি গ্রাম মিলিয়া এক একটি গ্রামসঙ্ঘরূপ বৃহত্তর সমাজ স্থাপন করিয়াছিল, ইহার ('পারহা' বা 'পট্টি') নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান। আর ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির কিংবদন্তী আছে যে, এক সময়ে ভারতে ইহাদের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গণতন্ত্র রাজ্য ছিল। রাজশক্তির চিহ্নস্বরূপ মুণ্ডা-ওরাঁও প্রভৃতি জাতির প্রত্যেক গ্রাম-সঙ্ঘে ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন চিহ্ন-অঙ্কিত পতাকা সযত্নে ও সসম্মানে রক্ষিত হয়। মধ্যপ্রদেশে দ্রাবিড়পূর্ব্ব গন্দ-জাতির শক্তিশালী সমৃদ্ধ রাজ্য আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ছিল। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় রাজ্যাধিকারের কিংবদন্তী মুণ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি জাতির মধ্যে এখনও বর্ত্তমান। আসামের খাসী জাতির ও বর্ম্মার মনখেমরদের ভাষার সহিত মুণ্ডা-ভাষাগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া অনুমিত হয় যে, দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলি হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশ হইতে গঙ্গা-যমুনার উপত্যকা হইয়া মধ্যদেশ, বঙ্গদেশ ও আসাম হইয়া, বর্ম্মা ও কাম্বোজ বা ক্যামবোডিয়া প্রভৃতি দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারত-পুরাতত্ত্ববিৎ পার্জিটার সাহেব পৌরাণিক গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মুণ্ডা প্রভৃতি দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলির পূর্ব্বজরাই পুরাণ-বর্ণিত "সৌদ্যুম্ন" জাতি; "ঐল" বা "আর্য্য-নর্ডিক" জাতির প্রাধান্যের পূর্ব্বে, এই সৌদ্যুম্ন জাতি এবং "মানব" বা বর্ত্তমান দ্রাবিড় জাতির পূর্ব্বজরা ও "আনব" জাতি অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গালী, গুজরাটী, মাহরাট্টী প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বজরা ভারতে আধিপত্য করিতেছিল।

সে যাহা হউক, 'ঐল'-আর্য্যজাতির ভারত অধিকারের পর এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিগুলির অধিকাংশ শোণ নদের ও গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি নদীর উপত্যকার উর্ব্বর ভূমি পরিত্যাগ করিয়া বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এখনও তাহাদের অতীত প্রাধান্যের চিহ্ন কোন কোন স্থানের ও নদ-নদীর নামে এবং বাংলা, হিন্দী উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার কোনও কোনও শব্দে পাওয়া যায়। যেমন বাংলা 'দহ'* অর্থাৎ নদীগর্ভে গর্ত্ত, দ্রাবিড়পূর্ব্ব মুণ্ডা প্রভৃতি ভাষার 'দা' (অর্থাৎ 'জল') শব্দ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং 'শিয়ালদহ', 'ঝিনাইদহ', 'বাঁশদহ' প্রভৃতি স্থানের নামও দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। "দামোদর" নদীর আসল নাম 'দামু দা'। মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে 'দামু' ব্যক্তিবিশেষের নাম এবং 'দা' শব্দের অর্থ জল। এইরূপ মুণ্ডা 'ঢেকি' শব্দ হইতে বাংলা 'ঢেঁকি', মুণ্ডা 'মোটো' হইতে বাংলা 'মোটা', ইত্যাদি। মুণ্ডা ভাষায় 'উপুণ' অর্থে 'চারি', ইহা হইতে কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলা 'পোণ' অর্থাৎ 'চারি কুড়ি' এবং 'চারকে' এক একক ধরিয়া (গণ্ডা হিসাবে) সংখ্যা গণনার প্রথা এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব মুণ্ডা জাতিদের নিকট হইতেই গৃহীত।

এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের সমাজ ও শাসন-প্রথায় এখনও গণতান্ত্রিকতা প্রবল। 'পঞ্চায়ত' প্রথা সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম ইহাদেরই প্রবর্ত্তিত। পঞ্চায়তকে ইহারা সত্য সত্যই ধর্ম্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখনও আদালতে সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে কোনও মুণ্ডা সাক্ষী তাহার জাতি-প্রথা অনুসারে 'পঞ্চের' নাম লইয়া এই বলিয়া শপথ করে, "সিরমারে-সিঙ্গবোঙ্গা ওতেরে পঞ্চ" অর্থাৎ—আকাশে সূর্য্যদেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়ত। ইহাদের দেবতারা প্রায় সমস্ত স্ত্রীজাতীয়। ভারতে শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন সম্ভবতঃ ইহারাই প্রথমে করে। ওরাঁও প্রভৃতি জাতির 'চাণ্ডী' নামক দেবতার সহিত হিন্দু চণ্ডী দেবীর সাদৃশ্য দেখা যায়। অর্দ্ধরাত্রে উলঙ্গ হইয়া 'চাণ্ডীর' ওরাঁও অবিবাহিত যুবক পূজারী 'চাণ্ডীস্থানে' গিয়া পূজা করে। আমাদের লক্ষ্মী দেবীর মত ওরাঁও মুণ্ডাদের 'সরণা' দেবীর চিহ্ন 'ধান্যশীর্ষ', তাঁহার মাথায় ধান্য-শীর্ষের জটা কল্পিত হয়। আর পিতৃপুরুষদের পূজা ইহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ।

ইহাদের মধ্যে বিভেদ-প্রবণতা এত অধিক যে, কোন কোন জাতি নিজ গোষ্ঠী ছাড়া অপর গোষ্ঠীর অন্ন খায় না। দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের নিম্নতম স্তরের শাখাগুলি তমোগুণ-প্রধান, অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতিদের জীবন-সুর রজোমিশ্রিত তমোগুণান্বিত। তবে তাহাদের কতক অংশ হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া সংসারে উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহারা কেহ কেহ 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়, 'সিং' উপাধি গ্রহণ করে ও উপবীত ধারণ করে। সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারদের সময় এই সব জাতির উচ্চতর স্তরগুলির মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য ছিল। তাই উক্ত হইয়াছে :—

শবরাঃ পুলিন্দাঃ ভীলাঃ এতে ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বম্ উপগতা ব্রাহ্মণানাম্ অদর্শনাৎ।

* কেহ কেহ এই 'দহ' শব্দ সংস্কৃত 'হ্রদ' শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনুমান করেন।

প্রত্ন-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড় জাতি

এই দ্রাবিড়পূর্ব্ব সমাজের গৌরব যখন উচ্চতম সীমায় উঠিয়াছিল, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভেদ করিয়া "রণধারা বাহি, জয়গান গাহি, উন্মাদ কলরবে" আবির্ভূত হইল—প্রাচীন স্নমেরীয়, ব্যাবিলনিয়ন, ইজিপশিয়ান প্রভৃতি জাতির জ্ঞাতি, সমসাময়িক সভ্যতায় সমুন্নত প্রত্নদ্রাবিড, অর্থাৎ বর্ত্তমান দ্রাবিড়ী জাতিদের পূর্ব্বজরা। প্রাচীন ভারতে ইহাদের পরবর্ত্তী নর্ডিক-আর্যারা ইহাদের নাম দিয়াছিলেন "অসুর"। "দৈত্য", "দানব" প্রভৃতি আখ্যায়ও এই পরাক্রান্ত জাতি অভিহিত হইত। ইহারা ইউরোপের মেডিটারেনিয়ান জাতির পূর্ব্বজদের জ্ঞাতি বলিয়া ইহাদিগকে 'ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান' নাম দেওয়া যাইতে পরে। ভারতে প্রবেশ করিয়া ইহাদের কয়েক দল পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিল, অনেক স্থলে দ্রাবিডপূর্ব্ব জাতির সহিত সংমিশ্রিত হইল। ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ উহাদের একটি কেন্দ্র হইয়াছিল এবং সেখানে উহাদের অনেক প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরাকালে বর্ত্তমান আসাম প্রান্তেও উহাদের উপনিবেশ ও প্রভুত্ব স্থাপনের কিংবদন্তী আছে। মহিরাজ দানব, হাটক অসুর ও তাহার বংশধর সম্বর অসুর, বৃত্র অসুর, নরক অসুর প্রভৃতির নাম জনশ্রুতিতে সুবিদিত।

উত্তর-পূর্ব্বভারতে ইহাদের কোন কোন দল উপনিবিষ্ট হইলেও গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি নদীর সুজলা সুফলা উপত্যকাগুলি মুণ্ডা প্রভৃতি দ্রাবিডপূর্ব্ব জাতিদের অধিকৃত থাকায় এই 'প্রোটো-ড্রাভিডিয়ান' বা 'ইন্দো-মেডিটারেনিয়ান' অসুর জাতির অধিকাংশ দল ক্রমে বিন্ধ্য গিরি অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে গেল ও ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিল। ইহারাই বর্ত্তমান তামিল, তেলেগু, মালায়ালি প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্বপুরুষ।

সকলেই জানেন যে, দক্ষিণ-ভারতে ইহাদের স্থাপিত অন্ধ্র, রাষ্টিক (রাষ্ট্রকূট), চের, চোল বা কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্য প্রবল ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এবং সমুদ্রপথে মিশর প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সহিত ইহাদের বাণিজ্য চলিত। সভ্যতার উন্নতির সহিত শ্রেণীবিভাগের বৃদ্ধি হইয়াছিল। দ্রাবিড় সমাজের শ্রেণীবিভাগে সর্ব্বোচ্চ ছিল "মান্নের" বা রাজা, তার পর পর্য্যায় অনুসারে 'বল্লাল' বা সামন্ত রাজা, তার পর 'বেল্লাল' বা ক্ষেত্রস্বামী বা কৃষক, তার পর 'বণিজ' বা ব্যবসায়ী। এই সব শ্রেণী ছিল উচ্চ বা 'মেলোর', তার পর শ্রমজীবী বা 'বিনইবলার', আর সর্ব্বনিম্নে দাস-জাতি বা 'আদি-ওর'। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার বহু বিভাগ ছিল। উচ্চনীচ ভেদ-প্রবণতা দ্রাবিড় জাতির মধ্যে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। উহাদের অস্পৃশ্যতা-বোধ ক্রমে ভারতের বর্ত্তমান অনমনীয় বংশগত জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইল। সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতির মধ্যে হঠযোগের প্রচলন হওয়ায় এই অস্পৃশ্যতা-বোধ আরও প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে ইহারা যখন আর্য্য-নর্ডিক জাতির সংস্পর্শে আসিল, তখন দেখিল, আর্য্যেরা শুচি-প্রবণতার

জন্য অপরিচ্ছন্ন দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতিদের সংস্পর্শ বর্জ্জনের প্রচেষ্টা করিতেন। তাহাতে এই দ্রাবিড়দের বাহ্য শুচি-বোধ আরও উত্তেজিত হইল।

পার্জিটার সাহেব পুরাণাদির গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই 'মানব' বা দ্রাবিড় জাতি হইতে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকু রাজবংশ, বিদেহের জনক রাজার বংশ, বৈশালীর বৈশালক বংশ, আনর্ত্ত (গুজরাট) দেশের কুশস্থালীর সরয়াত বংশ এবং মাহিষ্মতীর করুষ-বংশ ও আরও কয়েকটি রাজবংশ উদ্ভূত হইয়াছিল। শেষে এই দ্রাবিড়-'মানব' বা পৌরব শাখার প্রাচীন বংশগুলির মধ্যে কেবল দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য, চোল, চের বা কেরল বংশ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, আর সকলেই 'ঐল' বা আর্য্য-নডিকদের কবলিত বা অধীন হইয়াছিল। ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারতের সকল জাতির উচ্চতর বংশগুলি 'ঐল' বা 'আর্য্য' জাতির সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে আর্য্য-শোণিতের সংমিশ্রণও ঘটিয়াছিল।

এই দ্রাবিড় বা অসুর জাতিই সম্ভবতঃ ভারতে প্রথম তাম্র ও পরে লৌহ গালাইয়া অস্ত্র অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে, মৃৎপাত্র পোড়াইয়া নানা আকারের বাসনপত্র প্রস্তুত করে, ইষ্টক পোড়াইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে; মৃত ব্যক্তির জন্য প্রস্তরের কবর ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে, জল-যাত্রার জন্য অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করে, গম ও যবের চাষ প্রবর্ত্তন করে এবং জলসেচনের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি করে। ভারতে দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন এবং দেবোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান সম্ভবতঃ ইহারাই প্রবর্ত্তন করে। সর্পপূজা, লিঙ্গপূজা ও মাতৃকাপূজাও হয়ত এই জাতিরই প্রবর্ত্তিত, তবে ইহা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল, আর ধরিত্রীমাতার পূজা দ্রাবিড়পূর্ব্ব জাতির মধ্যেও বিশেষভাবে প্রচলিত আছে।

সাহিত্য ও সুকুমার কলার অনুশীলনে দ্রাবিড় জাতি সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের এ বিষয়ে উৎকর্ষ প্রাচীন কাল হইতে বিশ্রুত। ময়াসুরের ন্যায় স্থপতি প্রাচীন ভারতে আর দ্বিতীয় কেহ ছিল বলিয়া উল্লেখ নাই। ইহাদের সজ্ঞ-শক্তি ও কর্ম্ম-শক্তি প্রবল, তামিল জাতির বাস্তবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও তেলেগু জাতির ভাব-প্রবণতা উল্লেখযোগ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, 'নারিকেল', 'মীন', 'খীরা', 'কালা', 'কাণা', 'খোকা', 'খুকি', 'গোটা' (সমস্ত), নোলা (জিহ্বা) প্রভৃতি বহু শব্দ বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় ভাষা হইতে গৃহীত।

সকলেই জানেন যে, সম্ভবতঃ এই 'অসুর' জাতিরই একটি অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল ও ভাগ্যবান্ শাখা সিন্ধুনদের উপত্যকায় উপনিবিষ্ট হইয়া বিশেষ অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রভাবে ও নানা জাতির সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শের সুবিধা লাভ করিয়া ক্রমে একটি সমুন্নত সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল ও জগতের তৎকালীন সভ্য জাতিদের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় প্রাগৈতিহাসিক 'অসুর'-সভ্যতার বহুমুখী প্রতিভা ও

ঐশ্বর্য্যের যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে লিঙ্গপূজা, সর্পপূজা, বৃক্ষদেবতার পূজা, মাতৃকাপূজা ও যোগ-সাধন প্রভৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

কালক্রমে আনুমানিক পাচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের সেই বিপুল 'অসুর'-সভ্যতাও সামান্য চিহ্নমাত্র রাখিয়া ইতিহাসের রঙ্গস্থল হইতে বিলুপ্ত হইল। দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-সভ্যতার ন্যায় উত্তর-ভারতের এই অসুর-সভ্যতার মূল সুর ছিল রজস্তমোগুণাত্মক।

মঙ্গোলীয় জাতি

প্রাচীন কাল হইতে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে তরঙ্গাকারে কয়েকটি পীতাভ মঙ্গোলীয় জাতি ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে হিমালয়ের পাদদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের কেন্দ্র আসামে। এখানে আছে 'বোড়ো' শাখা, ও গারো, কাচারি, রাভা, কোচ, টিপ্রা, লালুং, 'হাজোং', 'তাই' শাখার খামটি, শান ও আহোম, কুকি-চীন শাখার প্রাচীন ও নতন কুকি, ও মাইথি বা মণিপুরী, কাচিন বা সিংফো শাখা, মনখেমর শাখার খাসি ও সিংটেঙ্গ, ভোটচীন (Tibeto-Burman) শাখার আবর, মিরি, আকা, ডাফলা ও মিসমি এবং বিভিন্ন নাগা জাতি (আও, রেঙ্গমা, সেমা, লোহটা, ইত্যাদি)।

নেপালের লিম্বু জাতি এবং নেপাল ও সিকিমের রোঙ্গপা বা লেপ্‌চা জাতি মিশ্র মঙ্গোলিয়ান জাতি।

দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিলেও এই জাতিগুলির অধিকাংশই সমাজ-ব্যবস্থায়, সংস্কৃতিতে, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে।

আসামের হিন্দুদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বঙ্গদেশ হইতে বহুকাল পূর্ব্বে আসিয়াছিল। আসামে এইরূপ বহু পরিবারে কালে মোঙ্গলীয় শোণিতের অল্পাধিক সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজভুক্ত আসামের আদিম অধিবাসী। তৃতীয়তঃ, বাংলা দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সমাগত ও আসামে উপনিবিষ্ট বহু পরিবার।

রাজা ভাস্কর বর্ম্মার নিধানপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, প্রায় দেড় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে মহাভূতি বর্ম্মার রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৪৯০-৫২০) অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ-পরিবার রাজার নিকট লাখরাজ ভূমি পাইয়া আসামে বসবাস করেন। আর দেশজ আদিম নিবাসী কতকগুলি পরিবার হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মণিপুরবাসী অনেক ব্রাহ্মণের বিবাহ ক্ষত্রিয় রমণীর সহিত হইয়া থাকে। নেপাল তরাই-এর থারু ও বোগসা জাতির মধ্যেও মঙ্গোলয়েড রক্তের সংমিশ্রণ অনুমিত হয়।

ভারতের সমাজ ও সভ্যতায় মঙ্গোলিয়ান জাতির দান উপেক্ষণীয়।

বাঙালী প্রভৃতি 'আনব' বা আঁলপাইন জাতি

দ্রাবিড় জাতির ভারতে আগমনের পরে এবং নর্ডিক আর্য্যজাতির আগমনের পূর্ব্বে

মধ্য-এশিয়ার পার্ব্বত্য অধিত্যকা হইতে পামীর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া শ্বেতাঙ্গ আলপাইন জাতির একটি শাখা একাধিক দলে ভারত-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। ইহারাই বাঙালী, গুজরাটী, মাহরাট্টী প্রভৃতি কয়েকটি জাতির পূর্ব্বজ। সম্ভবতঃ হিমালয়ের উত্তরে অবস্থানকালীন ইহারা ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর ভাষা অবলম্বন করিয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, সর্ হারবার্ট রিজলি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বাঙালী জাতি দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এই মত অধুনা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বাঙালী জাতি ও উহাদের জ্ঞাতি গুজরাটী মাহরাট্টী প্রভৃতি জাতি মূলতঃ আলপাইন-বংশোদ্ভূত। শ্বেতাঙ্গ আলপাইন জাতির এই ভারতীয় শাখা, ভারতে কৃষ্ণত্বক্ দ্রাবিডপূর্ব্ব ও কৃষ্ণাভ বা ধূসরবর্ণ দ্রাবিড জাতির সহিত অল্লাধিক সংমিশ্রণ সত্ত্বেও ইহাদের শোণিতের মূল-ধারা আলপাইনই রহিয়াছে। আর তাহাদের মধ্যে উচ্চতর ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য শ্রেণীগুলি হয়ত কোথাও কোথাও সামান্য আর্য্যশোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে, এবং পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীতে কোথাও কোথাও সামান্য মঙ্গোলিয়ান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়া থাকিতে পারে।

ইউরোপের ফরাসী, ইটালীয়ান, আলবেনিয়ান, এবং রুষ ও জার্ম্মানের কতক অংশ এবং মধ্য-এশিয়ার ওয়াখি, শিঘনি, রোসনানি, ইসকাশানি, খোটানি ও পাকফো জাতিরাও আলপাইন জাতিভুক্ত।

পুরাণোল্লিখিত বংশানুক্রমগুলির সমীকরণ করিয়া পার্জ্জিটার সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক কালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, সৌবীর, মদ্র, বাহ্লীক ও শিবি, এই দেশগুলি 'আনব' জাতির অধিকৃত ছিল। নৃতত্ত্বের সিদ্ধান্তের সহিত এই পৌরাণিক সিদ্ধান্তের বিশেষ সঙ্গতি দৃষ্ট হয়।

বাঙালী জাতির শ্বেতাঙ্গ 'আলপাইন' কুলজীর সমর্থনকল্পে আর একটি তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) 'বঙ্গ' শব্দের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ :—"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চের-পাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।" অর্থাৎ—বঙ্গ, বগধ ও চেরপ্রমুখ ত্রিবিধ প্রজা বিস্তৃতি লাভ করিয়া বিহঙ্গমরূপে সূর্য্যাভিমুখে গিয়াছিল। এই শ্লোকে 'বঙ্গ' প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদিগকে 'পক্ষী' বলা হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যখন আর্য্যগণ মধ্য-এশিয়া হইতে পঞ্জাবে উপনীত হন, তখন বাংলা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদে উপস্থিত হন, তখন বাংলার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" কিন্তু আমার মনে হয়, এই "পক্ষী" আখ্যা প্রদানের অধিকতর সমীচীন কারণ আছে। আলপাইন জাতিদের মধ্যে আলবেনিয়ানরা সেদিন পর্য্যন্তও জাতীয়তা লাভ করে নাই, শ্রেণী-পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। এখনও অন্যান্য পাশ্চাত্য আলপাইন জাতিদের

অপেক্ষা ইহারা পশ্চাৎপদ, এখনও উহারা প্রাচীন রীতিনীতি কিছু রক্ষা করিয়া চলে। উহারা "Shkypetars" বা "ঈগলপক্ষীর জাতি" বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। তাহাদের দেশকেও "ঈগলপক্ষীর দেশ" (the Land of the Eagle) বলা হয়। ডারহাম্ (M. E. Durham) তাঁহার *Some Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans* পুস্তকে (১৬ পৃঃ) তাহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It is noteworthy that even to-day a large proportion of the people·· identify themselves with birds, and a mass of traditional ballads shows that the custom is ancient." ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্য্যন্ত এই জাতির অধিকাংশ (আলবেনিয়ান) লোক আপনাদিগকে পক্ষীর সহিত অভিন্ন মনে করে এবং তাহাদের বহু লোকসঙ্গীত হইতে বুঝা যায় যে, ইহা তাহাদের প্রাচীন প্রথা। এই তথ্য হইতে এই অনুমান কি অসঙ্গত হইবে যে, ভারতের বৈদিক যুগে বাঙালীরাও তাহাদের জ্ঞাতি আলবেনিয়ানদের মত আপনাদিগকে "পক্ষী" তুল্য মনে করিত, কিংবা হয়ত "পক্ষী" অঙ্কিত জাতীয় পতাকা ব্যবহার করিত? এই অনুমানের সমর্থক আর একটি তথ্য এই যে, বাঙালীদের জ্ঞাতি মাহরাট্টা প্রভৃতি জাতির একটি গোষ্ঠীর নাম "গরুড়ে" অর্থাৎ গরুড পক্ষী, অপর একটি গোষ্ঠীর পদবী "বহিরে" অর্থাৎ শ্যেনপক্ষী (B. A. Gupte : *The Bombay Kayastha Prabhus* ২৯ পৃঃ)। রায় বাহাদুর গুপ্তে স্বয়ং জাতিতে মাহরাট্টা প্রভুকায়স্থ ছিলেন। তিনি এই 'গরুড়ে' শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মাহরাট্টা 'গরুড়ে' গোষ্ঠী তাহাদের গোষ্ঠ-পতাকায় গরুড পক্ষীর চিত্র অঙ্কিত করে। এই সম্পর্কে ইহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য যে, প্রত্যেক আলবেনিয়ান গোষ্ঠীকে অমুক "bairakh" বা পতাকা এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী-পতিকে "bairakhtar" সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

এই সম্পর্কে প্রাচীন রোমকসাম্রাজ্যের ঈগলপক্ষীর মূর্ত্তিযুক্ত পতাকা উল্লেখযোগ্য। রোমকেরাও আলপাইনজাতীয়। মধ্য-ইউরোপের আরও কয়েকটি আলপাইন জাতি যাহারা এক সময় রোমকসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহাদের পতাকাচিহ্নও ঈগলপক্ষীর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত, যাঁহারা সভ্যতার উদ্ভব প্রধানতঃ পরিব্যাপ্তিমূলক (diffusionist theory of culture) এবং সভ্যতার অধিকাংশ উপাদান প্রাচীন মিশর হইতে উদ্ভূত ও সর্ব্বদেশে পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রাচীন মিশরবাসীদের সূর্য্যদেবতা ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন শ্যেন ও শকুনির সমবায়ে ঐ পতাকা উৎপন্ন, এইরূপ মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন তাম্রলিপ্তিভূমির (সুহ্মপ্রদেশের) প্রাচীনতম রাজাদের নাম তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ ইত্যাকার ছিল। আর বর্ত্তমান বাংলা দেশে তাম্রলিপ্তি প্রদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলা 'ইন্দো-আলপাইন' জাতির একটি প্রথম উপনিবেশ হইয়াছিল, এইরূপ মনে করিবার সমীচীন কারণ আছে। সে যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুর "গরুড়ধ্বজ" নামের কথা স্বতঃই মনে আসে। হয়ত এ অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন না হইতে পারে যে, "বিষ্ণুই" বাঙালী প্রভৃতি

ভারতীয় আলপাইন জাতির আদিদেবতা এবং হয়ত শিব "শিশ্নদেবাঃ" অসুর বা দ্রাবিড় জাতির আদিদেবতা ছিলেন ও ব্রহ্মা নর্ডিক হিন্দু জাতির আদিদেবতা ছিলেন; পরে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী হিন্দুধর্ম্মে এই তিন দেবতা একমেবাদ্বিতীয়ং ভগবানের ত্রিমূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত হন।

এইরূপে বহু শতাব্দীব্যাপী দেশদেশান্তর ভ্রমণ ও বসবাসে বিভিন্ন দেশের ও জাতির সংস্পর্শে ও অল্লাধিক সংমিশ্রণে বাঙালী প্রভৃতি জাতির সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হইতেছিল।

কোন কোন 'আলপাইন' দল হিমালয়ের পাদদেশ ধরিয়া হিমালয় এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী কোন কোন প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পার্জিটার সাহেব পুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত বাদ দিয়া কোন কোন "আনব"-দল সিন্ধু-সৌবীর, কৈকেয়, মদ্র, বাহ্লীক, শিবি এবং আম্বষ্ঠ প্রদেশও অধিকার করিয়াছিল।

যখন এই আলপাইন জাতি ভারতে প্রবেশ করিল, তখন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদীগুলির উপত্যকায় দ্রাবিড়-পূর্ব্ব ("সৌদ্যুম্ন") জাতির প্রাধান্য ছিল, হয়ত তখনও সিন্ধু-উপত্যকায় ইন্দো-মেডিটেরানিয়ান জাতির আধিপত্য বর্ত্তমান ছিল, আর দক্ষিণ-ভারত প্রত্নদ্রাবিড়দের অধিকৃত ছিল। নবাগত ইন্দো-আলপাইন জাতির কোন কোন দল বর্ত্তমান গুজরাট ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইল, কোন কোন দল বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র প্রদেশে অবস্থান করিল, কোন কোন দল দক্ষিণে বর্ত্তমান কন্নাদ প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। অন্য দলগুলি মধ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান ছোটনাগপুরের ধলভূম পরগণা হইয়া এক দল মানভূম জেলায় ও অপরাপর দল তাম্রলিপ্তি প্রদেশ বা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করিল। ঐ ইন্দো-আলপাইন জনতার এক অংশ বর্ত্তমান মেদিনীপুর, হাবড়া প্রভৃতি সুহ্মপ্রদেশে উপনিবিষ্ট হইল, এক অংশ ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে বঙ্গ, অর্থাৎ বর্ত্তমান মধ্য-বঙ্গ ও পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন করিল, আর এক অংশ বর্ত্তমান বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়, অর্থাৎ রাঢ়দেশে অবস্থান করিল। কোন কোন দল রাঢ়দেশ অতিক্রম করিয়া উত্তরে বর্ত্তমান মালদহ জেলা প্রভৃতি পুণ্ড্রদেশ ও রাজশাহী, বগুড়া প্রভৃতি বরেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিত হইল। আর এই ইন্দো-আলপাইন জন-প্লাবনের কোন কোন উচ্ছ্বসিত অংশ পশ্চিমে বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগনা ও পূর্ণিয়া জেলায়, উত্তরে বর্ত্তমান আসামের কামরূপ প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইল। সুহ্মপ্রদেশ হইতে কতকগুলি ইন্দো-আলপাইন গোষ্ঠী ওড্র ও উৎকলে গিয়া ক্রমে উচ্চশ্রেণীর উড়িয়া জাতির মধ্যে পরিগণিত হইল, আর ইন্দো-আলপাইন কৃষি কুড়মী জাতি পশ্চিমে বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-আলপাইন বাঙালী জাতির প্রকৃত "বাংলা" রাষ্ট্রীয় "বাংলা দেশ" অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

সুজলা সুফলা বাংলা দেশে জীবিকা অর্জ্জন সহজসাধ্য হওয়ায়, মানসিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনও অনায়াসসাধ্য। বাংলা দেশে আগত ভাবপ্রবণ, কল্পনাশীল,[১] মেধাবী ও

কর্ম্মঠ আলপাইন সঙ্ঘগুলি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার এক বিশিষ্ট সভ্যতা লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, "প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় খাটি আর্য্য রাজগণ, এমন কি, যাঁহারা ভরতবংশীয় বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। যখন লোকে লোহার ব্যবসায় জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত, সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম' নৌকা। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত, তার নাম 'বালাম'। 'বালাম' বলিয়া কোনও ভাষায় কথা আছে কি না জানি না। কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাংলার প্রাচীন বন্দর। অশোকের সময়, এমন কি, বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাংলার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত।"

বাংলা দেশের সম্বন্ধে মহাভারতাদির সব কথা কত দূর প্রামাণ্য বলা যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ আর্য্যদের পরিত্যাজ্য ছিল। পরে বৌদ্ধ প্রচারকগণের বঙ্গে আগমনকাল পর্য্যন্ত বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। বৌদ্ধ ও জৈন প্রচারকগণের আগমনের পর হইতে গণতন্ত্রবাদী বাঙালী সমাজ-অনুকূল উপাদান সংগ্রহ ও সমীকরণ করিবার সুযোগ পাইয়া সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইল।

সাম্রাজ্য-স্থাপনে বাঙালী জাতি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃতিতে বাঙালী ক্রমে ভারতে অগ্রণী হইয়াছে। নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, শান্ত রক্ষিত, অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি বাঙালী পণ্ডিতদেব খ্যাতি সুবিদিত। বাঙালী পণ্ডিতগণ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যাদির চর্চ্চা করিতেন, পরে প্রাকৃত ভাষায়। প্রাকৃত ভাষায় প্রসিদ্ধ গৌড়ী রীতি উদ্ভাবন বাঙালীর কৃতিত্বের একটি পরিচয়।

পরে বরেন্দ্রভূমিতে পালরাজবংশের অভ্যুদয়ে বাঙালী জাতির বহুমুখী প্রতিভা আরও বিকশিত হইতে লাগিল। নবদ্বীপের "নব্য ন্যায়" ও "গৌড়-মগধ" রীতির ভাস্কর্য্য, যাহা বরেন্দ্রভূমিতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং বাংলার নানাবিধ কলাশিল্প কারুকার্য্য প্রভৃতি বাঙালীর সমীকরণশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সামান্য গৃহকর্ম্মে ও আমোদ-প্রমোদেও বাঙালীর বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়, যেমন আলিপনা, পটঅঙ্কন, কাঁথা সেলাই, সুক্তো, ডাল্‌না, ঘণ্ট রন্ধন, সন্দেশ রসগোল্লা, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রতকথা, কবির গান, যাত্রা, কীর্ত্তন প্রভৃতি।

সমাজের আত্মা বা সুর সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ গুরুদের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল ও উত্তরোত্তর তাহা সমৃদ্ধ হইতে লাগিল। বাংলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের পর তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে। পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্ম্মের প্লাবন আসে। সম্প্রতি পাশ্চাত্য

শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাবে বেদান্তধর্ম্ম ও মতের উপর বাঙালীর পক্ষপাতিত্ব লক্ষিত হয়। সমীকরণশীল বাঙালী জীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য করিবার পক্ষপাতী। এই এক শতাব্দীর মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্রে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে, রাজনীতি ও অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালী জাতির মধ্যে যত অধিক মনীষাসম্পন্ন লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, ভারতে আর কোন প্রদেশে এত হয় নাই।

উদারতা বাঙালী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও আন্তঃপ্রাদেশিক ঈর্ষা দেখা যায়, বাঙালী এই প্রাদেশিক ভাব হইতে সাধারণতঃ মুক্ত।

বাঙালী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-প্রিয়

কিন্তু যদিও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে স্বাধীন চিন্তা, নব নব ধর্ম্মমত, নূতন বৈজ্ঞানিক মত, যন্ত্রাদি উদ্ভাবন, ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাঙালীর প্রতিভা দেদীপ্যমান, তথাপি পরিতাপের বিষয় এই যে, যৌথ কর্ম্মক্ষেত্রে এ পর্য্যন্ত বাঙালী পশ্চাৎপদ রহিয়াছে। সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে বাঙালীর যৌথ-পরিবারগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহার জন্য আংশিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বর্ত্তমান চাকুরী-জীবিকা দায়ী। আর সম্ভবতঃ জীমূতবাহন-প্রণীত বাঙালীর দায়ভাগ আইনও যৌথপরিবারের পরিবর্ত্তে পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যের পোষকতা করিতেছে। সম্প্রতি এই সামাজিক আইনকে রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা আরও পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতেছে।

সে যাহা হউক, বিষ্ণু ও কালীর সাধক বাঙালী-জীবনের মূল সুত্র সত্ত্ব-মিশ্রিত রাজসিক। তবে সকল জাতিরই নিম্ন স্তরে তামসিক গুণের অল্পবিস্তর আধিক্য দেখা যায়, তাহাও বাঙালী সমাজে অপেক্ষাকৃত কম, বস্তুতঃ সকল হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীদের পক্ষেই এ কথা খাটে। সকল হিন্দু সমাজেরই ভিত্তি সত্ত্বগুণে, কোন সমাজে সেই মূল সুরের ঝঙ্কার সমধিক পরিস্ফুট, কোন সমাজে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কোন সমাজে বা অস্পষ্ট ও লুপ্তপ্রায়। তথাপি ইহা মগ্নচৈতন্য হইতে বিলুপ্ত হয় না।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য এক শ্রেণীর উপন্যাসাদি-লেখকদের অনুকরণে বাস্তবতার কদর্য্য নগ্ন মূর্ত্তি কখন কখন চিত্রিত হইতে দেখা যায়। ইহা বাঙালীর সমাজ-জীবনের ও সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের মূল সুরের বিরোধী। সুতরাং এই শ্রেণীর সাহিত্য এ সব সমাজের অনিষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ যেমন জাতীয় ও সামাজিক আদর্শই সর্ব্বত্র সাহিত্য ও সুকুমার কলাকে প্রভাবান্বিত করে এবং তাহার ছন্দ ও সুরকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি সাহিত্য ও সুকুমার কলাও আবার জাতি ও সমাজের আদর্শকে অলক্ষিতে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। তবে ভরসা এই যে, সাত্ত্বিক ভাব হিন্দুসমাজের মজ্জায়

এরূপ প্রগাঢ়ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে যে, এরূপ সাহিত্য ভারতে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা অল্প। যে সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশ করিবে, ভারতের ও বাংলার জীবনের সুরের সহিত কেবল তাহারই সঙ্গতি হইবে, সমাজ-জীবনের যথার্থ প্রকাশ ও স্ফুরণ তাহা দ্বারাই হইবে।

"ঐল" বা ভারতের নর্ডিক-আর্য্য জাতি

যখন দ্রাবিড়-পূর্ব্ব দ্রাবিড় ও আলপাইন জাতির পরস্পর সংমিশ্রণে বহু জাতি ও বর্ণসঙ্কর ভারতের বিভিন্ন ভাগে স্ব-স্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সমাজ লইয়া বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে দ্বন্দ্ব, কলহ, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া দিন যাপন করিতেছিল, তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হইতে সবিতৃদেবের বরেণ্য ভর্গ-ধ্যানপরায়ণ চিত্তে উদ্গীত বেদগাথায় গগন ধ্বনিত করিয়া একটি প্রতিভাবান্, মহাশক্তিশালী, বিশিষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন, অপূর্ব্ব কল্পনাশীল অথচ কর্ম্মপরায়ণ জাতি ভারত-রঙ্গস্থলীতে আবির্ভূত হইল।

এই নর্ডিক আর্য্যজাতির আদি আবাসভূমি ও ভারত-আগমনের কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। সে যাহা হউক, ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায়, উত্তর-ভারতে অধিকার-স্থাপনকল্পে 'অসুর'দের সহিত দীর্ঘকাল এই নবাগত জাতি সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। এই 'অসুর' সংজ্ঞায় প্রধানতঃ পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধ দ্রাবিড় জাতিদিগকেই সূচিত করিত, তবে সম্ভবতঃ দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের কোন কোন উন্নততর শাখার যোদ্ধারাও দ্রাবিড়-অসুরদের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'আর্য্য' নর্ডিকদের গতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। অবশেষে আগন্তুকেরাই জয়ী হইল। তাহাদের দ্বারাই হউক কিংবা নৈসর্গিক বিপর্য্যয়েই হউক, সিন্ধু-উপত্যকাবাসী 'অসুরেরা' যে গৌরবময় সভ্যতা-সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল, সামান্য কিছু বাস্তব নিদর্শন রাখিয়া তাহা লুপ্ত হইয়া গেল।

এই বেদবাহী আর্য্যজাতি বাস্তব সভ্যতায় অসুরদের ন্যায় সমৃদ্ধ ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতিতে, ভাষা-গৌরবে, প্রতিভায়, কল্পনাশক্তিতে, আদর্শ-প্রবণতায় ও আধ্যাত্মিকতায় সমধিক গরীয়ান্ ছিল।

যখন পরস্পর যুদ্ধ ও বিরোধ প্রশমিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইল ও কিছু দিন পরস্পরের সংশ্রব, সাহচর্য্য ও অল্পাধিক সংমিশ্রণ এবং আদান-প্রদান চলিতে লাগিল, তখন আসুরিক বল ও বাস্তব সভ্যতার উপর মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল এবং সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা প্রাধান্য লাভ করিল। দ্রাবিড়-অসুরেরা ক্রমে নর্ডিক আর্য্যদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। অসুর-সভ্যতা এবং পরে আলপাইন সভ্যতা ও আর্য্য-সভ্যতার সমবায়ে এবং আর্য্য-গুরুদের নেতৃত্বে এক বিশাল হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু সমাজে গঠিত হইল। বৈদিক হোম যজ্ঞাদির সঙ্গে বৈদিক-পূর্ব্ব পূজাদি সংমিশ্রিত হইল। অসুরাদি

অনার্য্যের ধর্ম্ম মার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মে স্থান পাইল। ভারতের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতির ক্রিয়াকর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তর ও অধিকারভেদ অনুসারে বিবিধ শ্রেণীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নির্দ্ধারিত হইল। তখন এই স্তর-বিভাগ অনমনীয় ছিল না। এইরূপ স্তর-বিভাগ ও অধিকার-ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া সমাজ-সংস্কারের ও সকল শ্রেণীর ক্রমোন্নতির পথ সুগম করা হইল।

পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় হিন্দুসমাজের স্তর-বিভাগ ধনগত নয়, ইহা গুণগত। ত্যাগ, শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গুণানুসারে প্রাচীন কালে এক বর্ণ হইতে নিম্নতর বর্ণে অবনমিত ও উচ্চতর বর্ণে উন্নীত হওয়ার দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন 'নডিক'-আর্য্য-সমাজনেতারা আর্য্যাবর্ত্তে ও পরে দ্রাবিড়-ভারতে বংশগত ও ব্যবসায়গত বহু শ্রেণী-বিভাগকে তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী গুণগত চাতুর্ব্বর্ণ্যের কাঠামোতে খাপ খাওয়াইয়া সংস্কৃত করিতে প্রয়াস পাইলেন, তখন সে প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কালক্রমে এই শ্রেণী-বিভাগ অনমনীয় জাতিভেদে পরিণত হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে ঐ জাতিভেদবোধ কিছু মন্দীভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতে ঐ ধর্ম্মের গ্লানি ও অবশেষে বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের কঠোরতা বৰ্দ্ধিত হইয়া ও অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে বিকলাঙ্গ ও বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলিল।

সমাজ গঠন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও হিন্দু পণ্ডিতদের মত

যে নানাবিধ নৈসর্গিক ও সামাজিক শক্তির প্রভাবে সমাজের পরিপুষ্টি হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে তাহা প্রধানতঃ চারিটি :—

(১) প্রাকৃতিক আবেষ্টনী (natural environment),

(২) বংশানুক্রম ও পূর্ব্বপুরুষাগত সংস্কার (heredity, বা hereditary tendencies) ;

(৩) সামাজিক আবেষ্টনী (social environment), যেমন জাতীয় ঐতিহ্য, পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষা ,

(৪) অপরাপর জাতির ও সংস্কৃতির সহিত সংস্পর্শ ও সংমিশ্রণ (contact of cultures and races)।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বহু যুগ পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে প্রত্যেক মানবের ও সমাজের দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা সমাজ-বিজ্ঞানের এই মূল তথ্যেরই জ্ঞাপক ; আর উক্ত চারিটি শক্তি ছাড়া মহাপুরুষদের প্রভাব সমাজের নবজীবন প্রদানের পক্ষে যে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী, এই তথ্য হিন্দু ঋষিরাই প্রথমে বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। (৪ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক)

ব্যষ্টিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষ সাধনের পন্থাস্বরূপ প্রত্যেক মানবের নিত্যকর্তব্যরূপে তাঁহারা যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি সমাজতত্ত্বের এই মৌলিক তথ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বরং হিন্দু ঋষিদের এই সম্বন্ধে ধারণা আরও গভীর, ব্যাপক ও বিশাল ছিল। আর হিন্দু ঋষিরা কেবল সামাজিক মনস্তত্ত্বের তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া তৃপ্ত হন নাই, জ্ঞানলব্ধ তথ্য ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ দ্বারা ব্যষ্টিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের উৎকর্ষ সাধনোপযোগী বিধিনিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত বিধিনিয়মের মধ্যে যেগুলি তৎকালীন অবস্থার উপযোগী ছিল, দেশের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও সেগুলির অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন সাধিত না হওয়ায় সমাজের উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি যে বিধিনিয়ম সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অপর অনেকগুলি বিধি-নিষেধ যাহা সনাতন বা মৌলিক নহে, কেবল সময়োপযোগী মাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সকল প্রচলিত আচার ও বিধিনিষেধকে ভগবৎ-আদিষ্ট ও দেশকাল-পাত্রনির্ব্বিশেষে অবশ্যপালনীয় বলিয়া গ্রহণ করাতেই সমাজের উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া অবনতির দিকে চালিত হইতেছে। আমার মনে হয়, হিন্দুশাস্ত্রে দেবঋণ প্রভৃতির ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের ধারণা এবং ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে বিরাট্ পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে যজ্ঞোৎপন্ন বিভিন্ন বর্ণের কল্পনা, তাহাই হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানের মূলসূত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

হিন্দুর দেবযজ্ঞের উদ্দেশ্য—বিশ্বের ও বিশ্বজীবের নিয়ামক প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সহিত যজমানের বা যজমান-সঙ্ঘের আত্মসমীকরণ ও ঐকতান স্থাপন। তাই 'স্বাহা' এই আত্মযোজক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হবির্দানের বিধি, দেবতাদের সহিত, কিংবা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভাষায়, প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর সহিত—ঐকতান স্থাপনের উদ্দেশ্যে। আদিত্য, বসু ও রুদ্রাদি দেবতারা বিশ্বনিয়ামক নৈসর্গিক শক্তিরূপে ভগবৎশক্তিরই প্রতীক।

পিতৃযজ্ঞে—পিতৃগণের প্রদত্ত দেহ ও দেহাশ্রিত গুণাবলীর (heredityর) অধিকারী যজমান, 'স্বধা' মন্ত্রে পিতৃগণের সহিত স্বীয় একত্বের ধ্যান ও উপলব্ধি করেন ও আত্মানুস্মৃতির কামনা করিয়া তর্পণ করেন।

ঋষিযজ্ঞের উদ্দেশ্য—মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু ও অন্যান্য জ্ঞানদাতাদের সহিত স্বাধ্যায়, মন্ত্রজপ ও ধ্যানদ্বারা অখণ্ড জ্ঞানের নিত্য সান্নিধ্য লাভ। ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নির্ণীত সামাজিক আবেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহা অতিক্রম করিয়া যায়, সামাজিক আবেষ্টনীর ধারণাকে আরও ব্যাপকতা প্রদান করে। সমাজের উপর মহাপুরুষদের প্রভাবের গুরুত্ব পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা সম্প্রতি স্বীকার করিতেছেন।

নৃযজ্ঞে আতিথেয়তা ও প্রীতি দ্বারা শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া সমাজের ও বিশ্বমানবের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিবার বিধি। বিশ্বমানবের ও বিভিন্ন মানব-সমাজের সহিত সংস্পর্শ এবং প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহাদের প্রভাব ব্যষ্টিজীবন ও সমাজ-জীবনকে প্রভাবান্বিত করে বলিয়াই নৃযজ্ঞের প্রবর্ত্তন।

বিশ্বমানবের সহিত সম্বন্ধের এই ধারণা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির পরস্পরের আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণের (contact of races and cultures) ধারণা অপেক্ষাও অধিকতর ব্যাপক ও মহান্।

আর ভূতযজ্ঞের ধারণা ও অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য। ভূতযজ্ঞের উদ্দেশ্য—আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বের সমস্ত জীবের সহিত মানবের বিচিত্র সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন ও পবিত্র দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতের সেবা। হিন্দু সমাজনীতি মতে এইরূপে ক্রমিক আত্মপ্রসারের দ্বারা বিশ্বমানবের ও পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হওয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

কিন্তু প্রায় সহস্র বর্ষ হইল, ভারত-সমাজের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কবির ভাষায়,—

আমাদের কর্ম্মরে করেছে পঙ্গু নিরর্থ আচারে,
জ্ঞানেরে করেছে হত শাস্ত্রকারাগারে।

আজ আমাদের ধর্ম্ম প্রাণহীন, সমাজ অর্থহীন আচারের চাপে বিকলাঙ্গ ও জীবন্মৃত। অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভোগবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ভারত-সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। একমাত্র সুলক্ষণ এই যে, অধুনা পাশ্চাত্যের কৃষ্টির সংস্পর্শে আসাতে আমাদের দীর্ঘ-সুপ্ত জাতীয়তা ও স্বদেশ-প্রেম পুনরুদ্দীপিত হইতেছে ও তাহারই প্রণোদনে ভারতবাসী অন্তরের যে অমূল্য সম্পদ্‌রাজি হেলায় হারাইয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

যে ভারতে নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ মানবজীবনের পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত হয় ও যে দেশে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মন্ত্রের প্রচলন আছে, সেখানে জাতীয়তার অভাব হইতে পারে না। অবস্থাবিপর্য্যয়ে কয়েক শতাব্দী অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় কেবল মগ্নচৈতন্যে বর্ত্তমান ছিল মাত্র। বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তনে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আবার জাগ্রত হইতেছে। কিন্তু উহাকে 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে।

এই প্রসঙ্গে জাতীয়তা সম্বন্ধে ঋষিতুল্য স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"ইয়ুরোপীয় সমাজের সহিত তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। জাতীয় ভাবটি মনুষ্য-হৃদয়ের খুব উচ্চ ভাব বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চ ভাব নহে। জাতীয় ভাব একটি মিশ্র পদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা, দুই-ই আছে। কোন

ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অতি উদার ভাব, আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাব। জাতীয় ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ঐ ভাবটি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে—উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতি-সোপানে একটি উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়। (১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধুবান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ,—এই পাঁচটি ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া, তবে (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায়, প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে, (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোমটি মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরল-মনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ, বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব-নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন,—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসগোচরে আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন। ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাব স্থান পাইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব, সেটি আবৃত হইয়া আছে। সম্প্রতি এই আবরণের মোচন হইতেছে।"

কিন্তু আক্ষেপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমানে কোন কোন প্রান্তীয় সরকার মুখে ভারতীয় জাতীয়তার গর্ব্ব করিলেও কার্য্যতঃ প্রান্তীয় জাতীয়তা-ভাবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কোথাও কোথাও দেশজ এবং উপনিবিষ্ট (native and domiciled) জাতিদের সম্পর্কে প্রভেদমূলক নীতির প্রবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

উপসংহার

সমাজ-বিজ্ঞানের যথাযথ অনুশীলনে এই শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনে ঐকতান, সমাজ-জীবনে ঐকতান, বিশ্বমানবের ঐকতান, ইহাই বিশ্ব-লীলা-রহস্যের উদ্দেশ্য—ইহাই সম্ভবতঃ হইবে বিশ্বনাট্যের শেষ অঙ্ক, মানবজগতের বিধিনির্দ্দিষ্ট পরিণাম।

বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি বিশ্ব-প্রাণের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন ধারা বা ছন্দ। প্রাচীন ভারত-সভ্যতা আর্য্য, দ্রাবিড়, আলপাইন, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির সমাবেশ ও সংযোগে গঠিত হইয়া পার্থক্য-সমন্বিত এক মহান্ একত্বে গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

কালক্রমে প্রতিকূল ঘটনাবলীর ও ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের ফলে আর্য্যসভ্যতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র শ্লথ হইয়া, এবং অনৈক্য ও বিভেদ বা বিচ্ছেদ-প্রবণতা উদ্ভূত হইয়া ভারতকে অধঃপাতিত করিয়াছিল। পুরুষপরম্পরাগত অনেক আচার ও বিধি-নিষেধ অবস্থার পরিবর্ত্তনে, বর্ত্তমান

অবস্থার ও কালের অনুপযোগী, সুতরাং অর্থহীন ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কঠিন শৃঙ্খল হইতে সমাজকে মুক্ত করিতে হইবে, এবং আত্মসংযম, ত্যাগ, ফলেচ্ছাহীন কর্ম্ম, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি যে অন্তরের সম্পদ্ আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

অধুনা ভগবদ্‌বিধানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে এবং ভারত-সন্তানগণ তাহাদের অর্দ্ধ-লুপ্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য এখন প্রয়োজন—ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান-সম্মত পন্থার অনুসরণ। ভারতের সমাজনেতাদের ও রাষ্ট্রনেতাদের কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সমঞ্জসীভূত, সুচিন্তিত সামাজিক ব্যবস্থা ও কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা এবং অবিচলিতচিত্তে সেই পথে অগ্রসর হওয়া ও ভারত-সমাজকে চালিত করা। তাহা হইলেই ভারত আবার জগৎসভ্যতার জয়যাত্রায় অগ্রণী হইতে পারিবে।

অন্যান্য দেশের সমাজ-সংগঠনের সহিত ভারতের সমাজ-সংগঠনের মৌলিক প্রভেদ এই যে, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই মূলতঃ সমজাতীয়। কেবল ভারতেই বিভিন্ন জাতির বা বর্ণের অনন্যপূর্ব্ব একত্র সমাবেশ হইয়াছে। আর একমাত্র আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে কতকটা এইরূপ বিভিন্ন জাতির একত্র উপনিবেশ ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু সেখানে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, বিভিন্ন জাতির পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও বিরোধ বিরল নহে। অপর পক্ষে ভারতের প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাদের উদারতা, সম্মিলন-প্রবণতা, সমীকরণশীলতা, সার্ব্বজনীন প্রীতি ও একাত্মানুভূতির প্রণোদনে ভারতে উপনিবিষ্ট প্রত্যেক জাতির স্ব স্ব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একটি বিরাট্, বিচিত্র, ঐশ্বর্য্যশালী ভারত-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সংযোগ ও সামঞ্জস্য যান্ত্রিক সংমিশ্রণে নহে। ভাব-সামঞ্জস্যে, ধর্ম্ম-সামঞ্জস্যে ও আদর্শের একত্বে অচ্ছেদ্য মানসিক বা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যোগ।

সমাজ-সংগঠনে স্তরবিন্যাস অনিবার্য্য। অন্যত্র এই স্তর-বিনিবেশের উচ্চনীচ পারম্পর্য্য প্রধানতঃ বৈশ্যশক্তি বা ধনের তারতম্য কিংবা ক্ষাত্রশক্তি বা শৌর্য্যবীর্য্যের তারতম্যের উপর অধিষ্ঠিত; কেবল ভারতেই উহা ত্যাগ ও ব্রহ্মণ্য বা সত্ত্বগুণের তারতম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতের বিভিন্ন সমাজের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি, ব্যাবহারিক কর্ম্ম-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, আহার-বিহার, বিভিন্ন প্রদেশের ও সামাজিক আবেষ্টনের ও ঐতিহাসিত ঘটনাপুঞ্জের প্রভাবে অসংখ্য রূপ ধারণ করিলেও, এই জাতির প্রাকৃতিক ও বিরাট্ হিন্দু সমাজের আদর্শ বা মূল সুর ছিল আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, অনাসক্তি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ও শান্তি। বিভিন্ন রাগরাগিণীর মধ্যেও ছিল এই একই মূল সুর।

সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা হইতে এই অনুভূতি আসে যে, বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি বিরাট্ পুরুষের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ, সুর বা ছন্দ। এই ছন্দ হারাইয়া ভারতবাসী এখন ছন্নছাড়া হইয়াছে। আবার সেই ছন্দের বা সুরের পুনরুদ্ধারের জন্য

ভারত-সন্তানদের প্রাণপণ সাধনার প্রয়োজন, সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ভারতবাসী প্রত্যেক জাতির ও সমাজের স্ব স্ব সুর বা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং তাহাদিগকে সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক সমান অধিকার প্রদান করিয়া হিন্দুসমাজের মৌলিক আদর্শের দিকে পরিচালিত করা সমাজবিজ্ঞানসম্মত পন্থা এবং প্রকৃষ্ট রাজনীতি। আমাদের প্রাদেশিক দেশ-নেতারাও ইহা স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব প্রান্তে উপনিবিষ্ট স্বদেশী প্রবাসী বিভিন্ন জাতির এবং তাহাদের ভাষার ও সংস্কৃতির উন্নতিতে বাধা প্রদান না করিয়া যদি যথাশক্তি উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ভারত-সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে আবার এক দিন ভারতের বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির বিভিন্নতার মধ্যে মহান্ মৌলিক একত্ব সংস্থাপিত হইবে। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ছন্দ বা সুরের সমন্বয়ে ভারতমাতা আবার তাঁহার পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। তখন মাহরাট্টার রুদ্রবীণা ও শঙ্খনিনাদ, পঞ্জাবীর জয়ভেরীর গম্ভীর নির্ঘোষ, বাঙালীর ও অসমীয়া হিন্দুর বংশীধ্বনির মধুর নিক্কণ, হিন্দুস্থানীর করতালের ঝনৎকার, দ্রাবিড়ীয় তানপুরার করুণ সুর, আর আসাম, ছোটনাগপুর ও মধ্য-প্রদেশের আদিম নিবাসীদের মৃদঙ্গের উল্লাস-ব্যঞ্জক ধ্বনি প্রভৃতির সম্মিলিত একতানবাদ্যে ভারতভূমি আবার মুখরিত হইবে। তখনই বহুত্বের মধ্যে একত্বের পরিচয়ে ভারতে একজাতীয়ত্বের যথার্থ অনুভূতি আসিবে। আর সেই একতানের আত্মাস্বরূপ, সকল রাগিণীর মূর্চ্ছনাস্বরূপ ভারতমাতার মহা-ওঙ্কারধ্বনি ভারতে ও জগতে নিরন্তর ধ্বনিত ও শ্রুত হইবে। সেই ধ্যান-মন্ত্রে "কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্ব-জাতি",—আর তখনই সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
বাজিবে বিশ্ব-বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৪)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেরী

কেরীর প্রতিভা বহুমুখী, জীবন বহুধাবিস্তৃত ছিল, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ততখানি বিস্তারের স্থান নাই। ধর্ম্মপ্রচারার্থ বঙ্গদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের সামান্য পরিচয় দিয়া, বঙ্গদেশে তাঁহার কার্য্যকলাপের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, কেরীর জীবনের এই অংশের ইতিহাস (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ নবেম্বর অর্থাৎ কলিকাতায় পদার্পণ-দিবস হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন মৃত্যু-দিবস পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বৎসর) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বাংলা-গদ্যের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত জড়িত। এই কালের মধ্যে বলিতে গেলে তিনি এক দিনের জন্যও বঙ্গদেশ ত্যাগ করেন নাই—মদনাবতীতে অবস্থানকালে টমাসের সঙ্গে একবার ভুটান গিয়াছিলেন; বঙ্গদেশের পরিধি তখন ভুটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ৪১ বৎসরের প্রথম ছয় বৎসর তাঁহার শিক্ষানবিশীর কাল, শিক্ষক—জন টমাস ও রামরাম বসু। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষে মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতির আগমনকাল হইতেই মিশনরী-গোষ্ঠীর তিনি পরিচালক, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন; কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার সংস্রব। এই শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় বাংলা-গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি এবং উভয় ক্ষেত্রেই উইলিয়ম কেরী প্রধান।

প্রবন্ধ-লেখকের এখানে একটু জবাবদিহি করিবার আছে। উইলিয়ম কেরী পৃথিবী-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। শুধু এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতেই তাঁহার বিস্তৃত জীবনী স্থান পায় নাই, ব্রাউন, কে, কার্ণ, লং, হাগ, মার্শাল, শেরিং, ডাফ প্রভৃতি-লিখিত ভারতের বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় মিশনের ইতিহাসে কেরী অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছেন; সি বি. লিউসের জন্ টমাস-জীবনী, ডব্লিউ এইচ কেরীর ওরিয়েণ্টাল ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাফি, স্যামুয়েল ষ্টেনেটের উইলিয়ম ওয়ার্ড-জীবনী, উইলিয়মসের শ্রীরামপুর-পত্রাবলী (*Serampore Letters*) প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তকে কেরীর জীবনের বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিজস্ব জীবনীর সংখ্যাও কম নয়। ইউষ্টেস কেরীর *Memoir of William Carey, D. D.* (১৮৩৬); ডক্টর বেলচারের *Life of William Carey* (১৮৫৬); জন ক্লার্ক মার্শম্যানের *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward,** দুই খণ্ড

(১৮৫৯), জে. কালরসের *William Carey* (১৮৮১), জর্জ স্মিথের *The Life of William Carey, D. D* (১৮৮৫); পীয়ার্স কেরীর *William Carey* (১৯২৩), ডিয়াভিল ওয়াকারের *William Carey* (১৯২৬); মহেন্দ্রনাথ চৌধুরি-সঙ্কলিত 'আদর্শ চরিত' (১৮৮০), বি. বি. শাহ-অনূদিত 'কেরি সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (১৮৯৪), অমৃতলাল সরকার-প্রণীত 'ভারতবন্ধু ডাক্তার উইলিয়ম কেরী' (১৯৩৪) প্রভৃতি বহু পুস্তকে কেরীর জীবন বহু ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইগুলির উল্লেখ করিলেই প্রবন্ধ-লেখকের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেরীর উপরি-উল্লিখিত কোনও জীবনীতেই বাংলা সাহিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিস্তৃত বিবরণ নাই—এগুলি খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পাদরি কেরীর জীবনের কাহিনী মাত্র। শুধু ইউষ্টেস কেরীর জীবনীর পরিশিষ্টে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন "প্রাচ্য পণ্ডিত ও অনুবাদক" কেরী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং বাংলা-গদ্যের সহিত কেরীর সম্পর্কের ইতিহাস আমাদিগকে তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গীদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল ইত্যাদি হইতে বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। আমরা মূলতঃ শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির "বোর্ড রুমে"ই অধিকাংশ উপকরণ পাইয়াছি, এই কাজে শ্রীরামপুর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এই সংখ্যায় মুদ্রিত প্লেটগুলিও সেখান হইতে গৃহীত।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে নরদামটনশায়ারের পলার্সপিউরি গ্রামে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এডমণ্ড কেরী তখন স্বহস্তে তাঁত বুনিয়া অন্নসংস্থান করিতেন। উইলিয়মের বয়স যখন ছয় বৎসর, এডমণ্ড তখন তন্তুবায়বৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্থানীয় অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সুরু করেন এবং স্থানীয় প্যারিশের কেরাণী নিযুক্ত হন। পিতার এই জীবিকা-পরিবর্ত্তন উইলিয়মের পক্ষে শুভ ফলদায়ক হইয়াছিল, শিক্ষক পিতার আদর্শে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ইতিহাস, ভূগোল অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের বিবরণ, ভ্রমণকাহিনী, বিশেষ করিয়া কলম্বসের আবিষ্কার-বৃত্তান্ত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন করিবার আগ্রহ ও উৎসাহের কথা সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ের অধীত বিদ্যা উত্তরকালে বঙ্গদেশে অবস্থানসময়ে স্থানীয় পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতাদি সম্পর্কে গবেষণাকার্য্যে তাঁহার সহায় হইয়াছিল। ব্যাপটিষ্ট মিশন সোসাইটির প্রথম ছয় খণ্ড 'পিরিয়ডিকাল অ্যাকাউণ্টসে' ইহার বহু পরিচয় আছে। পুস্তকগত জ্ঞান ছাড়াও বাল্যকাল হইতেই তিনি হাতে-কলমে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। এই বিজ্ঞানে তিনি এমনই দক্ষ হইয়াছিলেন যে, এক সময় তাঁহাকে কলিকাতার কোম্পানীর বাগানের তত্ত্বাবধায়করূপে নিয়োগ করার প্রস্তাব উঠিয়াছিল এবং বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ ডক্টর রক্সবার্গের অকালমৃত্যুতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ *Flora Indica* পুস্তক উইলিয়ম কেরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। কলম্বসের জীবনী ও ভ্রমণকাহিনী বালক কেরীকে এমনই আবিষ্ট করিয়া রাখিত যে, তিনি

দিনের পর দিন তাঁহার সহপাঠীদের কাছে কেবলই কলম্বসের গল্প বলিতেন; তাঁহার উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে কলম্বস নামে ডাকিয়া উপহাস করিত। অন্যান্য বিষয়ে কেরী সাধারণ ছাত্রদের মতই ছিলেন, কেবল তাঁহার পিতা বাল্যে তাঁহার পাটীগণিত বিষয়ে দক্ষতার উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।* বার বৎসর বয়সে কেরী পলার্স পিউরির তন্তুবায়-পণ্ডিত টমাস জোন্‌সের নিকট বিশেষ মনোযোগের সহিত লাটিন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি লাটিন শব্দকোষ ('Vocabularium') কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পীয়ার্স কেরী লিখিয়াছেন,—

> Nature and he were Sister and brother.···To watch things grow was his dear recreation.···In the Paulerspury lanes and fields and forest, and in the moat between his father's schoolhouse and the rectory, little was hidden from his eyes. Bird—their forms, colours, changes, calls, songs, haunts, nests, flight, eggs···And plants—their times and seasons, their leaves and buds and flowers, their soil and roots, their devices and their seeds—he eagerly and patiently discovered....He became a recognized encyclopædia amongst his Paulerspury mates on all things curious.

এডমণ্ডের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, সুতরাং বার বৎসর বয়স হইতেই বালক কেরীকে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর তিনি কৃষিকার্য্য শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চর্ম্মরোগের জন্য রৌদ্রতাপ মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া এই জীবিকা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হ্যাকেলটনের জুতা-নির্ম্মাতা ক্লার্ক নিকল্‌সের সহযোগী হিসাবে জুতা-সেলাইয়ের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়া চার বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রত্যহ রবিবারে পলার্সপিউরি আসিয়া টমাস জোন্‌সের নিকট তিনি গ্রীকভাষা শিখিতে শুরু করেন। ক্লার্ক নিকল্‌সের দোকানে কয়েকটি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ ছিল, কেরী সেগুলিও মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে থাকেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্লার্ক নিকল্‌সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় টি. ওল্ডের দোকানে কেরী শিক্ষানবিশ হন। এই ভদ্রলোক একাধারে মণ্ডপ, বদমেজাজী ও ধর্ম্মবাতিকগ্রস্ত ছিলেন, বালক কেরীর সহিত প্রায়শঃ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক হইত। তর্কে জিতিবার জন্য কেরী প্রাণপণে ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিক্ষায় অধিক মনোযোগী হন। এই সকল তর্কমূলক ধর্ম্মচর্চ্চা সত্ত্বেও কেরীর নৈতিক চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইয়া পড়ে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ আগষ্ট তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে তিনি নিজের বাল্যজীবন সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

* মিঃ টমাস ব্লাণ্ডেলের নিকট এডমণ্ড কেরীর ৯ আগষ্ট, ১৮১৫ তারিখের চিঠি—"He was always attentive to learning when a boy, and was a very good arithmetician."

My companions were at this time such as could only serve to debase the mind, and lead me into the depths of the gross conduct which prevails among the lower classes in the most neglected villages : so that I had sunk into the most awful profligacy of conduct.

এই সময়ে জন্ ওয়ার (Warr) নামক এক জন সহ-শিক্ষানবিশের আদর্শ তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়, তাঁহার মনে সত্যকার ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয়; চার্চ অব ইংলণ্ডের বিখ্যাত প্রচারক রেভারেণ্ড টমাস স্কটের সহিত তাঁহার এই সময়েই ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে মনিব ওল্ডের শ্যালিকা নিরক্ষরা ডরোথি প্যাকেটের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নরদামটনশায়ারের ব্যাপটিষ্টমণ্ডলীর পালকসঙ্ঘে যোগদান করিয়া রাইল্যাণ্ড, সাটক্লিফ, ফুলার ও পীয়ার্সের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মূলটনে একটি অবৈতনিক পাঠশালার শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া কেরী পিডিংটন (হ্যাকেলটন) ত্যাগ করেন, জুতা-সেলাইয়ের ব্যবসায় তিনি তখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তৎপূর্ব্বেই ক্যাপ্টেন কুকের ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, এই পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া পৃথিবীর অখ্রীষ্টান হিদেন জাতিসমূহের অনন্ত নিগ্রহের কথা ভাবিয়া তাঁহার মনে বেদনা জাগে ও তাহাদের মুক্তির উপায় তিনি চিন্তা করিতে থাকেন। মূলটনে আসিয়া তিনি স্বহস্তে পৃথিবীর একটি বৃহৎ মানচিত্র প্রস্তুত করেন ও সেটিকে দেওয়ালে টাঙাইয়া হিদেনদের উদ্ধার-চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। তিনি এই সময়ে ডাচ, ইতালীয়ান ও ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখিতে থাকেন এবং ডাচ ভাষার একটি পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার এই প্রথম রচনা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারেই আছে। ধীরে ধীরে জুতা-সেলাই ও শিক্ষকতাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কেরী ধর্ম্মযাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন ও ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লীষ্টার শহরের হার্ভি লেনে পাকাপাকি রকম পাদ্রিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে এখান হইতেই তাঁহার *An Enquiry*... পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং ঐ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে কেটারিঙের ঐতিহাসিক সভায় The Particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen নামক সমিতি গঠিত হয়। গত সংখ্যায় এই সভার কয়েকটি অধিবেশন ও জন্ টমাসের সহিত কেরীর প্রথম সংযোগের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে রওয়ানা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেরীর জীবন সম্বন্ধে ইহার অধিক তথ্য আমাদের ইতিহাসের পক্ষে অনাবশ্যক। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন ক্যাপ্টেন ক্রিসমাসের অধীনে পরিচালিত ডেনিশ ইণ্ডিয়াম্যান 'প্রিন্সেস মারিয়া'-যোগে জন্ টমাসের নেতৃত্বে উইলিয়ম কেরী—পত্নী ডরোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন প্ল্যাকেট, পুত্র ফেলিক্স, উইলিয়ম, পিটার ও সদ্যোজাত জ্যাবেজকে লইয়া বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে ৪১ বৎসর নানাকীর্ত্তিবিভূষিত জীবন যাপন করিয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে কেরীর জীবনের তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব—ভাষা শিক্ষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা, শারীরিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অপরিসীম অধ্যবসায় এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রবল কৌতূহল।

কেরী, টমাস ও রামরাম বসু

(১৭৯৩ নবেম্বর—১৭৯৯ অক্টোবর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেরী ও টমাসের ধারাবাহিক জীবনী আমার প্রবন্ধের বিষয় নয়, কৌতূহলী পাঠককে ইহার জন্য অন্ততঃ জর্জ্জ স্মিথ ও সি. বি. লিউসের শরণাপন্ন হইতে হইবে। রামরাম বসু সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ সামান্য উপকরণই আমাদের হস্তগত হইয়াছে; খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলে মিশনরীদের কৃপায় প্রথম বাঙালী লেখকের জীবনের বিস্তৃততর বিবরণ আমরা পাইতে পারিতাম। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সহিত কয়েক বৎসরের সম্পর্কবশতঃ তাঁহার সামান্য যেটুকু পরিচয় তাঁহাদের চিঠিপত্র ও জর্ণাল মারফৎ পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের ঔৎসুক্য মিটে না। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ৩য় গ্রন্থ রামরাম বসু-লিখিত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় সেই পরিচয়টুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, রামরাম বসু সম্বন্ধে তাহার অধিক জানিবার উপায় নাই। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়-সম্পাদিত 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্রে'র ভূমিকায় রামরাম বসু সম্বন্ধে আরও অনেক কাহিনী আছে বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিয়াছি, সেগুলির অধিকাংশই ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কেরী-সমভিব্যাহারে তৃতীয় বার বঙ্গদেশ অভিমুখে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বেই টমাস বাংলা দেশ, বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, বিকৃত উচ্চারণ লইয়াই তিনি বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন এবং ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই রামরাম বসুর সহায়তায় বাইবেলের ম্যাথু, মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিসের কিয়দংশ, সাম্‌স (Psalms) ও প্রফেসিজ-এর বিভিন্ন অংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়া মূল পাণ্ডুলিপির নকলের সাহায্যে মালদহের হিন্দুদের মধ্যে তাহার প্রচারও করিয়াছেন।* এই অনুবাদের অসংস্কৃত রূপ আমাদের হস্তগত হইলে মিশনরী বাংলার আদিমতম নিদর্শন হইতে পরবর্ত্তী পরিণতির একটা ইতিহাস রচনা করা সহজ হইত। তবে শ্রীরামপুর মিশনযন্ত্রে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের প্রথম সংস্করণে (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ১৮ মার্চ মুদ্রণ আরম্ভ) টমাস-রামরাম বসুর অনুবাদ কতকটা অবিকৃত আছে বলিয়াই অনুমান হয়। মার্ক, জেম্‌স, জেনেসিস প্রভৃতির টমাস-বসুকৃত অনুবাদকে ভিত্তি করিয়া কেরীকৃত সংস্করণ পরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

---

* They have Matthew, Mark James, some part of Genesis, and the Psalms, with different parts of the Prophecies, in Bengalee manuscript : three or four of them have all the above, and some only a single, part, which they lend to one another and copy." —Thomas's "Narrative of Himself," *Rippon's Baptist Register*, No V.

মালদহ হইতে দ্বিতীয় বার স্বদেশে ফিরিবার সময় টমাস সঙ্গে করিয়া কেটারিঙের ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীর সম্পাদকের নিকট লিখিত "শ্রীপার্ব্বতী ব্রাহ্মণ, শ্রীরামরাম বসু, কায়স্থ" লিখিত ১১৯৮ বঙ্গাব্দের ৭ই মাঘ তারিখের একটি বাংলা নিমন্ত্রণপত্র সঙ্গে লইয়া যান; টমাস ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ঐতিহাসিক পত্রটির মূল বাংলা রূপ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে লীষ্টারে ব্যাপটিষ্ট ভ্রাতৃমণ্ডলীর সভায় সকলে মিলিয়া এই পত্রের একটি জবাব প্রস্তুত করেন—

"A letter was drawn up, addressed to the Hindoo Christians in India, to whose conversion brother Thomas had already been instrumental......"

এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল—

You requested in your letter sent to one of our brethren, that "Missionaries might be sent to preach the Gospel among you, and to half-forward the translation of the word of God" For these purposes we recommend to you our much esteemed brethren Thomas and Carey, men who are persuaded, are willing to hazard their lives for the name of the Lord Jesus ..

W hope that upon the arrival of our brethren, you will be solemnly baptized ...

Be subject to the laws of your country, in all things not contrary to the laws of God .Be faithful in all your relative connections .

রামরাম বসুকেও ১৭৮৮ সনের জুন মাসে রচিত তাঁহার খ্রীষ্ট-স্তবটির* জন্য ধন্যবাদ দিয়া একটি পত্র লিখিত হয়। এই দুইটি পত্র সঙ্গে লইয়া ১৩ই জুন তাঁহারা যাত্রা করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ আগষ্ট গিল্‌সবরোতে অনুষ্ঠিত মণ্ডলীর সভায় বঙ্গদেশগত মিশনরীদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

That as it will be necessary for sometime, that they should have the assistance of some of the natives, in order to enable them to learn the *Sanskrit* and *Bengal Languages*, the sum of 20 l per annum be allowed to each, towards the discharge of those extra expenses

কেরী জাহাজেই টমাসের নিকট বাংলা শিখিতে সুরু করেন, টমাসও জাহাজে বসিয়াই হিব্রু-ভাষাভিজ্ঞ কেরীর সাহায্যে জেনেসিসের অনুবাদ শেষ করেন। ১১ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌছিয়াই রামরাম বসুর সহিত জাহাজঘাটে কেরীর পরিচয় হয়, টমাসের মুন্‌শী রামরাম সেই দিন হইতেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন। প্রকৃত পক্ষে টমাসের সহিত বাংলা-গদ্যের সম্পর্ক এই দিন হইতেই ঘুচিয়া যায়, অধিকতর পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল এবং নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির হাতে এই ভার অর্পিত হয়; রামরাম বসুর মধ্যস্থতায় বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ উইলিয়ম কেরী বাংলা-গদ্যনির্ম্মাণে তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লইয়া অগ্রসর হন। ১১ই নবেম্বর, ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬

* "কে আর তারিতে পারে লর্ড জিজচ ক্রাইষ্ট বিনা গো। পাতক সাগর ঘোর লর্ড জিজচ ক্রাইষ্ট বিনা গো।" ইত্যাদি।

খ্রীষ্টাব্দে মালদহের মদনাবাটীতে * একটি অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্ত মুন্শীত্ব হইতে বরখাস্ত না-হওয়া পর্য্যন্ত রামরাম বসু বরাবরই কেরীর সহিত যুক্ত থাকিয়া ভাষা-শিক্ষায় এবং অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। খামখেয়ালী, অমিতব্যয়ী, এবং জুয়াড়ী টমাস মিশন-প্রদত্ত যাবতীয় অর্থ অপব্যয় করিয়া নিজে নানা বিপদের মধ্য দিয়া শেষ পর্য্যন্ত জর্জ্জ উড্‌নির আশ্রয়ে মালদহের মহীপালদীঘি নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৪ সনের মার্চ মাসে সেখানে পৌছিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হন। বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া পূরা সাড়ে সাত মাস কাল কেরী হালভাঙা নৌকার মত সমগ্র পরিবার এবং মুন্শী সমেত সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় কলিকাতা হইতে ব্যাণ্ডেল, ব্যাণ্ডেল হইতে নদীয়া, নদীয়া হইতে ব্যবসায়ী নেলু দত্তের বদান্যতায় তাঁহার মাণিকতলার বাগান-বাড়ীতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের † দেবহাট্টায় তাড়িত-বিতাড়িত হন। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক অত্যধিক যন্ত্রণায় কেরী-পত্নী ডরোথি অর্দ্ধোন্মাদ হইয়া যান। এই সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যেও কেরী এক দিনের জন্যও তাঁহার আসল উদ্দেশ্যের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং ভাষা শিক্ষা ও অনুবাদের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই। অনুতপ্ত টমাস মহীপালদীঘিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই-দোষে-বিপন্ন কেরীকে বাঁচাইবার জন্য জর্জ্জ উড্‌নিকে ধরিয়া মদনাবাটীর নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়কের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া সংবাদ পাঠান। ১৫ই জুন ১৭৯৪ তারিখে কেরী সপরিবারে রামরাম বসু সহ নৌকাযোগে ইছামতী, জলাঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা নদীপথে মদনাবাটী পৌছান। পথিমধ্যে সুন্দরবনের কাছাকাছি চান্দুরিয়া নামক স্থানে কেরী সর্ব্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। কেরীর চিঠিপত্র ও জর্ণাল হইতে এই সাড়ে সাত মাসের প্রয়োজনীয় বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Calcutta, Nov. 25, 1793. I see one of the finest countries in the world, full of industrious inhabitants; yet three-fifths of it are an uncultivated jungle, abandoned to wild beasts and serpents ....

I have had several conversations with a Brahmin who speaks English well, and being unable to defend himself against the Gospel, he purposes to come, attended by a Pundit, and try the utmost of their strength.... It will be of very great service to us if the society can send out a *Polyglot Bible* by the next conveyance. *Ram Boshoo* is a good Persian scholar, and it will certainly help us much... ...?

Bandell, Dec. 16, 1793 .We have been near a month at *Bandell,* which is a Portuguese settlement, but are now going further up the country, perhaps, to *Nuddea, Cutwa, Gowr,* or *Malda;* at present it is uncertain which.

---

* ইংরেজী Mudnabatty ইতিপূর্ব্বে "মদনাবতী" রূপে বাংলায় লিখিত হইয়াছিল। পরে জানিয়াছি (Ward's *Journal*) "মদনাবাটী" উচ্চারণ হইবে।

† ইহা রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারিভুক্ত ছিল। ইহা হইতে অনুমান করা চলিতে পারে যে, রামরাম বসুর বাড়ী এই অঞ্চলেই ছিল।

Bandell, Dec. 26, 1793....I entertain a very high opinion of him [Ram Ram Boshoo] as a converted person : He is a man after my heart. He is a faithful councellor and a discerning man, and very inquisitive, sensible and intelligent. If he wants anything it is zeal; ...

Mamet-tullo, Jan 1, 1794 . The utmost harmony subsists between me and Mr. Thomas Several Brahmins and Pundits, have been very pressing with us to settle at *Calcutta*, and preach to them; accordingly Mr T resides there, and I live at a house belonging to a blackman [Nelu Dutt], who generously offered it to me for nothing, till I am otherwise accomodated

I am about renting a small quantity of land of a native, some miles east of the city [Debhatta], so that we may have opportunities of preaching the gospel all over the most populous part of *Bengal* The city of Calcutta is very large; I have no doubt but there may be 200,000 black people there, besides the Europeans ... .I had fully intended to devote my eldest son to the study of Shanscrit, my 2d to the Persian, and my 3d Chinese

Mamet-tullo, Jan 3-5, 1794 . Both Moors and Hindoos are very industrious, and in many branches of manufacture excellent workmen The cultivated part of the country bears a great resemblance to some of our English countries

The Moors, who are Mahometans, are more rigid and fierce than the Hindoos .

The Hindoos acknowledge but one Supreme Being, but they make offerings to a variety of imaginary subordinate beings.. ....

To the honour of the Government I may observe, that the black people here are as free as the natives of England, and the courts of law seem to favour them full as much as the Europeans

Their national character is that of avarice, to this we may add a strong propensity to lying. The first of these seems to be the effect of the oppressive dealing which they have experienced under former governors But the whole police has assumed a very different aspect under the government of Lord Cornwallis, and especially in favor of the natives

Deharta, Feb 15, 1794 . My ear is somewhat familiarized to the *Bengalee* sounds It is a language of a very singular construction, having no plural except to pronouns, and not a single preposition in it; but the cases of nouns and pronouns are almost endless, all the words answering to our prepositions being put after the word, and forming a new case Except these singularities, I find it, an easy language

এই সময়েই তিনি নিজের স্থবিধার জন্য নিজেই বাংলা ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও একটি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাঙালী ও বাংলা দেশের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতেই তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে কেরী ও টমাসের এই পত্র ও জর্ণালগুলি যে কত মূল্যবান্ তাহা উপলব্ধি হইবে। উত্তরবঙ্গে এই দুই জন মিশনরীর কার্য্যকলাপের কাহিনীও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগষ্ট তারিখে মদনাবাটী হইতে কেরী সোসাইটিকে লিখিতেছেন—

"I cannot speak the language so well as to converse much, but begin a little."

তাঁহার ৯ আগষ্ট তারিখের পত্রে (মিঃ সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত) দেখিতে পাই—

The language is very copious, and I think beautiful. I begin to converse in it a little; but my third son, about five years old speaks it fluently. Indeed there are two distinct languages spoken all over the country; the *Bengalee*, spoken by the Brammhans, and higher Hindoos; and the *Hindoslanie*, spoken by the Musselmans, and lower Hindoos This last is a mixture of Bengalee and Persian •

ঐ বৎসরের শেষে মদনাবাটীতে কেরীর এই তৃতীয় পুত্রটি (পিটার) মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতেই কেরী বাংলা ভাষায় বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছেন, লিখিতে ও বলিতে তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয় না। এই সময়েই তাঁহার মাথায় বাইবেল মুদ্রণের খেয়াল চাপে, তিনি ইংলণ্ড হইতে হরফ প্রস্তুত করাইয়া আনিতে মনস্থ করেন। ৬ জানুয়ারির পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—"I intend soon to send specimens of Bengalee letters, for types. A considerable part of this expense I hope to be able to bear myself" মদনাবাটীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি স্থানীয় কৃষক ও প্রজাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যত দূর জানা যায়, ইউরোপীয় মতে দেশীয় লোকদের শিক্ষা দিবার চেষ্টা ইহাই দ্বিতীয়। মালদহের গোয়ামাল্টির জন্ এলার্টন ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

২৭ জানুয়ারি তারিখেই কেরী ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিতেছেন—

It will be requisite for the society to send a printing press from *England*, and, if our lives are spared, we will repay them We can engage native printers, to perform the press and compositor's work.

কেরীর জর্ণালে ঐ বৎসরের ১৪ই জুন তারিখে লিখিত আছে—

The Translation also goes on—Genesis is finished and Exodus to the XXIII d. Chapter I have also for the purpose of exercising myself in the language, begun translating the gospel by John; which Moonshee afterwards corrects .....

এই পর্য্যন্ত কেরীর অনুবাদের খবর মাত্র আমরা পাইতেছি, নমুনা দেখিতে পাই না। মদনাবাটী হইতে ১৩ আগষ্ট লিখিত একটি পত্রে তিনি স্বয়ং নমুনা দিয়াছেন, কেরী-লিখিত বাংলার ইহাই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। কেরী লিখিতেছেন,—

Ram Ram Boshoo and Mohun Chund are now with me....I often exhort them, in the words of the apostle, 2 Cor. VI 17, which in their language I thus express :—

বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্ব্বশক্ত ভগবান।*

কেরী এই সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড হইতে হরফ আনাইবার ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন; কারণ, বাংলা দেশেই যে বাংলা হরফ পাওয়া যায়, ইহা তিনি অবগত হইয়াছেন। এখানকার মামুলি প্রথাতেই অবশ্য ইংলণ্ড হইতে দশগুণ বেশী খরচ করিয়া ক্রিসমাসের মধ্যেই বুক অব জেনেসিস পর্য্যন্ত ছাপান যাইবে, তিনি এরূপ আশা করেন।

* "Forth come and separate be : and unclean thing touch not : and I accept will you : and you shall be my sons and daughters : thus says the Almighty God."

ঐ বৎসরের ২রা অক্টোবর তারিখেও তাঁহাকে দুঃখ করিতে দেখি—

One of my great difficulties arises from the common people being so extremely ignorant of their own language, and the various dialects which prevail in different parts of the country. Though I can preach an hour with tolerable freedom, so that all who speak the language well, or can read or write, can perfectly understand me; yet the laboring people can understand but little. Notwithstanding the language itself is rich, beautiful, and expressive; yet the poor people,......have scarce a word in use about religion.

বাংলা-গদ্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক উইলিয়ম কেরীর সাধনা পরবর্ত্তী কালে এই কল্পিত বাধার দ্বারাই মূলতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থাৎ চলতি ভাষা শিক্ষা ও রচনা পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় যাবতীয় ভাষার মূল, সংস্কৃতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

From his second Mudnabati year Carey gave a third of his long working day to this language, which Ram Ram Basu extolled as almost divine It was India's hall-mark of culture, the franchise of her real aristocracy; the tongue wherein her scriptures and classics were all enshrined; the speech which unlocked her very soul, the mother and queen of her many vernaculars To conquer this was to lay open a dozen derivatives; to take this stronghold was to win a multifold domain........ (S. P. Carey).

ঠিক এই সময়েই কেরী (৩১ ডিসেম্বর ১৭৯৫) মদনাবাটী হইতে মিঃ পীয়ার্সকে সংস্কৃত, বাংলা এবং প্রচলিত ভাষার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছিলেন—

Should you pursue the knowledge of the Hindoo language, it will no doubt have its use, but could you learn to read, and understand, and pronounce well all the books that are written in that language, yet not one in a hundred of the people would understand you, nor could you understand them, so different is the language called Bengalee (which is spoken by the higher ranks of Hindoos) from the common language of the country, which is a mixture of Bengalee, Hindoostanee, Persian, Portuguese, Armenian, and English, that is a mere jargon. I much question whether Moonshee can translate the Bible so as to be understood by the common people, and the less so as there is an alteration in their dialect every ten or twelve miles, and if he could I am persuaded that he would be ashamed of writing language so completely ungrammatical

নিজের অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগিতেছিল বলিয়া তিনি ঐ চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

I have translated the gospel by John, and the Epistle to the Galatians myself, without his [Ram Ram Boshoo's] help; and the common people understand it much better than his; but it would be scouted by all above the rank of a farmer......

সংস্কৃত ও চলতি বাংলা, এই টোটানার মধ্যে পড়িয়া কেরী কিছু কাল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং কোনও ব্যাকরণ-অভিধানের আশ্রয় না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত নিজেই সংস্কৃতের আদর্শ ধরিয়া ব্যাকরণ-অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ফর্ষ্টারের অভিধান তখনও প্রকাশিত হয় নাই এবং যে কারণেই হউক, হালহেডের ব্যাকরণ ও

আপ্‌জনের অভিধান তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেছেন (৩১ ডিসেম্বর, ১৭৯৫)—

I have been trying to compose a compendious grammar of the language, which I send you, together with a few pages of the Mahabharat, with a translation, which I wrote out for my own exercise in the Bengalee.... I have also begun to write a dictionary of the language, but this will be a work of time; .

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই কেরী রাইল্যাণ্ডের নিকট পত্রে লিখিতেছেন—

I have read a considerable part of the 'Mahabharata,' an epic poem written in most beautiful language, and much on a par with Homer And were it, like Homer's 'Iliad' only considered as a great work of human genius, I should think it one of the finest productions in the world

বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গদ্য রচনার কাজ এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ মুন্‌শী রামরাম বসুর দুশ্চরিত্রতা প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি করিল, ১৭৯৬ সালের জুন মাসে কেরী নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে রামরাম বসুকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইলেন, বসুর সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালার পণ্ডিতটিও পলায়ন করিলেন। সকল কাজ একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। কেরীর মানসিক অবস্থা এই সময়ে এত খারাপ হইয়াছিল যে, তিনি প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ১৭ই জুন একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

With respect to printing the Bible, we were perhaps too sanguine Means have hitherto failed I think it will be well for the society to send at least one hundred pounds per annum, which shall be applied to the purposes of printing the Bible, and educating the youth.

I think it very important to send more missionaries hither, as we may die soon. .

ঐ বৎসরের ১০ই অক্টোবর তারিখে জন ফাউন্‌টেন নামক এক জন যুবক প্রচারক কেরীর সহকারিরূপে মদনাবাটীতে উপস্থিত হইলেন। এই যুবকের উৎসাহে কেরী আবার নূতন উদ্যমে কাজ সুরু করিলেন, ফাউন্‌টেন অতি অল্প কালের মধ্যে বাংলা ভাষা শিখিয়া লইয়া স্কুলের কাজ ও অনুবাদের কাজে কেরীকে সাহায্য করিতে লাগিলেন, ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিউ টেষ্টামেণ্ট সম্পূর্ণ অনূদিত হইয়া গেল, তখন শুধু ছাপার অপেক্ষা। কিন্তু তাহাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, হিসাব করিয়া দেখা গেল, এদেশে ১০০০০ কপি ছাপিতে ৪৩৭৫০৲ টাকা খরচ হইবে। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে একটি মুদ্রাযন্ত্র ও হরফ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া কেরী ১৬ই নবেম্বর তারিখে ফুলারকে পত্র দিলেন, এক জন দক্ষ মুদ্রাকরকেও ঐ সঙ্গে পাঠাইতে বলিলেন।

এই পত্রের জবাব আসিবার পূর্ব্বেই কেরী ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা রওনা হইলেন—"To make the necessary enquiries about the expence of printing it here..." তিনি তখনও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং প্রত্যহ হিন্দুস্থানীতেও পাঠ লইতেছেন। কলিকাতার মুদ্রাকর হিসাব করিয়া জানাইলেন যে, নিউ টেষ্টামেণ্ট ছাপার অক্ষরে মোট ৮০০ পৃষ্ঠা হইবে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন সেট টাইপ কাটাইয়া সেই হরফে ১০০০০ কপি

ছাপিয়া দিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লইবেন। অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব জানিয়া কেরী দুঃখিতচিত্তে মদনাবাটী ফিরিয়া আসিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে দেখিতেছি—

I am forming a dictionary, Shanscrit, Bengallee and English, in which I mean to include all the words in common use. It is considerably advanced; and should my life be spared, I would also try to collate the Shanscrit with the Hebrew roots, where there is any familiarity between them . ...

মূল সমিতি কিন্তু মুদ্রাযন্ত্র ও হরফের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, সুতরাং মুদ্রাকরের সন্ধানও প্রয়োজন হইল না। মদনাবাটীতে কেরীর জীবনযাত্রাও নিরুপদ্রবে চলিতেছিল না। অনাবৃষ্টি অথবা অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর নীলকুঠির কাজ প্রায় বন্ধ ছিল। খামখেয়ালি টমাসের কাজও ভাল চলিতেছিল না, মিশনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, ঝড়ের মত তিনি মদনাবাটীতে আসিতেন ও চলিয়া যাইতেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দেই টমাস মহীপালদীঘির কুঠি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থান করার পর তিনি রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে সেরাসিং নামক স্থানে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচারকার্য্য করিতে যান। সদয়হৃদয় উড্‌নি বিপন্ন কেরীকে সাহায্যের জন্য আরও দুই এক বৎসর কুঠির কাজ চালাইতে মনস্থ করিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কলিকাতায় দেশীয় ভাষার হরফ প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—

A Letter-Foundry has lately been set up at Calcutta for the country languages, and I think it will be cheaper and better to furnish ourselves with types for printing the Bible in this country, than to have them cast in Europe . W Carey, Jan 1, 1798

এই কারখানার কর্ত্তা কে ছিলেন জানা যায় না বটে, কিন্তু উইলকিন্স-শিষ্য পঞ্চানন যে এখানে কাজ করিতেন, জে সি মার্শম্যান সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

All trace of the author or the result of this project has been lost except the fact that the punches were cut by the workman whom Sir Charles Wilkins had trained up Mr Carey immediately placed himself in communication with the projector of this scheme, and relinquished all idea of obtaining Bengalee types from England —*The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*, Vol. I, p. 80

এইখানেই পঞ্চাননের সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর পরিচয় হয় এবং তাহারই ফলে শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপিত হইবার পর পঞ্চানন কেরীর সহিত যোগদান করেন।

ইহারই কিছু দিন পরে ইংলণ্ড হইতে সদ্য-আগত একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্র কলিকাতায় নিলামে বিক্রয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়, মাত্র ৪৬ পাউণ্ড (জে. সি. মার্শম্যানের মতে ৪০ পাউণ্ড) মূল্য ধার্য্য হইয়াছিল। বাইবেল-মুদ্রণের সাহায্যের জন্য ধর্ম্মপ্রাণ উড্‌নি উহা ক্রয় করিয়া আনাইয়া কেরীকে দান করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৯৮) মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবাটী-ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের

প্রারম্ভে কেরী টাইপ অর্ডার দিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলেন।* মদনাবাটীতে আসিয়াই তিনি একটি বিপদে পড়িলেন। জর্জ উড্‌নির নিকট হইতে মদনাবাটী কুঠির কাজ বন্ধ করিবার আদেশ আসিল। বিপন্ন কেরী নিকটবর্ত্তী খিদিরপুর গ্রামে নিজের এত দিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া উড্‌নির নিকট হইতে একটি নীলকুঠি ক্রয় করিলেন, কেরী ও ফাউন্টেন মুদ্রাযন্ত্রটি সমেত সেখানে নূতন সংসার পাতিতে গেলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর মার্শম্যান, ওয়ার্ড, ব্রান্সডন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি নূতন মিশনরীদল কলিকাতায় আশ্রয় না পাইয়া ডেনিশ রাজ্য শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। জন ফাউন্টেন তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পূর্ব্বেই কলিকাতা গিয়াছিলেন। ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা নিজেরা স্থির করিতে না পারিয়া সকলের পরামর্শমত কেরীর মতামতের জন্য ফাউন্টেন ও ওয়ার্ড ১৪ই নবেম্বর নৌকাযোগে খিদিরপুর রওয়ানা হইলেন। ১৭৯৯ সালের ১লা ডিসেম্বর তাঁহারা কেরীর গৃহে পৌঁছিলেন। নিজের ও মিশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে কেরী তিন সপ্তাহ সময় লইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বহু কষ্টে উপার্জ্জিত খিদিরপুরের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রটি সহ নৌকাযোগে ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুদ্রাকর ওয়ার্ড তাঁহার সঙ্গে রহিলেন।

But what of John Thomas through all the upheaval of these days? ..With his wife and daughter he moved hither and thither, never in one stay. Now living in a boat, now in a bamboo hut, now in Nadia, now in Birbhum, now preacher, now sugar-refiner and distiller, and now again indigo-venturer. A rolling stone, a warm heart, a wayward judgment and will! (S. P. Carey)

শ্রীরামপুর মিশন—কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড

(১০ জানুয়ারি ১৮০০ হইতে ৮ এপ্রিল ১৮০১)

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর রবিবার ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিতীয় দল শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। শ্রীরামপুর তখন ডেনমার্কের অধীন। গঙ্গার ধারে এখন যেখানে কলেজটি অবস্থিত, তাহারই সন্নিকটে 'মায়ার্স ট্যাভার্ণ' নামে একটি ডেনিশ

* Carey to Ryland, April 1, 1799—"I wrote to the society that I had reason to hope that a copy of the *whole Old and New Testament* might be completed, by the time the paper mentioned by brother Fuller, for printing 2,000 copies of the New Testament would arrive... We have a press, and I have succeeded in procuring a sum of money sufficient to get *types cast*. I have found out a man who can cast them, the person who casts for the Company's press, and I have engaged a printer at Calcutta to superintend the casting. The work is now begun, and I hope may be completed in less than *six months*, by which time the copy will be in forwardness to begin upon........

I went to Calcutta in company with Mr F [ফারনাণ্ডেজ]

সরাইখানা ছিল; পাদরিরা সেই সরাইখানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওয়ার্ড তাঁহার দিনপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন—

প্রকৃতি এখানে সহজ সাজে সজ্জিত, তাঁহার সম্পদের মধ্যে কুটীর ও কুঞ্জোদ্যানগুলি। নদীতরঙ্গে তিনি খেলা করেন, জীবধাত্রী হইয়া এখানে বিরাজ করেন; এখানে সব কিছুর উপর কে যেন মায়ার পরশ বুলাইয়াছে; হিন্দুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইতিমধ্যেই আমার বাসনা জন্মিয়াছে; এই সুন্দর নদীর তীরে কুটীর এবং কুঞ্জ-কাননমধ্যে আমি থাকিতে চাই। এই ভদ্র এবং শান্ত হিন্দুদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিব, এই চিন্তায় আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই নদী-তীরস্থ সামান্য কুটীরগুলির যে সৌন্দর্য্য, ইংলণ্ডের পরম রমণীয় উদ্যানের সৌন্দর্য্য তাহার অর্দ্ধেকও নহে। স্থানীয় অধিবাসীরা উচ্চতায় নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, তাম্রবর্ণ এবং অনেকে দেখিতে সুন্দর। সম্পূর্ণ সমতল এই দেশ, স্থানে স্থানে অরণ্যসঙ্কুল, মাঝে মাঝে জানালাবিহীন খড়ের ছাউনি-দেওয়া কাদায়-গাঁথা কুড়েগুলি, গৃহপালিত পশুর প্রাচুর্য্য—দলে দলে চরমান তাহাদের দেখিলে চোখ জুড়ায়। মাথায় এবং কোমরে জড়ান এক এক টুকরা কাপড় ইহাদের পরিধেয়, ফলমূল, মৎস্য ও অন্ন ইহাদের প্রধান আহার্য্য এবং ধূমপান প্রধান বিলাস·· এই দেশ এবং ইহার অধিবাসীদের দেখিয়া আমরা সত্যই আনন্দ পাইতেছি, নয়নমনোহর মূর্ত্তির সংখ্যা ইংরেজদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে অধিক·· ।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি কেরীর শুভাগমনে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হইল। দলের প্রথম টমাস ও প্রধান কেরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ফাউন্‌টেন, গ্রাণ্ট ও ব্রান্সডন অল্পকালমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। টমাসও এই গোষ্ঠীতে ঘনিষ্ঠ ভাবে যোগ দিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র মার্শম্যান ও ওয়ার্ড দীর্ঘকাল জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মিশনের কাজে কেরীর সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

জোশুয়া মার্শম্যান ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ এপ্রিল উইল্‌টশায়ারের ওয়েষ্টবেরি লে'তে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জন্ মার্শম্যান তন্তুবায়ের কাজ শিখিয়া কিছু কাল নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, পরে তাঁতের কাজ ও ধর্ম্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। জোশুয়া মার্শম্যান বাল্যকালে ইতিহাস এবং বীর ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী পড়িতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পুস্তকপ্রীতি দেখিয়া কেটর নামক এক জন পুস্তকবিক্রেতা তাঁহাকে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে লণ্ডনে তাঁহার পুস্তকের দোকানে সহকারী (পিওন) নিযুক্ত করেন, নানা বই পড়িবার লোভে এই কাজে প্রথমটা তাঁহার আনন্দ হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেখিতে পান, কাজের চাপে পড়িবার অবসর মিলে না। পাঁচ মাস কাজ করিয়া তিনি ওয়েষ্টবেরি লে'তে ফিরিয়া আসেন ও পৈতৃক তাঁতবোনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, বই-পড়ার বদঅভ্যাস বশতঃ তিনি তখন গল্প-উপন্যাস, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, বিনা-বিচারে পড়িয়া ফেলিতেন। পরবর্ত্তী দশ বৎসর তাঁহার ধর্ম্মজীবনের শিক্ষানবিশীর কাল। ১৭৯১ সালে হানা শেফার্ডের সঙ্গে তাঁহার বিবাহে তিনি ব্যাপটিষ্ট-মণ্ডলীভুক্ত হইবার সুবিধা পান, হানা বিখ্যাত ব্যাপটিষ্ট পরিবারের সন্তান। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রিষ্টলে একটি স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং ব্যাপটিষ্ট একাডেমির



জোশুয়া মার্শম্যান

প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাইল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এখানেই তিনি লাটিন, গ্রীক, হিব্রু ও সিরিয়াক ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাণ্টস'গুলি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গ্রাণ্টের উৎসাহে তিনিও মিশনরীরূপে ভারতবর্ষ যাত্রা করেন। শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার কাল হইতেই তিনি সস্ত্রীক শিক্ষা-বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন, চীনা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। সংস্কৃত রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদে তিনি কেরীর প্রধান সহকারী ছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার স্বদেশ যাত্রা করেন এবং ইউরোপ ঘুরিয়া ১৮২৯ সালে শ্রীরামপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৩৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর ডার্বিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবাবস্থাতেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, মাতা পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই তিনি ডার্বির মিঃ ড্রুরির ছাপাখানায় কিছু কাল শিক্ষানবিশ ছিলেন। ইহার পরেই তিনি 'ডাবি মার্কারি' নামক পত্রিকা সম্পাদনের ভার পান। এই সময়ে তিনি ফরাসী বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতাবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ওয়ার্ড শেষ পর্য্যন্ত 'হাল্ অ্যাডভার্টাইজার'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং হালে অবস্থানকালেই (১৭৯৬, আগষ্ট) ব্যাপটিষ্ট মিশন দলে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জর্ণালিজম ও পলিটিক্‌সে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে ও তিনি এক বৎসরকাল বিখ্যাত প্রচারক ডক্টর ফসেটের শিক্ষাধীনে থাকেন। কেরীর ভারতবর্ষ-যাত্রার প্রাক্কালে এক দিন ওয়ার্ডের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং প্রয়োজন হইলে তিনি বাইবেল-মুদ্রণের কাজে এই যুবকের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া যান। স্বদেশে থাকিয়াই (১৭৯৯) ওয়ার্ড শুনিতে পান, বাংলা দেশে কেরী বাইবেলের অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত মুদ্রাকরের অভাবে ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে না। তিনি অবিলম্বে মিশনের কাজে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সম্পূর্ণ তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শ্রীরামপুরের কাগজ-প্রস্তুতের কারখানাও তিনিই স্থাপন ও পরিচালন করেন। *Account of the* ***Writings, Religion,*** *and Manners, of the Hindoos including Translations from their* ***Principal*** *Works* (In four volumes, Serampore, 1811) তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। ওয়ার্ড বাংলা খুব ভাল না শিখিলেও খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে কয়েকটি চটি প্রচার-পুস্তিকা বাংলায় লিখিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ শ্রীরামপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১ই জানুয়ারি (১৮০০) হইতে মিশনের কাজ সুরু হইল। ওয়ার্ড, ব্রান্সডন ও কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স ছাপাখানা লইয়া পড়িলেন। সুদক্ষ মুদ্রাকর ওয়ার্ডের পরিচালনায় অত্যল্পকালমধ্যে খিদিরপুর হইতে আনীত কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি মিশনবাড়ীর একটি কক্ষে স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা হইতে ক্রীত হরফ সাজাইয়া ওয়ার্ড, ফেলিক্স,

ব্রান্সডন ও এক জন দেশী কম্পোজিটর নিউ টেষ্টামেন্টের ম্যাথুলিখিত সমাচার কম্পোজ করিতে এবং কপি ও প্রুফ সংশোধনের জন্য অবিরত কেরীর পিছনে ধাওয়া করিতে লাগিলেন। ১৮ই মার্চ তারিখে প্রথম শীট (sheet) মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইল। মার্চ মাসের গোড়ায় কলিকাতা হইতে পঞ্চানন আসিয়া শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানার কাজে যোগদান করিয়াছিলেন, সুতরাং টাইপের অসুবিধা যেটুকু ছিল, তাহাও দূর হইয়াছিল। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৮ মার্চ তারিখে লিখিত আছে—

This day brother Carey took an impression at the press of the first page in Matthew

সেদিন মিশন-গোষ্ঠীর উৎসাহের আর সীমা ছিল না। বাংলা দেশের আকাশ-আচ্ছন্ন-করা কুসংস্কারের মেঘ ধীরে ধীরে কাটিয়া আসিতেছে, ইহা মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া সেদিন তাঁহারা উৎসব করিয়াছিলেন।

মিশনের সমস্ত বিভাগের কার্য্যকলাপের পরিচয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ছাপাখানার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। সুতরাং এই ইতিহাসের ধারাই আমরা অনুসরণ করিয়া চলিব। ওয়ার্ডের জর্ণালে ১৬ই মে তারিখের লিখন এইরূপ—

This week we have begun to print the first sheet of the New Testament We print 2,000 copies, of which 1,700 are on Patna paper, and 300 on English We also print 500 of Matthew to give away immediately, which will nearly be an expense of paper only, and so will not cost more than two or three pounds

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের গোড়ায় * 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন-ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত ইহাই সর্ব্বপ্রথম গন্থ-পুস্তক।† এই পুস্তকটি নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহার পাণ্ডুলিপি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতের সাহায্যে কেরী কর্ত্তৃক সংশোধিত ও মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হইলেও টমাস ও রামরাম বসুর অনুবাদকে ভিত্তি করিয়াই এই পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। রামরাম বসু, টমাস ও কেরীর নাম একত্র গ্রথিত করিয়া এই পুস্তকটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১২৫ পৃষ্ঠায় (ডিমাই আটপেজী) সম্পূর্ণ এই পুস্তকের একটি মাত্র কপি শ্রীরামপুর কলেজ-লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে (শো-কেসে) রক্ষিত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। ভাষার নমুনা এইরূপ—

---

* ওয়ার্ডের জর্ণাল, ১৫ই আগষ্ট, ১৮০০

—"and also 500 additional copies of Matthew, for immediate distribution, to which are annexed, some of the most remarkable prophecies in the Old Testament respecting Christ These are now distributing ...."

† খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কর্ত্তৃক গেয় কতকগুলি সঙ্গীত ও রামরাম বসুর 'হরকরা' (কবিতা) ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির কয়েকটি কেরী কর্ত্তৃক রচিত।

যেব কিং আবশ্যক আছে তাহা তোমারদের যাচনের
৯ পূর্ব্বে তোমারদের পিতা জানেন। অতএব তোমরা
এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ
১০ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাওক। তোমার
রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই
১১ মত পৃথিবীতে পালিত হওক। আমারদের দিব
১২ সিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা
আপনারদের দায়ীরদিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই
১৩ মত আমারদের যাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং
আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ
হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজ্য ও পরাক্রম ও
১৪ গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন। অতএব
যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ ক্ষমা করহ তবে
তোমারদের স্বর্গীয় পিতা তোমারদিগকেও ক্ষমা
১৫ করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা মনুষ্যেরদের অপরাধ
না ক্ষমহ তবে তোমারদের পিতা তোমারদের অপ
১৬ রাধও ক্ষমা করিবেন না। অপর যখন তোমরা
উপবাস কর তখন কপটীবর্গের মত বিষণ্ণ বদন হইও
না কেননা তাহারা মনুষ্যেরদিগকে উপবাসী দেখাই
বার কারণ আপনারদের মুখ বিকৃতি করে সত্য
আমি তোমারদিগকে কহি তাহারা আপনারদের
১৭ প্রতিফল পাইয়াছে। কিন্তু যখন তুমি উপবাস করহ
তখন আপন মস্তকে তৈলমর্দন কর ও মুখপ্রক্ষালন
১৮ করহ। তাহাতে যেন তুমি মনুষ্যেরদের প্রতি উপবাসী

শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে সর্বপ্রথম মুদ্রিত মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত
পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত।

আবরহামের সন্তান দাউদ তাহার সন্তান য়িশু খ্রীষ্ট তাহার পূর্ব্ব পুরুষাখ্যান।
আবরহাম হইতে য়িসহকের উদ্ভব ও য়িসহক হইতে য়াকুবের উদ্ভব··· ··· ···

অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করহ হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতঃ তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক। তোমার রাজ্য আইসুক তোমার ইচ্ছা যে মত স্বর্গেতে সেই মত পৃথিবীতে পালিত হউক। আমারদের দিবসিক আহার এই দিবসে দেও। ও যেমত আমরা আপনারদের দায়ীর-দিগকে ক্ষমা করিতেছি সেই মত আমারদের দাওয়া সকল ক্ষমা করহ। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় লওয়াইও না কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করহ কেননা রাজত্ব ও পরাক্রম ও গৌরব তোমার সদা সর্ব্বক্ষণে আমেন।

২৫ মে তারিখে রামরাম বসু আসিয়া মিশনরী-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন এবং খ্রীষ্টমহিমাসম্বলিত 'হরকরা,' 'জ্ঞানোদয়' প্রভৃতি কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের দলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে কেরী বার্মিংহামের স্যামুয়েল পীয়ার্স-লিখিত *A Letter to the Lascars* নামক পুস্তিকার অনুবাদ ও মুদ্রণ করেন।

উদাসীন টমাসও বীরভূমের চিনি ও নীলের কুঠি পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবর মাসের শেষে "খ্রীষ্টের খোঁয়াড়ে প্রবেশেচ্ছু ফকির নামক বীরভূমের একটি মেষ"কে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুরে উপস্থিত হইলেন। ফকির শ্রীরামপুরে কয়দিন অবস্থান করিয়া আত্মীয়দের শেষ দেখা দেখিবার জন্য টমাসের সঙ্গেই বীরভূমে গিয়া আর ফিরিল না। মর্ম্মাহত টমাস শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসিলেন। এইবারে ভগবান্ টমাসের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কৃষ্ণ পাল নামক এক জন ধর্ম্মপ্রাণ ছুতারের গঙ্গাতীরে পদস্খলনের ফলে হাত ভাঙিয়া যায়। ডাক্তার টমাসের চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করে এবং যীশুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার শরণাপন্ন হইতে স্বীকৃত হয়। ২৮ ডিসেম্বর মিশনের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে কৃষ্ণ পাল কেরীর নিকট দীক্ষা লাভ করে। আনন্দে অর্দ্ধোন্মাদ টমাস সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া যান। তাঁহাকে মিশনের একটি ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এই অবস্থায় ১৮০১ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে জন্ ফার্ণাণ্ডেজের গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮০১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা নিউ টেষ্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়। 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' পুস্তকের ভাষা অল্পকালের মধ্যে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া কেরী এইরূপ দাঁড় করান—

এ আবরহামের সন্তান দাউদের সন্তান য়েশু খ্রীষ্টের পূর্ব্ব পুরুষের পুস্তক—
আবরহাম জন্ম দিল য়িছকককে এবং য়িছকক জন্ম দিল যাঁকুবকে···

অতএব এই মত কামনা কর আমারদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক তোমার নাম তোমার রাজ্য আগমন করুক তোমার ইচ্ছা হউক যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীর উপরে অদ্য আমারদিগকে দিও আমারদের নিত্য ভক্ষ এবং মর্য্যাদা কর আমারদিগকে আমারদের দেনা যে মত আমরা মর্য্যাদা করি আমারদের দায় গৃহস্থের দিগকে এবং আনয়ন করিও না আমারদিগকে পরিক্ষায় কিন্তু পরিত্রাণ কর আমারদিগকে আপদ হইতে একারণ রাজ্য ও শক্তি ও নাম তোমার সদাকাল আমেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেরী ভাষার বিন্দুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। বাইবেল-মুদ্রণের ইতিহাস কেরীর শেষ জীবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও প্রাসঙ্গিকজ্ঞানে এইখানেই বর্ণন করিতেছি, শ্রীরামপুর মিশনেরও ইতিহাস এইখানেই শেষ।

১৮০১ সালের ১ম সংস্করণ নিউ টেষ্টামেণ্ট ডিমাই আটপেজী আকার, কোনও পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাই। ইহার ২য় সংস্করণে "১৮০৩" সাল ছাপা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০২ সালে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের The Pentateuch অংশ, ১৮০৩ Job, Song of Solomon, 1807 Isaiah-Malachi, ১৮০৯ Joshua—Esther। ১৮০৭ St. Luke's Gospel, Acts and Romans। ১৮১১ সালে নিউ টেষ্টামেণ্টের তৃতীয় ফোলিও সংস্করণ, ২য় সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ। ১৮১৩ The Pentateuch দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৮১৬ নিউ টেষ্টামেণ্ট ৪র্থ সংস্করণ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এইরূপ ৭টি সংস্করণ হয়।

মার্ডকের ক্যাটালগ হইতে জানা যায় যে, 'হরকরা', 'জ্ঞানোদয়', লাশকারদের প্রতি ও বিভিন্ন খণ্ড বাইবেল ছাড়া মিশন প্রেস হইতে নিম্নলিখিত পুস্তিকাগুলিও মুদ্রিত হইয়াছিল—

ওয়ার্ডের The Missionaries' Address to the Hindoos, কেরী-কৃত অনুবাদ।

পীতাম্বর সিংহের The Sure Refuge (কবিতা)

কেরী-কৃত A Short Summary of the Gospel

মার্শম্যান-কৃত Address to the Hindoos

মার্শম্যান-কৃত The Difference : or Krishna & Christ compared.

Watt's Historical Catechismএর অনুবাদ (কবিতা)

পীতাম্বর সিংহের Good Advice ও The Enlightner.

ইত্যাদি এইরূপ অসংখ্য পুস্তিকা।

মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বেই কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন, সংশোধনে পূরা ১২ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে নিউ টেষ্টামেণ্টের ৮ম সংস্করণ স্থান পাইয়াছে। কেরীর শেষ সংশোধিত ভাষা এইরূপ—

অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমাবদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমাবদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমাদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্ব্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।

ভাষার দিক্ দিয়া কেরী যে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। মুন্শী ও পণ্ডিতদের প্ররোচনা দিয়া ও উৎসাহিত করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কীর্ত্তি তাহার তুলনায় সামান্য। তথাপি তাঁহার নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ফলেই ১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস ওয়েলেসলি কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎসরে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বঙ্গভাষার অধ্যাপক (teacher)-পদে নিয়োগের প্রস্তাব ডেভিড ব্রাউন মারফৎ তাঁহার নিকট পৌঁছে। ভ্রাতৃমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া কেরী ৪ঠা মে ঐ পদ গ্রহণ করেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের স্থান আমার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের বিষয়।

আলোচনা

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইলেও উহার সঙ্গীত-অংশের যাচাই বাস্তবিকই এ-যাবৎ হয় নাই। শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় উপরি-উক্ত প্রবন্ধে ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা) সেই অভাব পূরণ করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আলোচ্য পুঁথির প্রত্যেক পদের পূর্ব্বে রাগ-রাগিণী এবং প্রায়শঃ একাধিক তালের নির্দ্দেশ আছে। 'ভৈরবীরাগঃ। একতালী। রূপকন্ধা।', 'বিভাসরাগঃ। দণ্ডকঃ। একতালী। রূপকন্ধা।', 'বিভাষরাগঃ। রূপকং। যতির্ব্বা।' প্রভৃতি উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এক একটি পদ একটি মাত্র রাগ বা রাগিণী এবং উল্লিখিত তালসমূহের যে কোন একটিতে গেয়। অধিকন্তু প্রবন্ধ নামক গীতে আস্থায়ী আদি চারি তুকে পৃথক্ পৃথক্ তালের ব্যবহার বিহিত; এবং রাগমালা গীতের ভিন্ন ভিন্ন কলিতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীরও সন্নিবেশ স্বীকৃত। যাহা হউক একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে রাগ-রাগিণী ও তালের তথাকথিত বিস্তৃত সমাবেশজনিত অভিনবত্বের কুয়াশা অচিরে কাটিয়া যাইতে পারে। খুব সম্ভব একাধিক তালের উল্লেখই যত গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। পুঁথিলেখকেরা সময় সময় কিরূপ বিভ্রাটে ফেলেন, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অতঃপর মিত্র মহোদয় রাগ-রাগিণী ও তাল-সন্নিবেশের যে কয়টি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পা হা ড়ী আ (পহাড়িকা বা পহাড়ী), গু জ্জ রী (গুর্জ্জরী), রা ম গি রী (রামকিরী, রামকলী বা রামকেলী), বি ভা ষ (বিভাষিকা, বিভাষী বা বিভাষা) প্রভৃতি রাগিণী সর্ব্বজন-সুপরিচিত। কো ড়া রাগিণী নারদ-সংহিতার মতে মল্লার রাগের অনুগতা। মা ল ব (মালবী) হনুমন্মতে শ্রীরাগের রাগিণী; কিন্তু নারদ-সংহিতায় মালব ছয় রাগের অন্যতম। অপ্রসিদ্ধ হইলেও ক্রী ড়া, কু ড়্ক প্রভৃতি তাল যখন সঙ্গীত-রত্নাকরে গৃহীত হইয়াছে, তখন তাহাই পর্য্যাপ্ত। অ ঢ়্ক লিপিকরপ্রমাদ। রূ প ক, ল গ্ন ক আদি তালও অপ্রধান নহে। জ য় জ য় জয় বা জয়শ্রী'র মধ্যে একটি তাল হইতে পারে। প্র কী র্ণ ক মনে হয়, শব্দটি সঙ্কীর্ণ তাল অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহোদয় উইলসন (H. H. Wilson) তাঁহার সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানে প্রকীর্ণক শব্দের একটি অর্থ দিয়াছেন, Any collection of heterogeneous objects not arranged under any distinct classes or heads। চি ত্র বা চি ত্র ক প্রাচীন তালের মধ্যে ধৃত হইয়াছে; এবং লিপিকরের লেখনী অগ্রে বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে ও উহার পরে দুই দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে। দ ণ্ড ক সম্ভবতঃ একটি ছন্দাত্মক তাল। ধ্রুপদের একটি বিভাগই ছন্দ। রূ প ক ধা নহে, শব্দটি রূপকন্ধা। ইত্যাকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্ত গ্রন্থ-সম্পাদকও অবশ্য কম দায়ী নহেন। এখন অসঙ্কোচে

বলা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত সুর ও তালের কোনটিই অর্ব্বাচীন অথবা অশাস্ত্রীয় নয়।

প্রবীণগণের মুখে শুনিয়াছি, অসংখ্য রাগ-রাগিণী ও তালের অধিকাংশই কালের কুক্ষিগত হইয়াছে; কতক বা নামে মাত্র আছে এবং অল্প কতিপয় নামকের করিয়া কারবার চালাইতেছে। প্রাদেশিক প্রণালী ব্যতীত সাময়িক সংস্কার সত্বে সঙ্গীতের একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল, যাহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল মার্গ সঙ্গীত (Music par-excellence)। এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়। মিত্র মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দেশীয় বা স্থানীয় রীতির কি পরিচয় পাইয়াছেন, আমরা জানি না। তাঁহার কথার ভাবে মনে হয়, চর্য্যাপদে তালের অনুল্লেখই যেন প্রাচীন ও সরল রীতির পরিচায়ক। তাহা হইলে বিদ্যাপতির পদাবলী, এমন কি রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রভৃতিও গীতগোবিন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে। কেন না, বিদ্যাপতির পদাবলী ও রাম রায়ের গীতে কেবল সরল সুরের উল্লেখ আছে, তালের উল্লেখ নাই। চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর মধ্যে ব্যবধানও ৪০০।৫০০ বৎসর। আর চর্য্যাপদ এক মরমী সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গীত। সঙ্গীতের কলা-কৌশল প্রদর্শনের প্রকৃত ক্ষেত্রও উহা নহে। আমরা উপরে দেখাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত সুর ও তাল প্রাচীন এবং শাস্ত্রসম্মতও বটে। তবে উহার সঙ্গীত-প্রণালীর উপর দেশ-কালের প্রভাব আদৌ পড়ে নাই, বলাও সঙ্গত নয়। সুতরাং উক্ত রীতি বেশী প্রাচীন নহে, কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে?

একাধিক তালের উল্লেখ থাকিলেও যখন এক একটি পদ একটি সুর ও একটি তালে গীত হইবার ইঙ্গিত রহিয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও গীতগোবিন্দে একই রীতির অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে, বলা চলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন অনেক স্থলে জয়দেবের একান্ত অনুকরণ বলিয়া সর্ব্বত্র যে তাহা করিতে হইবে ইহারও কোন মানে নাই। গীতগোবিন্দ অপেক্ষা বড়ু চণ্ডীদাসের গ্রন্থে ব্রজলীলার অনেকখানি বেশীই পাওয়া যায়। পণ্ডিতসমাজে একটা মতও প্রচলিত আছে যে, গীতগোবিন্দের রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকার উভয়েরই উপজীব্য কোন এক প্রাচীনতর প্রাকৃত-অপভ্রংশ আদর্শ।

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সাঙ্গীতিক পদ্ধতি অনুসৃত না হইবার প্রধান কারণ, বইখানা মোটেই গীতিকবিতার নয়। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐরূপ সুরের উল্লেখ আছে, তালের নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর পুঁথিখানা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী হইলে অবশ্যই তাঁহার প্রসঙ্গ থাকিত। তাহা থাকা দূরে যাউক, একটা তিলক-ফোঁটার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। বরং উহাতে এমন সব কথা আছে, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের আদপে অনুকূল নহে। এবং তাহাই পুঁথির প্রাচীনত্বের একতম প্রবল প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যেহেতু পুঁথিখানা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে এবং খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে বিষ্ণুপুর সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে, সেই হেতু পুঁথির দেশ বিষ্ণুপুর ও কাল ১৭শ শতক, সিদ্ধান্তটা কেমন যেন শোনায় না কি? বিষ্ণুপুর রাজগণের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায়, ১৩শ শতাব্দীর শেষ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভেও বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল। তর্কের অনুরোধে না হয় মানিয়া লওয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা চৈতন্য-পরবর্ত্তী। এখন জিজ্ঞাস্য, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলির আস্বাদ লইতেন? শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীতে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ আছে। ঐ দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের খোঁজ আমরা পাইয়াছি কি?

যদি তাহা পাইয়া থাকি, তবে কোন্ দুইটি পালা? আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পুরাতন সমস্যার আসিয়া পড়া গেল। যাহা হউক, সম্যক্ সমাধান বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর আবিষ্কৃত দুইখানি পুঁথিই কীর্ত্তনের তালের পুঁথি। সুতরাং তাহাতে মার্গ সঙ্গীতের তালের প্রত্যাশা করা যায় না। আর পুঁথি দুইখানিতে উদাহরণস্বরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য, ওগুলিকে কীর্ত্তনে আদায়ের প্রয়াস। পূর্ব্বে বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গীতের ন্যায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদও কীর্ত্তনে গীত হইত না। অনেকেই শুনিয়াছেন, পুরীর শ্রীমন্দিরে আ'জও গীতগোবিন্দ কীর্ত্তনে গাওয়া হয় না।* রায় বাহাদুরের স্মরণ থাকিতে পারে, তিনিও প্রদেশান্তরে জয়দেবের গীত শুনিয়া আসিয়াছেন, নিশ্চিতই তাহা কীর্ত্তনে নয়।

মাঙ্গএ সুরতি দান সান দেই মাথে। (২য় সংস্করণ, পৃ. ৪০)

রায় বাহাদুর 'সান দেই মাথে' পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা জোর করিয়া মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করা অর্থ করিয়াছি। বস্তুতঃ পাঠে ভুল নাই, অর্থও সোজা। উদ্ধৃত পঙ্ক্তিটির অর্থ, [শ্রীকৃষ্ণ] মস্তক দ্বারা ইঙ্গিত দিয়া সুরতি দান মাগিতেছেন। অন্যত্র,

নিছাই মাথাএ পাড়এ সান। (২য় সংস্করণ, পৃ. ২)

সা ন প্রা° সন্না, সন্না (সংজ্ঞা); সিন্ধী সৈনা, হিন্দী সৈন। (১) বংশীধ্বনি-পূর্ব্বক কামাচার অনুজ্ঞা বা আমন্ত্রণ; (২) হস্তাদি সঞ্চালন সহকারে আহ্বান-চেষ্টা; (৩) হর্ষামর্ষাদির অভিব্যঞ্জক সঙ্কেত-ভেদ। পদাবলীতে যাইতে হইবে কেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ঘাঅত উপর ঘাঅ বাঁশীর সান। (২য় সংস্করণ, পৃ. ১৩৮)
কাহ্নাঞিঁ বাঁশীত দিল সানে। (ঐ, পৃ. ১৩৯)

এখানে আরও কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল।

শঙ্খদত্ত তারে কয় জলের পরীক্ষা নয়
　　পথিক সহিতে ছিল সান। (কবিকঙ্কণ)
দেই রামা হাত সান ধনপতি ত্যজি মান
　　দণ্ডবতে পড়িল চরণে। (ঐ)
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে।
　　　　(কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ)
ওড়ন কাড়ে বলে সানে।
ভাক লইয়া ঘর কেনে। (ডাক)

পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় এখন দেখিবেন, 'সান দেই' কথাটির কেমন চমৎকার অর্থসঙ্গতি হয়। বীরভূমে কেন, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশ, বাঁকুড়া, মানভূম অঞ্চলেও ঘোমটা দেওয়া অর্থে সান কাড়া কথা চলিত আছে।

ভাষার বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রাপ্ত পুঁথি দুইখানির মধ্যে যদি বেশী দিনের ব্যবধান অনুমিত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে লিপিকর প্রাচীন রূপটি রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পরীক্ষা প্রয়োজন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের সহিত বৈষম্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারে একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় হইয়াছিল। আমরা পুঁথির অপ্রাপ্তি জন্ম অনুযোগ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন, প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির যথোচিত অনুসন্ধান হইয়াছে? জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, শূন্তপুরাণ, চর্য্যাপদ প্রভৃতির পুঁথিই বা কয়খানা পাওয়া গিয়াছে? কীর্ত্তনের তালের পুঁথিদ্বয়ে উদাহৃত গীতগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবের অস্তিত্ব কল্পনা করিবার মত কিছু আমরা পাই নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের কএকটি গীত কীর্ত্তনে আদায়ের প্রচেষ্টাই সঙ্কলন-পদ্ধতিতে প্রকাশ পায়। অতি-বড় দুঃসাহস কি না জানি না, 'এক কাল হইল মোর যমুনার জল।' ইত্যাদি বিকৃত, রূপান্তরিত, আধুনিকতাপাদিত পদটার মূল বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াই আমরা মনে করি। পদটা বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইবার চেষ্টা নয়, দ্বিজ চণ্ডীদাসই 'একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।' পদে বড়ুকে অনুকরণ করিয়াছেন, বলা যায়। পদটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এ না থাকিবার কারণ, পুঁথি খণ্ডিত।

রায় বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও নবাবিষ্কৃত পুঁথির মধ্যে ভাবধারার সাম্য লক্ষ্য করিয়াছেন, কবিবারই কথা। পুঁথি দুইখানিতে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর) পদের নকল। নকলে অল্প-শিক্ষিত পুঁথি-লেখক দ্বারা যাহা বা যেমনটি হয়, তাহার অতিরিক্ত ভাবধারার বৈচিত্র্য বা বৈলক্ষণ্য ইত্যাদি কামনা করা যায় না।

আলোচনার সার্থকতা আপেক্ষিক, মীমাংসাও বাহিরের বস্তু নহে।

প্রত্যুত্তর

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আমার উপরিউক্ত প্রবন্ধের যে 'আলোচনা' করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে পরিষৎ-পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় আমার বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বসন্ত বাবু বলেন, প্রবন্ধ ও রাগমালা গীতের "ভিন্ন ভিন্ন কলিতে বিভিন্ন রাগ রাগিণীরও সন্নিবেশ স্বীকৃত। যাহা হউক, একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে রাগ রাগিণী ও তালের তথা-কথিত বিস্তৃত সমাবেশজনিত অভিনবত্বের কুয়াশা অচিরে কাটিয়া যাইতে পারে।" তার পরক্ষণেই বলিতেছেন "খুব সম্ভব একাধিক তালের উল্লেখই যত গণ্ডগোল বাধাইয়াছে। পুথিলেখকেরা সময় সময় কিরূপ বিভ্রাটে ফেলেন, ইহা তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।" কিন্তু এই দুইটি উক্তি যে কতখানি পরস্পর-বিরুদ্ধ, তাহাও একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন। কারণ, যদি 'গণ্ডগোল বাধাইয়াছে' ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে 'তথাকথিত' শব্দের ব্যবহার চলে না। এবং পুথি-লেখক যদি 'বিভ্রাটে ফেলিয়া থাকেন' তাহা হইলে একটু অভিনিবেশে তাহার কুয়াশা কিরূপে কাটিতে পারে? একখানি তথাকথিত প্রাচীন পুথি যখন আমাদের সম্বল, তখন তাহারই সাহায্যে আমাদের সত্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এক্ষেত্রে এক মূল পুথির কল্পনা করিয়া লিপিকারের স্কন্ধে দোষ চাপাইবার চেষ্টা করিলে তর্ক অগ্রসর হইতে পারে না এবং সত্যনির্ণয়ের চেষ্টাও ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু কৃষ্ণকীর্তনের পুথিখানি যে নকল, আমার প্রবন্ধ বাহির হওয়ার পরে বসন্ত বাবুর এই স্পষ্ট স্বীকৃতি দেখিয়া আন্তরিক সুখী হইলাম। পুথিখানির বয়স যে ২৫০।৩০০ বৎসরের অধিক নহে এবং উহাই যে তাহার রচনাকালও বটে, এই সন্দেহই আমরা বরাবর করিয়া আসিতেছি।

বসন্ত বাবু প্রবন্ধ সঙ্গীত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। "প্রবন্ধ নামক গীতে আস্থায়ী আদি চারি তুকে পৃথক্ পৃথক্ তালের ব্যবহার বিহিত", ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? প্রবন্ধ সঙ্গীতের চারিটি অংশ আছে—যথা উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ।

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ।
উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমস্তত্র ততো মেলাপকধ্রুবৌ।
আভোগশ্চেতি তেষাং চ ক্রমাল্লক্ষাভিদধ্মহে।—সঙ্গীতরত্নাকর

ধাতু অর্থে গেয়, অর্থাৎ যাহা গান করিতে হয়। তাহার প্রথমাংশ অর্থাৎ 'ধরতা'কে উদ্‌গ্রাহ বলে। গানের মধ্যে যাহা নিত্য, তাহাকে বলে ধ্রুব। উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের মধ্যে যে অংশ, তাহাকে মেলাপক বলে। সব শেষের অংশের নাম আভোগ।

উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমো ভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃত.।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাৎ আভোগস্তন্তিমো মতঃ।—সঙ্গীতরত্নাকর

ধ্রু কলি ও আভোগের মধ্যে যে অংশ থাকে, তাহাকে 'অন্তরা' বলে।

ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ।—ঐ

এইরূপ চতুষ্কন্ধ সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশ যে ভিন্ন ভিন্ন সুর তালে গীত হইত, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এখনও মার্গ সঙ্গীতে স্থায়ী অন্তরা আভোগ সঞ্চারী আছে। কিন্তু সেগুলি একই সুরে ও একই তালে গীত হয়।

আমরা যত দূর জানি, তাহাতে 'তাল ফেরতা' আছে শুধু কীর্তনে। কিন্তু কীর্তনের বর্ত্তমান পদ্ধতি মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সুতরাং সেদিক্ দিয়াও কৃষ্ণকীর্তনের বয়স বেশী হইতে পারে না। বসন্ত বাবু বিভাষ, মালকোষ, পাহাড়ী, কোড়া প্রভৃতি কয়েকটি সুপরিচিত রাগরাগিণীর শাস্ত্রমূলকতা দেখাইয়া বলিতেছেন, "এখন অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ ব্যবহৃত সুর ও তালের কোনওটিই অর্ব্বাচীন অথবা অশাস্ত্রীয় নহে।" এরূপ উক্তি একেবারেই যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ, তিনি কোনওটিকে বলিতেছেন লিপিকরপ্রমাদ, কোনওটিকে 'সম্ভবতঃ', 'হইতে পারে' ইত্যাদি পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, অথচ তাঁহার 'অসঙ্কোচে' বলিতে দ্বিধা হইতেছে না—ইহা কিরূপে সম্ভবে?

কৃষ্ণকীর্তনের সুর ও তালের মধ্যে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহা আলোচ্য প্রবন্ধে আমি দিতে ত্রুটি করি নাই। যেগুলির সন্ধান আমি পাই নাই, তাহারই প্রতি বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু সে সম্বন্ধে কোনও আলোকপাত করিতে পারেন নাই।

'রূপকথা' কি বস্তু? আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু বলিয়াছেন, 'রূপকত্বা' হইবে। কিন্তু পুথিতে কি আছে? 'রূপকথা' না রূপকত্বা? যদি লিপিকারের দোষে রূপকত্বা রূপকথায়

রূপান্তরিত হইয়া থাকে, তবে তিনি নিজের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে প্রয়াসী কেন? কেননা, তিনি বলিয়াছেন, "ইত্যাকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য গ্রন্থ-সম্পাদকও কম দায়ী নহেন।" এতদ্ভিন্ন আমাদের ধারণা ছিল যে, কৃষ্ণকীর্তন একখানি সুসম্পাদিত গ্রন্থ, কিন্তু বসন্ত বাবুর এইরূপ অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে আমরা উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি না। কিন্তু তিনি যে 'রূপকথা'কে রূপকথায় পরিণত করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে? গ্রন্থখানিতে অন্ততঃ দুইবার 'ঋতিবর্থা' আছে, কাজেই তাঁহার পক্ষে তুলনা করা কঠিন ছিল না।

'জয়জয়' কি? জানিতে চাহিয়াছিলাম। বসন্ত বাবু "জয় বা জয়শ্রীর মধ্যে একটি তাল হইতে পারে" বলিয়াছেন। কিন্তু কোনো প্রমাণ দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। 'লঘুক তাল অপ্রসিদ্ধ নহে'—তাহাই বা তিনি কোথায় পাইলেন? কোনও একটি বিষয় যখন বিবদমান, তখন প্রমাণপ্রয়োগ ব্যতীত কিছু বলা সঙ্গত নহে।

'প্রকীর্ণক' শব্দের যে অর্থ তিনি উইলসনের অভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন (heterogeneous বা miscellaneous) তাহার সমালোচনা আমি আমার মূল প্রবন্ধে করিয়া দেখাইয়াছি যে, ঐ অর্থ সমর্থিত হইতে পারে না। যেখানে তালমানের যথেষ্ট বিবরণ দেওয়া আছে, সেখানে 'বিষয়-বিভাগেন বিনা প্রবৃত্তত্বম্' (সঙ্গীতরত্নাকর) প্রকীর্ণকের অবকাশ কোথায়? বসন্ত বাবু বলেন, "প্রকীর্ণক মনে হয় শব্দটি 'সঙ্কীর্ণ তাল' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।" প্রকীর্ণ অর্থে সঙ্কীর্ণ, ইহা সাধারণ বুদ্ধিগম্য নহে। তার পর 'সঙ্কীর্ণ তাল' অর্থ কি? সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র রাগ বুঝা যায়, তাল আবার সঙ্কীর্ণ হইতে পারে না কি? যদি প্রকীর্ণক অর্থ সঙ্কীর্ণ তাল হয়, তাহা হইলে 'কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক' (কৃ-কী, ৩৮০ পৃ) শব্দের অর্থ কি হইবে, তাহা কি বসন্ত বাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

বিন্দুমাত্র প্রমাণ-প্রয়োগ না দিয়া বসন্ত বাবু অবলীলাক্রমে বলিতেছেন, "প্রাদেশিক প্রণালী ব্যতীত সাময়িক সংস্কার সত্ত্বেও সঙ্গীতের একটি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ছিল, যাহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল মার্গ সঙ্গীত (music par excellence) এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়।" যে বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারসাপেক্ষ, তাহাকে 'অনুমান হয়' বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমস্যাই এখানে এই যে, ঐ পুথিতে এমন সব সুর ও তালের সন্ধান পাইতেছি, যাহা মার্গ অথবা দেশী আখ্যাযুক্ত সঙ্গীতের মধ্যে মিলিতেছে না। সেই জন্য আমি আমার মূল প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্তন বাঁকুড়া অঞ্চলের তৎকাল-প্রচলিত কোনও সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির ইঙ্গিত দিতেছে।

আমি ঐ প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন কোনও পুথিতে কৃষ্ণকীর্তনের ন্যায় সুর-তালের বিস্তৃত উল্লেখ নাই। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। তাহার উত্তরে বসন্ত বাবু বলিতেছেন, গীতগোবিন্দে সুর ও তালের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীতে, রামরায়ের গীতে শুধু রাগরাগিণীর সরল উল্লেখ আছে, তাহা হইলে কি ঐগুলি জয়দেবের পূর্ববর্তী? বস্তুতঃ আমি এরূপ বলি নাই যে, সরল হইলেই তাহা প্রাচীন বা প্রাচীনতর হইবে। আমি বলিয়াছি যে, চর্যাপদে রাগরাগিণীর, গীতগোবিন্দে একটি রাগিণী বা একটি রাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। কোথায়ও কৃষ্ণকীর্তনের অত্যদ্ভুত রীতি দেখিতে পাই না। ইহার উত্তর কি? সঙ্গীতের এই অভিনব ধারা কৃষ্ণকীর্তন পুথির বয়স নির্দেশে সহায়তা করিতেছে। এবং মণীন্দ্রমোহন

বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত পুথি হইতেও এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত হইতেছে। ঐ পুথির আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাতেও সুর-তালের প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ (emphasis) দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকীর্তন ও ঐ পুথি দুইখানির প্রাচীনতর পুথির মধ্যে কালের ব্যবধান খুব বেশী নহে। এই দুইখানি পুথি ব্যতীত আর কোথায়ও কৃষ্ণ-কীর্তনের পদ অবিকল উদ্ধৃত হয় নাই। সুর-তালের উদাহরণ হিসাবে একমাত্র বড়ু চণ্ডীদাসের পদই ঐ পুথিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে ঐ গীতগুলির অনুশীলন ছিল। এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার না করিলে কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঐ পুথির সম্বন্ধ নির্ণয় কঠিন হইয়া পড়ে।

বসন্ত বাবু অন্য একটি সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, কৃষ্ণকীর্তনে "মার্গ সঙ্গীত অনুসৃত হইয়াছে" আর মণীন্দ্রবাবুর পুথিতে সেই "পদগুলিকে কীর্তনে আদায়ের প্রয়াস"। "বিদ্যাপতি জয়দেব প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের গীতের ন্যায় বড়ু চণ্ডীদাসের পদও কীর্তনে গীত হইত না।" ইহা তিনি কোথায় পাইলেন? আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, এখন কীর্তন যে-প্রণালীতে গীত হয়, পূর্বে সেরূপ নিশ্চয়ই হইত না। কারণ, বর্তমান কীর্তন-সঙ্গীতরীতি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ে উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্বে জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদাবলী কোন্ প্রণালীতে গীত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি সুর ও তাল কীর্তনে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; সুর যথা: বিভাষ, শ্রী, ধানশী (ধানুষী), মল্লার, রামকেলি (রামগিরি), বেলাবলী, বরাড়ী, কেদার, ললিত, বসন্ত, ভৈরবী ইত্যাদি; তাল যথা: রূপক, একতালী, যৎ (যতি), অষ্টতাল (আঠতাল) ইত্যাদি। প্রাপ্ত পুথি দুইখানিতে কৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি সুর ও তাল আছে; সুর যথা: পাহিড়া, বরাড়ি (বাড়ারি), ধানশী, বসন্ত, শ্রী ইত্যাদি। তাল যথা: রূপক, যতি (জোতি)। এই দুইখানি পুথিতে আবার এমন সুর ও তাল পাইতেছি, যাহা কীর্তনে অপরিজ্ঞাত; সুর যথা: বাগেশ্রী (বাগশ্রী), পাহিড়া ইত্যাদি। তাল যথা: চুটখিলা (বা ছোটখিলা), আলুটি, অপূর্ব কলিকা, জলদকান্তি ইত্যাদি। সুতরাং ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণকীর্তনের মার্গসঙ্গীত পরবর্তী পুথিতে কীর্তনে আদায় করিবার চেষ্টা হইয়াছে? আমার বোধ হয়, বসন্ত বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধিৎসা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিতেন।

অতঃপর সঙ্গীতের দিক্ ছাড়িয়া তিনি মামুলি যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের "পরবর্তী হইলে কৃষ্ণকীর্তন-এ অবশ্যই তাঁহার প্রসঙ্গ থাকিত। তাহা থাকা দূরে যাউক, একটা তিলক কোঁটার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।" 'তিলক কোঁটা'র চিহ্ন না থাকিলেও খোল-করতালের অভাব নাই। খোল করতাল মহাপ্রভুর নামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনও গ্রন্থে চৈতন্যের নামগন্ধ না থাকিলেই যে তাহা তাঁহার পূর্ববর্তী, এরূপ বলিতে পারা যায় না। ভবানন্দের হরিবংশেও ত মহাপ্রভুর নামগন্ধ নাই; তবে তাহাও কি চৈতন্য-পূর্ববর্তী বলিব? এমন হইতে পারে যে, যে-কারণে হরিবংশে 'তিলক কোঁটার চিহ্ন' নাই, সেই কারণেই হয়ত কৃষ্ণকীর্তনেও নাই। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাসের রামায়ণে এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে তিলক-কোঁটার চিহ্ন বর্তমান, সেগুলিকে কি আমরা চৈতন্য-পরবর্তী বলিব? আমার বোধ হয়, বিশ্ববল্লভ মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ভবানন্দের হরিবংশ এবং চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন, উভয় গ্রন্থই চৈতন্যবর্জিত সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ। এরূপ সম্প্রদায়ের অভাব এ দেশে পূর্বেও ছিল না এবং এখনও হয়ত নাই।

হরিবংশে এবং কৃষ্ণকীর্তনে যে ভাবধারা দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে তিলক-কৌটার তাদৃশ সামঞ্জস্য নাই। এই সম্প্রদায়ের মতবাদ চৈতন্যধর্ম-বিরোধী। ইহাদের মতে একমাত্র কাম্য—যৌন সম্মিলন; তাহাতে সম্বন্ধ-বিচারের প্রয়োজন নাই। ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য এ সবই মিথ্যা, লোকাচার মাত্র।

তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাই মুনির সমত।

* * *

নিজ পর নারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপণ সব মিছা জান তারে।

—কৃষ্ণকীর্তন, ৬৬ পৃ. (১ম সং)

নিজপর নারি দোশ নাহিক শংশারে।
জত শতিপনা শব মিছা জান তারে।

—প্রাচীনতর পুথি (সাঃ পঃ পত্রিকা, পৃঃ ১২৪)

কৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ মাতুলানীর অঙ্গসঙ্গ করিতে ব্যস্ত। ভবানন্দের কৃষ্ণ রাধিকার ননদিনী অর্থাৎ যশোদার ভগ্নী (তথা কৃষ্ণের মাসী) মহোদার সহিত রতি উপভোগ করিতেছেন। (হরিবংশ—৪৪ পৃ.) বসন্ত বাবু ইহার পরও তিলক-কৌটার প্রত্যাশা করেন?

আরও তুলনা করুন:

প্রথম প্রহর রাত্রি ফুটিল লবঙ্গ।
যৌবন থাকিতে প্রিয়া কর রস রঙ্গ।
ভাল কিবা মন্দ বোলি মনে ভাবি চাও।
যার থাকে ধনকৌড়ি খাও আর বিলাও।—হরিবংশ, ৩৪ পৃ.

মাতুলানী-লঙ্ঘন যে বিশেষ দোষের নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ভবানন্দ বহু উদাহরণ জোগাড় করিয়া শেষে বলিতেছেন:

বাপ পুত্র খুড়া ভাই ছোট ভাইয়ে লজ্যে।
সকল গোষ্ঠীর রতি এক জনার সঙ্গে।—ঐ, ৯৮ পৃ.

হরিবংশেও বড়াই ঘটকী। একটু প্রভেদ এই যে, ভবানন্দের বড়াই বুড়ী নিজেও কামমোহিতা।

গোবিন্দের রূপ দেখি কন্দর্প সমান।
কামে জর্জরিত বড়াই হত হৈল জ্ঞান।—ঐ, ২৩ পৃ.

বসন্ত বাবু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন যে, চৈতন্যের প্রসঙ্গাভাব প্রাচীনত্বের লক্ষণ বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহার অবগতির জন্য আরও কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি:

(১) চৈতন্য-সম্প্রদায়ে ভাগবতকে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। 'ভাগবতং প্রমাণমমলম্।' কৃষ্ণকীর্তনে কবি ভাগবতের অনুসরণ করেন নাই। ঐ গ্রন্থে কেশাবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, যাহা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এই বাক্যের বিরোধী। যমলার্জুনকে কংসচর অসুর বলা হইয়াছে। ইহা ভাগবতের মতবিরুদ্ধ। কৃষ্ণকীর্তন যে ভাগবতের পূর্ববর্তী, এ কথা ত কেহ বলেন না।

(২) কৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ রাধাকে যেরূপ শালী, পামরী, ছিনারী, আহিরী ইত্যাদি গালি দিয়াছেন, তাহার নিদর্শন প্রাচীন সাহিত্যে মিলে কি ?

(৩) দানঘাটের কলহে যে ভাব দেখিতে পাই, তাহার অনুরূপ কোনও প্রামাণিক গ্রন্থেই নাই। কৃষ্ণ রাধার উপর বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে রাধা বলিতেছেন যে, আমরা ষোল শত গোয়ালিনী বিকে (বিক্রয়ার্থ) যাই ; তোমাকে 'মাও কিলে কিলাআঁ মারিবো তোক্ষা বাটে।' কৃষ্ণ তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর করিতেছেন :

ছাওয়াল না দেখ মোরেঁ মাথা খোড়া চুলে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ভুসাঞাঁ মারিবোঁ তোক্ষা হেলে॥

এরূপ কিলানো, ভুসানো ইত্যাদি রুচির দিক্ দিয়া যাহাই হউক, আধুনিকতাপরকী মনে না করিয়া পারা যায় না।

(৪) রাধাকে কৃষ্ণ শেষ পর্য্যন্ত মারিয়াই ফেলিলেন।

বাম হাতে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান॥

তার পর কৃষ্ণ ঝাড় ফুঁক করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিলেন বা তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। ইহাও প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

(৫) শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে প্রোষিতভর্ত্তৃকা শ্রীরাধার বিরহ-বর্ণনা পদাবলী সাহিত্যে দেখিতে পাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'রাধা বিরহ' সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মদনবাণে জর্জরিতা রাধা কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ করিবার জন্য ব্যাকুল। ইহাই রাধাবিরহ। কৃষ্ণ তাঁহার কাকুতি মিনতি প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন, 'আমি এখন যোগে মন দিয়াছি, মনপবন স্থির করিতে ব্যস্ত (প্রাণায়াম ?), আমাকে ও-সব কথা বলিও না।' কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের উল্লেখ আছে কি ?

(৬) এই বিরহের পর ক্ষণিক মিলনান্তে কৃষ্ণের অকারণ মথুরা-প্রস্থানের কথা আছে। রতিশ্রান্তা নায়িকা যখন নায়কের উরুতে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রাগতা, সেই অবসরে নায়ক উঠিয়া মথুরায় চম্পট দিলেন। বড়াই বুড়ী তখন তাঁহাকে গাছের ডালে ডালে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাহিত্যে এরূপ ব্যাপার কোথাও পাওয়া যায় কি ?

এরূপ দৃষ্টান্ত অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, বসন্ত বাবু নিজেই বলিতেছেন যে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন সব কথা আছে, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের আদপে অনুকূল নহে। এবং তাহাই পুঁথির প্রাচীনত্বের একতম প্রবল প্রমাণ।" এইরূপ উক্তির মূলে একটি ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। এবং তাহা এই যে, মহাপ্রভুর পূর্বে বৈষ্ণব ধর্ম বা বৈষ্ণব সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়াও যদি লিখিতে পারিয়া থাকেন, 'মাধব হম পরিণাম নিরাশা', 'হে হরি বন্দোঁ তুয়া পদ-নায়' এবং এইরূপ বহু কবিতা, তাহা হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি চৈতন্য-পূর্ববর্তী হইলে, তাঁহার নিকটই বা আমরা সে ভাব প্রত্যাশা করিব না কেন ? বিদ্যাপতির অবিসংবাদিত পদগুলির সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও ভাব তুলনা করিলে, বসন্ত বাবুর 'একতম প্রবল প্রমাণ' টিকিতে পারে না। মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বা জয়দেব, ইহাদের কাহারও না কাহারও অনুসরণ করিলে প্রাচীনত্বের দাবী সমর্থিত হইতে পারিত। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন শব্দ আছে, এমন ছন্দ আছে, এমন পদ আছে, যাহা পরবর্তী সাহিত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রবিরোধী

বৈষ্ণবসাহিত্যবহির্ভূত এবং সর্বকালে মানবের রুচিবিগর্হিত ব্যাপার আছে বলিয়াই আমার ধারণা যে, কৃষ্ণকীর্তন চৈতন্ত-পরবর্তী কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের গ্রন্থ। এবং সঙ্গীতের দিক্ দিয়াও সেই মত সমর্থিত হইতেছে।

'মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে।'—এই কলিটির অর্থ লইয়া আমি আমার প্রবন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় পাদটীকায় তাহার একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি মনে করেন, "উত্তমপুরুষে 'দেই' ক্রিয়ার প্রয়োগ সেকালের সাহিত্যে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে 'সান দেই' কথাটির চমৎকার অর্থসঙ্গতি হয়।" কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, বসন্ত বাবু এই অর্থটির সুখ্যাতি করিলেও তিনি তাঁহার পূর্বপ্রদত্ত অর্থই সমর্থন করিতে চাহেন। বসন্ত বাবু 'দেই'কে অসমাপিকা ক্রিয়া ধরিয়া অর্থ করিতেছেন 'মস্তক সঞ্চালন করিয়া'। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্যে এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। কিন্তু বসন্ত বাবুর পাঠ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে মণীন্দ্রবাবুর পুথিতে অন্যরূপ পাঠ আসিল কেমন করিয়া? মণীন্দ্র বাবুর উভয় পুথিতে 'সান' স্থলে 'অস্থানে' এবং 'মাথে'র স্থলে 'হাথে' আছে।

বসন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের কোন্ পদগুলির আস্বাদ লইতেন?' এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে কৃষ্ণকীর্তনের কালনির্ণয় করা আবশ্যক। যদি কৃষ্ণকীর্তন মহাপ্রভুর পরবর্তী হয়, তাহা হইলে তিনি যে কৃষ্ণকীর্তনের পদ আস্বাদন করিতেন, একথা উঠিতেই পারে না।

শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার ভাগবতের টীকায় চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির উল্লেখ করিয়াছেন সত্য। বসন্ত বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, 'তাহার খোঁজ আমরা পাইয়াছি কি?' কিন্তু সেগুলির খোঁজ না পাইলেই আমরা কৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড বুঝিব, ইহাই বা কিরূপ যুক্তি? প্রথমতঃ গোস্বামীপাদ দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নামক দুইখানি কাব্যের কথা বলিয়াছেন. কৃষ্ণকীর্তনের অন্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড তাহাতে বুঝায় না। যদি এই কাব্যখানি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণকীর্তনেরই নাম করিতেন। কালিদাসের কুমারসম্ভবের চতুর্থ সর্গ রতি-বিলাপ—অতি সুন্দর। কিন্তু কেহ কি বলিবে যে, কালিদাসের রতিবিলাপ একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য? তার পর কৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড নৌকাখণ্ড কি সত্যই এত উৎকৃষ্ট যে, বৈষ্ণবতোষণীর ন্যায় প্রসিদ্ধ টীকায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ সুকবি সনাতন গোস্বামী কর্তৃক উল্লিখিত হইতে পারে? আসল কথা সম্ভবতঃ এই—চণ্ডীদাসের যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড সনাতন গোস্বামীর অভিপ্রেত, তাহার সন্ধান আমরা পাই নাই।

পরিশেষে 'এক কাল হৈল মোর জমুনার জল।' এই পদটি বসন্ত বাবুর মতে, 'বড়ু চণ্ডীদাসেরই বটে, দ্বিজ-চণ্ডীদাস তাহা অনুকরণ করিয়াছেন বলা যায়।' কিন্তু প্রমাণ কি? একখানি অতি অর্বাচীন পুথিতে উহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। ঐ পুথি যখন পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (১৩৪০ সাল), তখন এই পদটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখন আমার সন্দেহ হইতেছে যে, উদ্দেশ্য করিয়াই, তর্কের হাত এড়াইবার জন্যই উহা বাদ দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই পদটি কৃষ্ণকীর্তনের কবিতার সহিত খাপ খায় না। তার পর পদকল্পতরু এবং নীলরতন বাবুর আদর্শ পুথিতে ইহা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে। প্রাচীন পুথির পাঠ পরিত্যাগ করিয়া অর্বাচীন পুথির পাঠ গ্রহণ করা বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কখনই সমীচীন নহে। 'কৃষ্ণকীর্তনে পদটা না থাকিবার কারণ, পুঁথি খণ্ডিত।' এ যুক্তি ঠিক নহে।' কিন্তু দেখা যাউক, কোথায় কোথায় পুথি খণ্ডিত এবং তত্তৎস্থলে পদটি থাকার সম্ভাবনা কতদূর? দানখণ্ডে ১৬—১৭।১ এবং ৪১ পৃষ্ঠা মিলিতেছে না। কিন্তু পৌর্বাপর্ব বিচার

করিলে দেখা যাইবে যে, এই পদটি সে স্থানে থাকা সম্ভব নহে। যমুনাখণ্ডে কয়েকটি পাতা নাই (১৪৫-১৫১); কিন্তু তাহাতেও উপরিউক্ত পদটির কোনও প্রসঙ্গ থাকিতে পারে না। রাধাবিরহ খণ্ডিত নহে। রাধা-বিরহের পরে পুথি খণ্ডিত বটে। কিন্তু ঐ পদের অস্তিত্ব সেই লুপ্ত অংশেও সম্ভব নহে। কারণ, উহাতে আছে,—

আর কাল হইল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হইল নানি করে কত রঙ্গ।—মণীন্দ্রবাবুর পুথি।

ইহা অবশ্য রাধাবিরহখণ্ডের উক্তি হইতেই পারে না। নৌকাখণ্ডে এবং ভারখণ্ডে এই পদ থাকিলেও থাকিতে পারিত, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, নৌকাখণ্ড সম্পূর্ণই আছে। ভারখণ্ডের যে দুই একটি পাতা পাওয়া যায় না, তাহার ভাব অন্যরূপ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর অন্যতম বান্ধব-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্তর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৮
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	..	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮২৫	...	৯১৫
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৬	...	১২
		৮৭২		৯৫৮

(ক) আলোচ্য বর্ষে স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ

শীল এবং পুরাতন বিশিষ্ট-সদস্য রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু এবং রায় জলধর সেন বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন, ৫। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ৭। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ৮। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন,—

১। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ১০১ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯১৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৬ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বর্ষশেষে এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৩ জনের স্থিতি-কাল ফুরাইয়াছে। এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা এখন ১২ জন।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, ৩। রায় জলধর সেন বাহাদুর।

আজীবন-সদস্য—রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

সাধারণ-সদস্য—১। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, ২। আশুতোষ ঘোষ, ৩। গিরিশচন্দ্র বসু, ৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। যজ্ঞানিল আচার্য্য চৌধুরী, ৬। ননীগোপাল মজুমদার, ৭। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ৯। বীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ১০। শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, ১১। অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের অধিকাংশেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র বসু যথাক্রমে 'জ্যোতিষ-দর্পণ' এবং 'উদ্ভিদ্‌জ্ঞান' নামক পরিষদ্‌গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পরিষদের ও রমেশ-ভবনের কোষাধ্যক্ষরূপে এবং নানা ভাবে অর্থসাহায্য দ্বারা পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ননীগোপাল মজুমদার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া এবং অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রাদি দান কবিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি পরিষৎ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন পুঁথি দান কবিয়া পরিষদের সম্পদ্ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

১। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, ২। দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৩। ললিতমোহন ঘোষাল, ৪। স্বামী শুদ্ধানন্দ, ৫। ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী, ৬। মধুসূদন জানা, ৭। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৮। রাজা স্তর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, ৯। রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, ১০। শিবরতন মিত্র, ১১। শরৎচন্দ্র মিত্র।

ইঁহাদের মধ্যে ৪. ৬, ৮ এবং ৯ সংখ্যায় উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই এক সময়ে পরিষদেব সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ পরিষৎ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৭ই শ্রাবণ, শনিবার। সভাপতি—**শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর, ঝাড়গ্রামরাজ কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে পরিষদের 'বান্ধব' নির্ব্বাচন এবং (১) ৺স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এবং**

(৩) স্তর শ্রীযদুনাথ সরকারের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়। এই অধিবেশনে (ক) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং (খ) শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ১৪ই ভাদ্র—(ক) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ' এবং (খ) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত 'পরমানন্দমত-সংগ্রহ' নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১৮ই অগ্রহায়ণ।—(ক) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা" এবং শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২২এ চৈত্র। প্রবন্ধ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত "চোরের পাঁচালি" পঠিত হয়।

(গ) **সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা**—(১) আলোচ্য বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা—১৪ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীসন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং মাইকেল-পত্নীর সমাধি-সংরক্ষণের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়। অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী আলোচনা রায় গান করেন এবং শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত কবিতা পাঠ, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কবির রচনা আবৃত্তি করেন। মৌলবী রেজাউল করিম, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীপ্রিয়লাল দাস বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমান বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিরূপে এবং শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা ১৪ই আষাঢ় সম্পন্ন হয়। ঐ দিন প্রাতে স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এবং শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় গান করেন। শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ ও শ্রীরাজকুমার মল্লিক আবৃত্তি করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—(১) ৺রায় জলধর সেন বাহাদুরের জন্য শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন, ৩০এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমলতা ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শোকপ্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) ৺রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের জন্য শোক-প্রকাশ—৩১এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীমন্মথমোহন বসু এবং শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ করেন ও কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়-লিখিত 'নগেন্দ্রস্তোত্র' পঠিত হয়। শোক-প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের জন্য শোক-প্রকাশ—২রা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীপান্নালাল দাস বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা পুষ্পরাণী দাস ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৺জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের প্রদত্ত ৺জ্ঞানেন্দ্রবাবুর চিত্র প্রদর্শিত ও শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) ৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীগণপতি সরকার, ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন এবং শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়—২০এ শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মৌলবী রেজাউল করিম বক্তৃতা করেন। শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায় পরিষদ্ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত গান গাহিয়া, পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ চারণগণ কবির রচিত কয়েকটি গান গাহেন।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—(১) শ্রীসজনীকান্ত দাস ৪ঠা বৈশাখ "বাংলা ভাষার প্রথম যুগ" বিষয়ে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার অন্তর্গত দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর ২৭এ ভাদ্র "বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। (৩) ১৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন-মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রামনারায়ণ তর্করত্ন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৪) ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার "বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া মনঃসমীক্ষণের আলোচনা" নামক প্রবন্ধ বর্ত্তমান বর্ষের ৫ই জ্যৈষ্ঠ পাঠ করেন।

(চ) **ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা**

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী "তরল ও কঠিন বায়ু" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এই ধারাবাহিক বক্তৃতার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ৫ই মাঘ (১৯এ জানুয়ারি) বুধবার, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী "তরল ও কঠিন বায়ু" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(২) ১৭ই মাঘ (৩১এ জানুয়ারি) মঙ্গলবার—অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ "প্রাচীন ও আধুনিক রসায়ন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৩) ২৮এ মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারি) শনিবার—ডক্টর শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ "আকাশের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৪) ৭ই ফাল্গুন (১৯এ ফেব্রুয়াবি) রবিবার—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অঙ্কমিটার' বিষয়ে বক্তৃতা কবেন।

(৫) ১৯এ ফাল্গুন (৩বা মার্চ) শুক্রবার—ডকটর শ্রীবসুকুমার বাগচী "মনুষ্য-মস্তিষ্কে তড়িৎস্পন্দন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৬) ৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদাব "ব্যোমরশ্মি" (Cosmic Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৭) ১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) শনিবার—ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রঞ্জন-রশ্মি" (X-Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৮) ১৬ই বৈশাখ (১৩৪৬), ৩০ এপ্রিল, রবিবার—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "মৃগনাভি ও তজ্জাতীয় গন্ধদ্রব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৯) ২৯এ বৈশাখ (১৩ই মে) শনিবার—শ্রীরাধাভূষণ বসু "সুড়ঙ্গ রেলপথ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১০) ২২এ আষাঢ় (৭ই জুলাই) শুক্রবার—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন "দৃষ্টিশক্তি সংরক্ষণ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১১) ৫ই শ্রাবণ (২১এ জুলাই) শুক্রবার—ডক্টর জে. পি. গ্রেগরি "মাংসাশী উদ্ভিদ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,—

১। **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**—৪ঠা বৈশাখ, বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। সভাপতি মহাশয়, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা বক্তৃতা করেন এবং শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী আবৃত্তি করেন।

২। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—(ক) ১০ই আষাঢ় সেনেট হলে বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্যামবাজার নিউ ক্লাবের সভ্যগণ ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা পার্টির সহযোগে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গাহিলে পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধনে তাঁহার লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, পি. ই. এন.-এর পক্ষে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রীঅমরনাথ ঝা, ঝাঁসির শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত, কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, কর্ণাটক বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘ, বাণহট্ট ভারতীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, স্যর হাসান সারওয়ার্দ্দি, মিঃ ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, কলিকাতার মেয়র, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ও প্রতিষ্ঠানের বাণী ও পত্র পঠিত হইলে শ্রীসরলা দেবী, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজা শ্রীক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, রেজাউল করিম, শ্রীগুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীযদুনাথ সরকার "বঙ্কিমচন্দ্র ও ইস্‌লামীয় সমাজ" প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এই প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়—Bankim Chandra, the Prophet of Bengal— মিঃ কে. এন. কেলকার, Bankim Chandra's Influence on Tamil Literature—দেওয়ান বাহাদুর কে. এস্. রামস্বামী শাস্ত্রী, Bankim Chandra in Kerala—টি. কে. কৃষ্ণ মেনন।

পরদিন প্রাতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে উক্ত 'বন্দে মাতরম্'-গায়ক-সম্প্রদায়ের সহিত বহু সদস্য ও সাহিত্যসেবী কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে গমন করেন। তথায় একটি সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর রমেশ-ভবনে বঙ্কিম-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক, ব্যবহৃত দ্রব্য, লেখা পত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি প্রদর্শনের পর সান্ধ্য সম্মিলন হয়। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীচামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের

রচনা হইতে “আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে ‘বারবেলা সমিতি’র সভ্যগণ ‘কমলাকান্তের জবানবন্দী’ অভিনয় করেন। এই দিন জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীযুক্তা শান্তি বসু, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গান করেন এবং শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী আবৃত্তি করেন।

৩। **ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন**—১০ই অগ্রহায়ণ। ঐ দিন প্রাতে ৩৪, রামকমল সেন লেনে কেশবচন্দ্রের জন্মস্থানে পরিষদের সভাপতি প্রভৃতি সদস্যগণ ও বহু সাহিত্যসেবী সমবেত হন এবং যে স্থানে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিদর্শন করেন। তৎপরে তথায় সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে এক অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয়, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এবং শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্ণে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন এবং কেশবচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়। মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, ডাক্তার বি. সি. ঘোষ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু কেশবচন্দ্রের *‘স্বর্গ’* আবৃত্তি করেন এবং শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কমল-কুটীরে"র কর্তৃপক্ষগণ, শ্রীসত্যানন্দ রায়, মিসেস মহলানবীশ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন, বি. কে. সেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্রীসরলা দেবী, এন. সি. দাস প্রভৃতি প্রদর্শনীর দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উৎসব ও সংবর্দ্ধনা

১। প্রতিষ্ঠা উৎসব—আলোচ্য বর্ষের ৮ই শ্রাবণ পরিষদের ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব, সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন মূর্ত্তি, পুথি, পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও চিত্র উপহার পাওয়া যায়। উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ‘আনন্দবাজার’ হইতে আবৃত্তি করেন। কুমারী অমিতা সেন ও শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি গান করেন। এই উপলক্ষে জলযোগের আয়োজন করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই শ্রাবণ সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় ‘তুফান’ নামক স্বরচিত গ্রন্থ হইতে "ডাকঘরের আত্মকাহিনী" আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুরের নেতৃত্বে বাণীপীঠের ছাত্রীগণের গান, শ্রীপান্নালাল দে ও কুমারী রমা ঘোষের গান, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীসারদা গুপ্তের হাসির গান এবং শ্রীঅরুণকুমার সিংহের কীর্ত্তনের পর জলযোগের দ্বারা নিমন্ত্রিতগণকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের

কাঁঠালপাড়ার বাড়ী সংস্কারের জন্য সভাপতি মহাশয় আবেদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীগুরুসদয় দত্ত, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীগণপতি সরকার ও শ্রীলালবিহারী দত্ত প্রত্যেকে ১০০৲ হিসাবে এই উদ্দেশ্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং দুইজন বন্ধু নগদ ৭৲ দান করেন। ঐ উৎসব উপলক্ষে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, পুস্তক, পুথি, সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি ও পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয় এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

২। ৩১এ ভাদ্র শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের অন্যতম বান্ধব ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সান্ধ্য সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে কুমার বাহাদুরকে পরিষদের গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ-লিখিত "আশীর্ব্বচন" ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত অভিনন্দন পঠিত হইলে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীসমরেশ চৌধুরীর গানের পর জলযোগান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা

বিগত বর্ষে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলেও উহার প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বর্ষের ২৫এ ফাল্গুন মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভবন-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। মিসেস জ্ঞানাঙ্কুর দে, মিস্ দে, শ্রীযুক্তা সাধনা বসু ও শ্রীমধু বসু স্তোত্র গান করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী পঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস রমেশভবন কমিটির কার্য্যবিবরণ ও ভবন নির্ম্মাণে সাহায্যকারিগণের নাম পাঠ করেন। এই ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য লেডী প্রতিমা মিত্রের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টার কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন। গবর্মেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তিতে কণ্ট্রাক্টরের দেনা শোধ হইলেও ইহার নানাবিধ আসবাব প্রভৃতির জন্য আরও চারি হাজার টাকার অভাবের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিলে সভাপতি মহাশয় স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের মূর্ত্তি ও রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীঅরুণা সেনের স্বহস্তে অঙ্কিত ও তাঁহার প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের তৈলচিত্র উন্মোচনপূর্ব্বক রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবনের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক বরোদার মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

(১) সারদাচরণ মিত্র, (২) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (৩) রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও (৪) ভূমিদাতা মহারাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে

রমেশ-ভবনের এই চারি জন ন্যাস-রক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় রমেশ-ভবন কমিটির অধিবেশনে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠা-সভার অনুমোদনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী ন্যাসরক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহারা এক্ষণে রমেশ-ভবনের ন্যাসরক্ষক রহিলেন,—

(১) মহারাজ স্তর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, (২) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, (৪) মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং (৫) মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক ও ব্যবহৃত দ্রব্য, দীনবন্ধু মিত্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি মনস্বিগণের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি প্রভৃতি। রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের জন্য চিত্র শালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্যে কতকগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। উপযুক্ত আধারের অভাবে সকল জিনিষ রীতিমত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বঙ্গীয় রাজসরকারকে এই বিষয় জানাইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিশ্বভারতীর চিত্র ও শিল্পসম্পদ্ রমেশ-ভবনের হলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে গত ১৬ই মাঘ রমেশ-ভবন ও উক্ত প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। চিত্রশালার জন্য একজন ফরাশ আলোচ্য বর্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং চাকরদের আহারাদির জন্য একটি সাময়িক টিনের চালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ স্থানে একতলা ঘর ও তদুপরি বিক্রেয় গ্রন্থাবলী রাখিবার জন্য গুদাম প্রস্তুত করা সত্বর আবশ্যক। তদভাবে বহু মূল্যবান্ পুস্তক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে The Calcutta Electrical Mfg. Co., Ltd. তাঁহাদের ৩ খানি Orient fan রমেশ-ভবনে তিন মাসের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। পরিষৎ ইহার জন্য উক্ত কোম্পানীর নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। আলোচ্য ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শত বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য পরিষৎ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল,—

(১) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্ম পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের প্রেরিত অনুরোধপত্রের ফলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যূন পক্ষে দুই সহস্রাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ জন্মদিন স্মরণে বর্ত্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ় উৎসবানুষ্ঠান হয়। পরিষৎ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব করিবার সঙ্কল্প পূর্ব্ববৎসরেই গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে ঐ দিবসত্রয় সমারোহে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি কিছুকাল সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ¾ অংশের মালিক কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। বিগত বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অংশ পরিষৎকে দান কবিয়া দলিল সম্পাদন কবিয়া দিয়াছেন। কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের সকল স্বত্ব পরিষৎকে দান কব্বিবাব উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দানপত্রও আলোচ্য বর্ষে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। এই জীর্ণ বৈঠকখানাটির সংস্কার সাধনে আনুমানিক ২৫০০৲ ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০৲ সংগৃহীত হইয়াছে এবং বৈঠকখানার সীমানার প্রাচীর নির্ম্মাণের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। নৈহাটীর শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর সংস্কার কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাচীর নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় (১২০৲) নিজে বহন করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকে ১০০৲, কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১০১৲, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীএন. সি. চ্যাটার্জি প্রত্যেকে ২৫৲ এবং শ্রীবলাইলাল শেঠ ২০৲, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু ৫৲, শ্রীধন্যকুমার জৈন। শ্রীকিরণচন্দ্র বসু ২॥০ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র ২৲ দান করিয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালার এই পুণ্যতীর্থ সংস্কার করিবার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা পরিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের সঙ্কলিত জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সংস্করণে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী প্রবন্ধাদি এবং চিঠিপত্র মুদ্রিত হইতেছে। গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস। ইতিমধ্যেই আটখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য দুইখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও ৩।৪ খানি মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত খণ্ডগুলির বিবরণ 'গ্রন্থপ্রকাশ' শিরোনামে দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থস্বত্বের ¼ অংশ শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খরিদ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশকার্য্যে আনুষঙ্গিক কপিরাইট্ এক্ট অনুযায়ী বিজ্ঞাপনাদি এবং

গ্রন্থের প্রচারকল্পে কয়েক বার বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ পরিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম-সাহিত্য পঠন-পাঠনের ও উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইনি পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় জলধর সেন বাহাদুর, ইনি পরলোকগমন করায় রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু, সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৩। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৬। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ৮। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৯। রেভারেণ্ড এ. দৌতেন, ১০। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১১। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৩। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৬। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, ১৭। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৯। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, ২০। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১১টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা পাঁচ বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) ভুবনমোহিনী পদক সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, (খ) কমলা-লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীমন্মথমোহন বসু, (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এবং (ঘ) জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্রীত্রিদিবনাথ রায় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, (২) শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, (৩) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, (৪) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

৩। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) জ্যোতিষ পরিষদে, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে, (ঘ) বালী সাধারণ পাঠাগারের বঙ্কিম উৎসবে, (ঙ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায়।

৪। দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ও গুলু ওস্তাগর লেনের মধ্যে অবস্থিত পার্ক-এর 'সাধক রামপ্রসাদ সেন পার্ক' নামকরণ করিতে কলিকাতা করপোরেশনে প্রস্তাব করা হয়।

৫। (ক) বালী সাধারণ পাঠাগারে ও চন্দননগর পাঠাগারে বঙ্কিম উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (খ) কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, (গ) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) হেতমপুরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুস্তকালয়, ও পুথিশালা হইতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শনশাখা, (ঘ) বিজ্ঞানশাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিয়মাবলী সংস্কার সমিতি, (ঞ) কেশব-চন্দ্র সেন শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (ট) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার সমিতি, (ঠ) কাঁঠালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কার সমিতি, (ড) দেনা মিটাইবার জন্য সমিতি, (ঢ) রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ণ) কার্য্যালয়ের ছুটী নির্দ্ধারণ সমিতি, (ত) কালীপ্রসন্ন সিংহ শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (থ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি এবং (দ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৭। ইংরেজি ১৯৪০ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ঐ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী প্রকাশিত হইবে।

৮। ই. আই. রেলওয়ের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের 'সপ্তগ্রাম' নামকরণের প্রস্তাব ভারত গবর্মেণ্ট ও রেলওয়ে অফিসে করা হইয়াছে।

৯। ওরিয়েণ্টাল্ কনফারেন্সের প্রস্তাবিত Indian Academy of Arts and Letters স্থাপন বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জানান হইয়াছে।

১০। বিশ্বভারতীর সহিত পরিষদের সংযোগ স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১১। রমেশ-ভবনে বিশ্বভারতীর কলাভবনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১২। ৺সরযূ ফরাসের মাসিক ৫৲ পেন্সন ও তৎপরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে এককালীন ২০৲ সাহায্য করা হইয়াছিল।

১৩। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়ার প্রস্তাবিত দানের (৩০০০৲ টাকার) সর্ত্তাদি আলোচিত হইতেছে।

১৪। বুদ্ধদেবের জন্মদিনে সাধারণ ছুটির প্রবর্ত্তন করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ষট্চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট-গণনার জন্য ইঁহারা ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—শ্রীরমণীকান্ত বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে এবং শ্রীবিনোদ চৌধুরী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ঐ আলোচনা—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, ৪। ঐ প্রত্যুত্তর—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৫। গোপাল ভট্ট—ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, ৬। বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৭। মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৮। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। রামনারায়ণ তর্করত্ন—ঐ। ১০। চোরের পাচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ১১। পরমানন্দমতসংগ্রহ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ১২। ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(খ) আধুনিক সাহিত্য—১। প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—ঐ, ৩। বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব—ঐ।

(গ) ইতিহাস—১। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১-৪)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫। বাংলা ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। "কলিকাতা" নামের উৎপত্তি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮। বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়—ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ৯। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ১০। ভেলসংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ১১। মুঘল ভারতের ইতিবৃত্ত—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ১২। মুসলমান যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ—ঐ।

বিজ্ঞান—১। ভারতের মানব ও মানবসমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ২। সটইকলা রাজ্যে তৈলনিষ্কাশণ-যন্ত্র—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার কলেবর বৃদ্ধি, প্রবন্ধসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইহাতে প্রচুর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় সদস্য ও পাঠকগণের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইল,—

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পরিষদের ঋণ পরিশোধার্থে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ইহার স্বত্ব তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণটি বাঁধাইয়া প্রকাশ করা হইল। ২৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

২। পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি গত ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পরিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যে ইহা পূর্ণ। ২০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ।

(ক) কপালকুণ্ডলা— ১০৮ পৃঃ

(খ) মৃণালিনী— ১৫৩ পৃঃ

(গ) দুর্গেশনন্দিনী— ১৭২ পৃঃ

(ঘ)	আনন্দমঠ—	১৭২ পৃঃ
(ঙ)	কমলাকান্ত—	১৪৬ পৃঃ
(চ)	সাম্য—	৫০ পৃঃ
(ছ)	বিজ্ঞানরহস্য	৬১ পৃঃ
(জ)	বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ)	৪১৬ পৃঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস বিপুল পরিশ্রম সহকারে এই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি ও স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিতেছেন। ঝাড়গ্রাম-রাজের দানের উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ এই বিপুল ব্যয়সাধ্য গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দান ব্যতীত কয়েক জন সদাশয় বন্ধুও ৫০৲ হিসাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল দাতৃগণকে গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ উপহার দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থের জন্য কয়েক জন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সঙ্কলিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে ১। ন্যায়দর্শন (২য় সংস্করণ) প্রথম ভাগের মুদ্রণ শেষ হইয়া আসিল—৪৩২ পৃষ্ঠা ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা মুদ্রিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

২। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ মুদ্রণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৪৮ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৩। রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কাজ এ বৎসর কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

৪। বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। এই গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় সর্ব্বসমেত ৭২ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি এবং সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল (অসম্পূর্ণ) ৩ খানি এবং জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল (অসম্পূর্ণ) একখানি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত পুথির মধ্যে কাশীনাথ-কৃত শিববিলাস কাব্য, পূর্ণানন্দ-কৃত ষট্‌চক্রবিবরণের কয়েকখানি নূতন টীকা ও রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বের ১৫৪৪ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের হিতৈষী যে সকল ভদ্রমহোদয়ের প্রদত্ত পুথির মোড়ক হইতে উপরিলিখিত পুথিগুলি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও বাছাই-করা পুথির সংখ্যা এইরূপ,—শ্রীআশুপদ মুখোপাধ্যায় (৪২ খানি), শ্রীশ্রীনিবাস দেবশর্ম্মা (১৭ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (৫ খানি), শ্রীবনমালী ঘোষ (৪ খানি), শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় (২ খানি), শ্রীকৃপাশরণ

হালদার (২ খানি)। এই পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি		—	৩১৯৮
সংস্কৃত	„	—	২২৩০
তিব্বতী	„	—	২৪৪
ফার্সী	„	—	১৩
অসমিয়া	„	—	৩
ওড়িয়া	„	—	৪
হিন্দী	„	—	২
		মোট	৫৬৯৪খানি

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আলোচ্য বর্ষে পরিষৎপুথিশালায় পুথি কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

(ধার)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২খানি এবং ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে ১খানি ধার দেওয়া হইয়াছে।

(প্রদর্শনী)—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে কয়েকখানি পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(ব্যবহার)—হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে পুথিশালায় বসিয়া বহু পুথি আলোচনা করিয়াছেন। *Abhand.* Kunde Morgen. (1937, XXI. 7)এ হইতে প্রকাশিত 'মহানাটক' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র সংস্করণে পরিষদের ব্যবহৃত পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্তের নিকট পরিষদের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র (২৫১ ও ২৫৭ সংখ্যক পুথি) শেষ কয়েকটি কবিতার নকল পাঠান হইয়াছে। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে 'সর্বসার' নামক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের বিষয়ে বিবরণ প্রেরণ করা হইয়াছে।

(নকল)—শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত 'চৈতন্য ভাগবতে'র (১৬৯৭) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য পুথিশালার তালিকা নকল করিয়া লইয়াছেন।

পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে পরিষদের পুথিশালায় 'মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল' ও কাশীনাথের 'চোর চক্রবর্ত্তী' পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় (৪৫শ বর্ষ, ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ১৭৪৯ শকে মুদ্রিত ভাগবতের পুথির পাটার উপরে অঙ্কিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চারিখানি চিত্র 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩৪৫) প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে ১০০ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র একখানি প্রাচীন পুথিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য একটি বাক্স এবং পুথিশালার ব্যবহারার্থ একটি কাঠাধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৪১৭২২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫০১ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫৮ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তকসংখ্যা ৫২২২৩ হইয়াছে। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা ও পুস্তকাদির নাম

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। উদ্ভিজ্জ বিদ্যা—১২৬৬, ২। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত—১২৭৪, ৩। বস্তুপরিচয়—১৮৫৯, ৪। মনঃকল্পিত ইতিহাস, ১ম ভাগ—শকাঃ ১৭৮৩, ৫। বুদ্ধিমালা, ১ম ভাগ—১৮৬১, ৬। জিওগ্রাফি—১২৬৩, ৭। অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস, সংবৎ ১৯১৪, ৮। ধ্রুববাদী—১২৮১, ৯। পুরাবৃত্তসার, ১ম খণ্ড—১২৬৭, ১০। খগোল-বিবরণ—১৮৫৯, ১১। ভেক মূষিকের যুদ্ধ—১৮৫৮, ১২। ধন-বিধান—১৮৬২, ১৩। ভূবৃত্তান্ত, ২য় ভাগ—১২৭৮, ১৪। হিতশিক্ষা, ২য় ভাগ, ১২৮১, ১৫। অবোধবন্ধু (মাসিক পত্রিকা) ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, চৈত্র, ১২৭৩ সাল।

ক্রীত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। সতীদাহ (আবেদন) ১৮৩০, হিতোপদেশ—রামকমল সেন-প্রণীত, ১৮২০, ৩। কঠোপনিষৎ—রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত, ১ম সং, ১২২৪, ৪। কবিতাসংগ্রহ (বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা সহ)—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত, ৫। প্রত্নকম্রনন্দিনী—(The Hindu Commentator) হিন্দী পত্রিকা, Oct 1867, June 1868, Sept. 1870, ৬। বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্রিকা) ১২৭৯ হইতে ১২৯০।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Supdt. Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A., ৪। Director, Geological Survey of India, ৫। Registrar, Calcutta University, ৬। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৭। Librarian, Bengal Library, ৮। School of Oriental Studies, London, ৯। Supdt, Archaeological Survey of India, ১০। Supdt, Government Museum, Egmore, Madras, ১১। Secretary, Royal Asiatic Society, North China Branch, ১২। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩। Kokusai Bunka, Japan, ১৪। Director of Industries, Bengal, ১৫। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁহাদের সম্পাদিত 'মহাকোষ' ও 'শব্দকোষ' পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল,—দৈনিক ৫, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৬৪, দ্বৈমাসিক ২, ত্রৈমাসিক ১০।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পাত্রকাদি ক্রয় করিবার জন্য এ বৎসরও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুযায়ী গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয়বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে।

করপোরেশনের সাহায্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে—পরিষদের পুরাতন কর্ম্মী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুস্তক খরিদের জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়া পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও মাসিক পত্র প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—১। বঙ্কিমচন্দ্র শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী—বালি সাধারণ পাঠাগার, বালি, হুগলী, ২। বঙ্কিমচন্দ্র শত-বার্ষিকী—চন্দননগর সাধারণ পাঠাগার, চন্দননগর, হুগলী, ৩। কেশবচন্দ্র সেন শত-বার্ষিক জন্মোৎসব প্রদর্শনী—ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা, ৪। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলন—হেতমপুর, বীরভূম, ৫। বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী —বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিষদের সাহায্যার্থ ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দান করাতে পরিষৎ সবিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ দানের বাজেট মঞ্জুর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখায় ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। দর্শন-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ এ শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্বে কয়েকটি লোকশিক্ষক ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এপিডায়োস্কোপ খরিদ করায় তাহার সাহায্যে এই সকল বক্তৃতাসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির চিত্র প্রদর্শনের সুবিধা হইয়াছে। বক্তৃতার বিবরণ 'অধিবেশন' অংশে দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ববৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য ৬০০০৲ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে এবং একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মন্দির সংস্কারের এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়াছেন। সত্বরই কার্য্য আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কার্য্যের সুবিধার জন্য আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরে টেলিফোন বসান হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ যে সকল চিত্র প্রদর্শনের আবশ্যক হয়, তজ্জন্য একটি এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে পরিষদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দিরের নীচের তলায় রক্ষিত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের আলমারীগুলি রমেশ-ভবনের দ্বিতলে ও নিম্নতলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং সুসংস্কৃত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পরিষৎ মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যে একটি শৌচাগার নির্ম্মাণের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

(ক) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার শাখা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক স্থির হইয়াছে যে, অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষায় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সতী ঘোষকে 'স্বর্ণকুমারী স্বর্ণ-পদক' দেওয়া হইবে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এই ভাবে করা হইয়াছে,—

১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

২। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৩। রামনারায়ণ তর্করত্ন—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৪। রমেশচন্দ্র দত্ত—শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত প্যারিস্ প্লাষ্টারে নির্ম্মিত এক আবক্ষ মূর্ত্তি।

৫। রমেশচন্দ্র দত্ত—রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীযুক্তা অরুণা সেন মহাশয়ার অঙ্কিত এবং তাঁহারই প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৬। কেশবচন্দ্র সেন—ব্রোমাইড চিত্র; ডাক্তার শ্রীসত্যানন্দ রায়-প্রদত্ত।

৭। শশাঙ্কমোহন সেন—ব্রোমাইড চিত্র; কন্যা শ্রীযুক্তা সুষমা দাশগুপ্তা মহাশয়া-প্রদত্ত।

৮। বনওয়ারিলাল চৌধুরী—মিসেস্ বি. এল. চৌধুরী মহাশয়ার প্রদত্ত ব্রোমাইড চিত্র।

৯। প্রিয়নাথ সেন—ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত তৈলচিত্র। উহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

১০। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—ব্রোমাইড চিত্র ; তাঁহার পরিবারবর্গের প্রদত্ত।

১১। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু—ইঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ মহাশয়ার প্রদত্ত চিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

১২। রায় জলধর সেন বাহাদুরের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নী হেনরিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী ও মর্ম্মরস্তম্ভ বর্ত্তমান বর্ষে নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্র ৩৬০৲ দান করায় সমাধির উপর মর্ম্মরস্তম্ভাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধি-বেষ্টনীর জন্য পৃথক্ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল।

যাঁহারা চিত্রাদি দান করিয়া ও এই উদ্দেশ্যে অর্থাদি সাহায্য করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশের সূচনা হইয়াছে। মেদিনীপুরে যে বিরাট্ বিদ্যাসাগর-স্মৃতিভবন বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে শাখার স্থায়ী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য এই শাখার সংগৃহীত অর্থ উক্ত স্মৃতিভবন-সমিতির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। মফস্বলের পক্ষে শাখার এরূপ সুদৃশ্য ও বৃহৎ কার্য্যালয় নির্ম্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে শাখা নানা অধিবেশন ব্যতীত বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে যথাক্রমে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং মূল-পরিষৎ হইতেও উভয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ দিব্যস্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মূল-পরিষদের সভাপতি ও প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভাগলপুরে তত্রত্য শাখার একটি সুদৃশ্য নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিপুরা-শাখা এই বৎসর কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং গৌহাটী-শাখা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকল শাখাই বঙ্কিম-উৎসব ব্যতীত নানারূপ সাহিত্যালোচনার আয়োজন এবং স্মৃতি-সভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন নূতন শাখা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরা-শাখার আহ্বানে কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন গত ২৫এ ও ২৬এ চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দর্শন-শাখায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, বিজ্ঞান-শাখায় ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ইতিহাস-শাখায় ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-শাখায় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এবং সঙ্গীত-শাখায় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভাপতি ছিলেন। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে নিয়মানুসারে, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলন ও বীরভূমবাসীর পক্ষে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে আহ্বানের প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান
২। ঐ (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
৩। ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
৫। স্থায়ী তহবিলে দান
৬। সাধারণ তহবিলে দান
৭। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দান
৮। পুস্তক ক্রয়ের জন্য দান
৯। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান
১০। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্দ্ধনার জন্য দান
১১। বঙ্কিম-উৎসবের জন্য দান
১২। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য দান
১৩। কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতি-উৎসবের জন্য দান
১৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান
১৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান
১৬। পুথিশালার জন্য দান
১৭। আজীবন-সদস্যপদের জন্য দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যে সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। প্রতি বৎসরই পরিষদের নানা অভাবের বিষয় এই কার্য্যবিবরণে জ্ঞাপন করিয়া, তাহার প্রতিকারের জন্য সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হইতেছে। কিন্তু পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এই আর্থিক অভাবের জন্যই পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্তির ফলে বর্ষশেষে পরিষৎ সকল বাজার-দেনা ও আভ্যন্তরীণ দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। এই দানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় রাজসরকারের দানে অতীব প্রয়োজনীয় পরিষদ্ মন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক খরিদের জন্য দান, চিত্রা বায়োস্কোপ কোম্পানী, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ-তহবিলে দান, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর স্থায়ী-তহবিলে দান, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারে দান, শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্রের মাইকেল-পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু একাকী সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার

এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা দিক্ দিয়া পরিষদের আলোচ্য বর্ষটি পরিষদের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। যাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে পরিষৎ নিজ কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল সহৃদয় সদস্য, অনুগ্রাহক ও মঙ্গল-কামীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, যাহাতে পরিষৎ দিন দিন অধিকতর বল সঞ্চয় করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। যে সকল কর্ম্মী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এই কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩১এ শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা